ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান প্রকাশিত

ব্যাঙাচি

দ্বিতীয় সংখ্যা

জুন ২০২০ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৭

কল্পবিজ্ঞান

নিউরালিংক

সূর্যগ্রহণ ও বাংলাদেশ

আগুন কি জিনিস?

কল্পবিজ্ঞান লেখার টিপস

সূর্যগ্রহণ

করোনাভাইরাস এবং রক্তদান

জুন ২০২০, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৭
প্রথম বর্ষ • সংখ্যা ০২

সম্পাদক

প্রজেশ দত্ত, আবু রায়হান

সহযোগী সম্পাদক

অনেকে (এখানে ক্লিক করুন)

ডিজাইন এন্ড লেআউট

তানভীর রানা রাব্বি

প্রচ্ছদ এঁকেছে: তানভীর রানা রাব্বি
('স্টার ওয়ারস' অবলম্বনে)

প্রকাশক: নাঈম হোসেন ফারুকী

তারিখ: ১৫ই জুন, ২০২০

টিম ব্যাঙাচি, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান কর্তৃক

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:
https://bit.ly/bcb_science

ইমেইল: editor@bcbiggan.com
ওয়েব: https://www.bcbiggan.com
ফেসবুক: https://www.facebook.con/bcbiggan
ইনস্টাগ্রাম: https://www.instagram.con/bcb_science
টুইটার: https://www.twitter.con/bcb_science

প্রতিষ্ঠাতার বক্তব্য

ব্যাঙাচির কল্পবিজ্ঞান সংখ্যা বের হওয়ার আনন্দে আমি ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমার আর কিছুই বলার নেই।

-নাঈম হোসেন ফারুকী
(প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাঙের ছাতার বিজ্ঞান)

*এই জায়গাটা ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁকা রাখা হয়েছে 😉

সূচিপত্র

▶ মুভি রিভিউ

▶ বুক রিভিউ

▶ কল্পবিজ্ঞান

▶ নিয়মিত বিভাগ

▶ ফিচার

কেন কল্পবিজ্ঞান পড়বেন?

জাবেদ ইকবাল

আমার প্রিয় লেখক নিল গেইমানের একটা লেখা পড়ছিলাম। চায়নার প্রথম কল্পবিজ্ঞান (সায়েন্স ফিকশন) কনফারেন্সে চাইনিজ সরকার তাকে ইনভাইট করে নিয়ে গিয়েছে। গেইমান আয়োজকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তারা সায়েন্স ফিকশন কনফারেন্স করছে। তখন তারা বলেছে আইফোন থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব টেকনোলজি তারা বানায়, কিন্তু নিজেরা আবিষ্কার করতে পারে না। তাই তারা অ্যাপেল, গুগুল এবং এই ধরণের কোম্পানিগুলির সাথে প্রচুর কথা বলেছে এবং দেখেছে, আবিষ্কারকদের বেশিরভাগ সায়েন্স ফিকশন পড়ে বড় হয়েছে।

প্লেন, রকেটে করে চাঁদে যাওয়া, এগুলি সবই এসেছে কল্পবিজ্ঞান থেকে। আজকে শুধু একজন লেখকের চিন্তা কত সুদূরপ্রসারী হতে পারে, সেটা লিখছি।
আর্থার সি ক্লার্ক খুব নামকরা একজন কল্পবিজ্ঞান লেখক ছিলেন। তিনি প্রথম বললেন, বিষুব রেখার ওপর প্রায় ৩৬,০০০ মাইল ওপরে যদি কোন কৃত্রিম উপগ্রহ বসানো হয়, সেটা পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে চলবে এবং আমরা সেটা দিয়ে রেডিও সিগন্যাল আর ফোন পৃথিবীর একমাথা থেকে অন্য মাথায় পাঠাতে পারব। সেই থেকে জিও-স্টেশনারি স্যাটেলাইট এলো, বিদেশে ফোন করা সম্ভব হলো, ইন্টারনেট সম্ভব হলো। (বাংলাদেশের প্রথম ইন্টারনেট সংযোগ ছিল জিও-স্টেশনারি স্যাটেলাইট দিয়ে)।

তার আরেকটা ধারণা ছিল, গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট। কোনো মহাকাশযান দূর মহাকাশে যাওয়ার জন্য ভারি কোনো গ্রহ বা তারার মহাকর্ষকে কাজে লাগাবে। ভয়েজার এভাবেই বৃহস্পতিকে কাজে লাগিয়ে সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে যাচ্ছে।
আর্টিফিশিাল ইন্টেলিজেন্স, ইন্টারন্যাশনাল স্পেস-স্টেশন, এমনকি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবও তার লেখা থেকে এসেছে। কল্পনা তার, সেটায় অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি করেছে অন্যরা। টিম বার্নারস লি, ক্লার্ক-এর লেখা Dial F for Frankenstein গল্পটাকে ক্রেডিট দিয়েছেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের প্রাথমিক ধারণার জন্য।

প্রতিবছর ১৪ই জুন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে **বিশ্ব রক্তদান দিবস** উদযাপিত হয়। ২০০৪ সাল থেকে রক্তদানকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং রক্ত ও রক্ত জাতীয় পণ্যের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পালিত হয়ে আসছে।

কাব্যিক ভাষায় আমরা সবাই মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে যেতে ভালোবাসি । কিন্তু বাস্তবে কয়জন ছুঁয়ে দেখি মানুষের হৃদয়! আপনি কি জানেন আপনি প্রতি ৪ মাস পর পর সুযোগ পেয়ে থাকেন অন্য একজন এর হৃদয় সত্যি ছুঁয়ে দেখার। হ্যাঁ আমি রক্ত দানের কথাই বলছি। রক্ত আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কানেক্টিভি টিস্যু।আমাদের দেহের শেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই রক্তেই নিহিত। আর এই রক্তই বাঁচিয়ে রেখেছে আপনার দেহের প্রতি কোষকে খাবার ও অক্সিজেন পৌঁছে দিয়ে। রক্তের গুরুত্ব বলে বা লিখে হয়তো শেষ কর যাবে না। ১৪ জুন, রক্তদাতা দিবস হিসাবে পালন করা হয় পুরো বিশ্বজুড়ে। একটি গবেষণায় দেখা যায় একটি দেশের মোট জনসংখ্যার ১-২% মানুষ ও রক্ত দান করেন তবে তবে সে দেশের রক্তের চাহিদা পূর্ণ করা সম্ভব।

রক্ত আসলে কেন দেব, দিয়ে কি লাভ আসলে। আসুন জানা যাক!

শারিরীক উপকারিতা

১. রক্তদান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।কেননা রক্তদান করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার শরীরের মধ্যে অবস্থিত ‘বোন ম্যারো’ নতুন কণিকা তৈরির জন্য উদ্দীপ্ত হয়।রক্তদানের ২ সপ্তাহের মধ্যে নতুন রক্তকণিকা জন্ম হয়ে ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়।আর বছরে ৩ বার রক্তদান আপনার শরীরে লোহিত কণিকাগুলোর প্রাণবন্ততা বাড়িয়ে তোলে ও নতুন কণিকা তৈরির হার বাড়িয়ে দেয়।

২.নিয়ম মেনে রক্তদান করলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কমে।সুস্থ থাকে যকৃতও। হৃদপিণ্ড ও যকৃতের বহু রোগের কারণ রক্তে আয়রন মাত্রা বৃদ্ধি। রক্তদান করলে রক্তে আয়রন এর সাম্যতা বজায় থাকে।

৩. রক্ত গ্রহণের পূর্বে, আপনার রক্তের কিছু পরীক্ষা করা হয় যা থেকে আপনি, কোনো রোগে আক্রান্ত কিনা সে সম্পর্কে জানতে পারবেন তাও বিনা খরচে যেমন : হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইচআইভি (এইডস) ইত্যাদি।

৪. সম্প্রতি ইংল্যান্ডের এক গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত স্বেচ্ছায় রক্ত দানকারী জটিল বা দুরারোগ্য রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকেন অনেকাংশে।যেমন, নিয়মিত রক্তদান ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক।

৫. রক্তে কোলেসটোরলের উপস্থিতি কমাতে সাহায্য করে নিয়মিত রক্তদান।

এসব তো হল আপনার শারীরিক উপকারীতা

এবার আসি মানসিক দিকের উপকারীতায়

মানসিক উপকারীতা

১. মুমূর্ষু মানুষকে রক্তদান করে আপনি পাচ্ছেন মানসিক তৃপ্তি। কারণ, এত বড় দান যা আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়।আপনি কাউকে টাকা দিতে পারেন কিন্তু সেই দান সবসময় গ্রহণযোগ্য হবে কি না আপনি নিজেও জানেন না।কিন্তু রক্তদান, এটা আপনার শরীর থেকে যাচ্ছে, এর চেয়ে নিঃস্বার্থ দান কিছু হতেই পারে না।
২. রক্তদান ধর্মীয় দিক থেকে অত্যন্ত পুণ্যের বা সওয়াবের কাজ। কোনো ধর্মে রক্তদানের কোনো রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা নেই।
৩. যারা ডিপ্রেশন কিংবা মানসিক অশান্তি তে ভুগে থাকেন তাদের জন্য রক্ত দান একটি আশীর্বাদ স্বরূপ, মানসিক প্রশান্তির এক আধার হল এই রক্তদান।

রক্ত দানের যোগ্যতা : কারো বয়স যদি ১৮ বছর এর বেশি হয় আর ছেলেদের ওজন যদি ৪৮ কেজি বা এর বেশি হয় আর মেয়েদের যদি ৪৫ কেজি বা তার বেশি হয় তবে আপনি রক্ত দিতে পারবেন।

রক্তদানে ভয়
রক্ত দান করতে ভয় পান অনেকে, এখন রক্ত দেবেন কি করে, একবার থ্যালাসেমিয়ার কোনো রোগীকে একবার দেখুন! আপনি যার জন্য ভয় পাচ্ছেন, সেটা একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রতি ১৫-২০ দিন পর পর করতে হয়।উদাহরণ দেই দুটি,

১. একটা ছেলে বয়স ১৫-১৬ বছর বয়স, সে প্রতি ১৫ দিন পর পর জামালপুর জেলা থেকে ময়মনসিংহ একা আসে শুধু ব্লাড নেবার জন্য।আর্থিক ভাবে এতো টা অসহায় কখনো কখনো সে ক্রস ম্যাচিং এর টাকা টাও ঠিক মত দিতে পারে না। ময়মনসিংহ এসে দুদিন সে হসপিটালের বারান্দায় বারান্দায় ঘোরে কোথাও থাকার জায়গা টিও তার নেই।
২. এক আন্টির ২ মেয়ে, ২ জন ই থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত, উনি ও ওনার স্বামী সারা মাসে এই দুজনকে বাঁচিয়ে রাখতে শুধু বাঁচিয়ে রাখতে দৌড়ে বেড়ান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কবি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু রক্তের জন্যে। আন্টি উচ্চ শিক্ষিত। তার সাথে সামনে বসে কথা বলার যোগ্যতাও নেই আমাদের তবুও আন্টিকে আমাদের কাছে এসে রক্তের জন্যে ঘন্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছেন।

এই যে দুই ঘটনা এখানে কিন্তু শুধু বাইরের কষ্টের কথা বলা হয়েছে। আর এইসব থ্যালাসেমিয়া রোগীদের প্রতি মাসে কয়েক বার ওই সুচ গুলোর আঘাত সহ্য করতে হয়।
আর আপনার তো হয়তো এসব কিছুই নেই। চার মাসে মাত্র একবার । একবার এসব অসহায় মানুষের মুখের দিকে চাইলে বুঝবেন মানুষের বেচে থাকার আকুলতা।

রক্তদানে মানুষের অনিহা
এবার বলি ২ টি কষ্টের কথা

১.এই যে উপরের ছেলের বা আন্টির দুই মেয়ের কথা বললাম তাদের এতো দৌড়ে বেড়াতে হত কি আদৌও যদি সবাই স্বেচ্ছায় রক্তদানে আগ্রহী হত?
ঐ অসহায় ছেলেটার হয়তো জামালপুরেই রক্তের ট্রান্সমিশন সম্ভব হত।
আর আন্টি একজন ব্যস্ত চাকুরীজীবী হবার পরও হয়তো আন্টির এতো কষ্ট হতই না রক্ত খুঁজতে!
শুধু যদি তাদের পরিবারের আপন মানুষ, নিজ এলাকার মানুষের কাছ থেকে তারা রক্ত পেতেন।
২.আমাদের ময়মনসিংহ তে একবার এক গর্ভবতী আপুর ডেলিভারিতে B(-ve) ব্লাড এর প্রয়োজন হয়েছিল।রেয়ার গ্রুপ, ক্যাম্পাসে ছিল না ডোনার। তখন আমাদের ঢাকা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রকে নিয়ে আসতে হয়েছিল শুধু এক ব্যাগ ব্লাড এর জন্য।

একবার ভাবুন তো পুরো ময়মনসিংহ তে কি B (-ve) রক্ত ছিলই না তবে!

রক্তদানে যুবসমাজের ভূমিকা
এবার কিছু আশার কথা শোনাই
এই যে আমরা যুব সমাজের এতো ভুল ধরি, ফেইবুকে আসক্তি রয়েছে তাদের, তারা এই অন্যায় করে তারে ওই অন্যায় করে, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের রক্তের চাহিদা কিন্তু পূর্ণ করছে এসব যুবকেরাই।
এসব ১৮-৩০ বছর বয়সী ছেলে মেয়ে গুলো যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা কলেজ এ পড়ে তারাই কিন্তু হাজার হাজার ব্যাগ রক্ত দান করছে বিনামূল্যে ।
তবে আপনি কি জানেন, নিজের পরিবার ছেড়ে পড়াশোনার জন্য বাইরে থাকা, এই ছেলে মেয়ে গুলোরই কিন্তু প্রোটিন এর চাহিদা পূর্ণ হয় না । আর এই সংখ্যা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এদেরই সবচেয়ে বেশি।

রক্তদানে পরিবারের বাধা

রক্ত দেবার ক্ষেত্রে আরেকটা বাধা কিন্তু আসে পরিবার থেকে, বাবা মা নিষেধ করে দেন, আর আপনারাও মেনে নেন।

একবার বুকে হাত দিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করুন তো বাবা মা কে না জানিয়ে কি কিছুই করেন না আপনি?

যদিও অনেক অন্যায় কাজ ও করে ফেলেন তাদের না জানিয়ে, তবে তাদের না জানিয়ে একজন মানুষের জীবন বাচাতে কি আপনি পারেন না?

আর রক্ত দিলে বড় জোর কি হবে রক্ত দেবার প্রথম ২-১ ঘণ্টা একটু দুর্বল লাগবে আর একটু গ্লুকোজ পানি খেলে সব ঠিক হয়ে যায়। আর এক দিন পর আপনি হয়তো বুঝবেনও না আপনি রক্ত দিয়েছেন।

শেষ কথা

শেষে একটা কথা বলতে চাই, সবাই রক্ত দিতে পারে না, এই সৌভাগ্য সবার হয় ও না, আপনি যদি রক্ত দিতে সমর্থ হন তবে দয়া করে একবার রক্ত দিয়ে দেখুন। যদি খারাপ লাগে আর দেবেন না। তবে রক্ত দানের পর অবশ্যই রোগীর সাথে দেখা করবেন, কারণ আপনি ঐ মানুষ টার হৃদয় ছুঁয়ে যাবেন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

সবার কপালে সত্যি এই সৌভাগ্য থাকে না বিশ্বাস করুন!

যদি সম্ভব হয়, শারীরিক ভাবে ক্ষমতা থাকে, রক্ত দিন নিয়ম মেনে।

"একের রক্ত অন্যের জীবন, রক্তই হোক আত্মার বাঁধন"

লেখক: সিয়াম ইসলাম আভি

মিনি সাই-ফাই

নিনা আজও খুব ভোরে জেগে যায়, চিন্তা করে আজকে কি করবে। কিন্তু তার মাথায় তার করার মতো কোনো কাজ খেলছে না, প্রযুক্তিগত উন্নতিতে মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে। সে ভাবছে যে চাইলেই রোবটের হাত থেকে ঝরনাটা কেড়ে বাগানে পানি দেওয়া যায়, কিন্তু সে তা করবে না কেননা তার ঘুম পাচ্ছে।

-গাউস সারাফ

অ্যা ব্রেইন ফর্মুলা প্যারাডক্স

সজল কুমার দাস

১.

মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে কাঁদছেন মিস্টার প্রেড। এতটা অসতর্ক তিনি কীভাবে হতে পারেন!

হাউ ইজ দিজ পসিবল!

ফর্মুলার শিশিটা ভেঙ্গে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে।এরকম ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি তার সাথে। তিনি জাস্ট এটা বিশ্বাসই করতে পারছেন না।বন্ধুর এত কষ্টের ফল এভাবে নষ্ট হয়ে গেলো! এর আগে তিনি এতটা খামখেয়ালি কোনোদিনও হননি।এটা ছাড়া যে তার প্রজেক্টটাও সম্পূর্ণ হবে না। রাগে নিজের মাথার চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে তার। তাকে আবার যেতে হবে তার বন্ধুর কাছে...

২.

ভ্যালিয়েটরী শহরের এক গোপন কেমিস্ট্রি ল্যাবে বসে আছেন মিস্টার প্রেড।তার চোখে মুখে চিন্তার ছাপ।ক্যারো কি আদৌ এটা করতে পারবে? ইজ ইট পসিবল অর নট? নাকি তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে? এমন অনেক কথা ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে।

গুনে গুনে ৪ ঘণ্টা পর সাদা এপ্রোনে জড়ানো এক লোককে এক্সপেরিমেন্ট রুম থেকে বের হতে দেখা গেল।

*তোমায় কি খুব বেশি অপেক্ষা করিয়েছি আমার বন্ধু? (ক্যারো)

ক্যারোর কথায় চোখ মেলে তাকালেন মিস্টার প্রেড। কখন যে চোখটা লেগে গেছে বুঝতেই পারেননি তিনি।সময়ের হিসেব রাখা আসলেই অনেক কষ্টের। কোনো রকমে নিজেকে সামলে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

কেমন আছো ক্যারো? সবকিছু কি ঠিকঠাক হয়েছে? (প্রেড)

তোমার জন্য একটা সুখবর আছে প্রেড। আই অ্যাম সাকসিড। ফর্মুলাটা রেডি হয়ে গেছে (ক্যারো)

হোয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট ক্যারো?আমি তো ভাবতেই পারছিনা যে তুমি এটা করেছ।আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি টুডে (প্রেড)

বাট উই হ্যাভ এ প্রবলেম বাডি (ক্যারো)

সমস্যা! কী সমস্যা বন্ধু? এখনো কি কিছু বাকি রয়ে গেছে? (প্রেড)
নো বাডি।আসলে তুমি যেটা ভাবছ ঠিক সেটা না।ফর্মুলা রেডিই আছে। কিন্তু আমি ভাবছি ফর্মুলার সাইড ইফেক্ট নিয়ে। আমার ফর্মুলা তোমার ব্রেইনকে ফার্টিলাইজড করবে এটা তো শিওর। তবে একসময় এটা যে তোমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাবে না তার গ্যারান্টি দিতে পারছি না।তুমি কি বুঝেছ আমি কী বলতে চাইছি?(ক্যারো)
এটা কোনো বিষয়ই না বন্ধু।নিজের স্বপ্নের জন্য আমি সব করতে পারি...সব। আর মৃত্যু তো একদিন হবেই। তাই ভবিষ্যৎ ভেবে নিজের স্বপ্নকে মাটিচাপা দিতে চাই না বন্ধু।তুমি কি আমার সাথে আছো ক্যারো ?(প্রেড)
ইয়েস বাডি।আই অ্যাম অলয়েজ উইথ ইউ।বাট...(ক্যারো)
হুম,নো মোর বাটস মাই ফ্রেন্ড।প্লিজ হেল্প মি (প্রেড)
অলরাইট।তুমি আমার সাথে আমার রুমে এসো (ক্যারো)
হুম চলো(প্রেড)

৩.

ক্যারো কে বিদায় জানিয়ে নিজের গন্তব্যে রওনা দিলেন মিস্টার প্রেড। নীল রঙের গাড়িটা সোঁ সোঁ করে ছুটে চলছে ড্রাইভারের নির্দেশনায়।কখনো ধীরে তো কখনো জোরে।গন্তব্য ফ্রোজেন সিটি। তবে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে একমনে খাতায় অঙ্ক কষে যাচ্ছেন তিনি।
(মিস্টার প্রেড পেশায় একজন ছোট-খাটো পদার্থবিদ। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।তবে এবার যেটা তিনি করতে চলেছেন সেটা বুদ্ধিমত্তার চরম সীমা অতিক্রম করতে চলেছে।আর সেই জন্যেই ক্যারোর শরণাপন্ন তিনি। নিজের ব্রেইনকে এক উচ্চতর সীমায় নিয়ে যেতে চান মিস্টার প্রেড।যাতে করে তিনি তার সিক্রেট প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে পারেন। আর ক্যারোর সফলতা দিয়েই তার সাফল্যের যাত্রা শুরু)
দেখতে দেখতে গাড়িটি ফ্রোজেন শহরের একটি বাড়ির সামনে এসে থেমে গেল।মিস্টার প্রেড তখনো অঙ্ক কষে চলেছেন।সময়ের হিসেবটা কিছুতেই মিলাতে পারছেন না তিনি।
স্যার আমরা চলে এসেছি। স্যার (ড্রাইভার)
ড্রাইভারের কর্কশ কণ্ঠে হকচকিয়ে উঠলেন মিস্টার প্রেড। সারাটা পথ তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন।তাই সময়ের ব্যবধান তিনি বুঝতেই পারেননি।তবে পদার্থবিজ্ঞানের বদৌলতে এই মুহূর্তে তার বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার কথা খুব মনে পড়ছে। নিজেকে কোনোভাবে সামলে গাড়ি থেকে নেমে সোজা নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন মিস্টার প্রেড। তার হাতে একটি কালো রঙের ব্যাগ দেখা যাচ্ছে।

৪.

শিশির ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন মিস্টার প্রেড।কী দিয়ে যে কী হয়ে গেল তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।
নাহ।এভাবে বসে থাকলে কিছুই হবে না।আই হ্যাভ টু মিট ক্যারো অ্যাগেইন। ক্যারোকে বিষয়টা জানানো দরকার। আমাকে যেমন করেই হোক ফর্মুলাটা সেবন করতেই হবে (প্রেড)
বন্ধু ক্যারোকে ফোন করে পুরো বিষয়টা জানালেন মিস্টার প্রেড। ক্যারো তাকে জানালেন হয়তো তিনি মানসিক চাপে ছিলেন বা শারীরিক দুর্বলতার কারনে শিশিটা হাত থেকে পড়ে গেছে। যাই হোক ক্যারো আরও জানালেন যে তিনি যেন আবার এসে ফর্মুলাটা নিয়ে যান। উফ... এবার যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেলেন মিস্টার প্রেড।
শিশির ভাঙা টুকরোগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করতে করতে তিনি ভেবে চলেছেন তার ভবিষ্যৎ প্রজেক্ট সম্পর্কে।
ইশ! কেমন হবে যদি আমি এটা সত্যিই করতে পারি? একমাত্র ক্যারোর ফর্মুলাই পারে আমকে আলটিমেট থিংকারে পরিণত করতে।ক্যারোর ফর্মুলার সাহায্যে আমি আমার ব্রেইনকে এতটাই ডেভলপ করতে পারব যে আই ক্যান ডু এনিথিং উইথ ম্যাই ব্রেইন। আমার বর্তমান মস্তিষ্ক আমাকে আমার গন্তব্যে নিতে পারবে না। আই ক্যান অনলি ফুলফিল মাই প্রজেক্ট উইথ মাই সুপার ব্রেইন। এন্ড দ্যা প্রজেক্ট ইজ ক্রিয়েটিং অ্যা টাইম মেশিন।

৫.

নিজের ঘরে ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিলেন মিস্টার প্রেড।তার হাতে ক্যারোর দেওয়া সেই কালো রঙের ব্যাগ। ব্যাগ থেকে একটি মিশমিশে কালো রঙের শিশি বের করলেন। হ্যা,এটাই। শিশিটা হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছেন তিনি।অ্যাট লাস্ট!
শিশির ছিপিটা খুলে এক নিঃশ্বাসে ফর্মুলাটা পান করলেন মিস্টার প্রেড।কেমন বিশ্রি ঝাঁঝালো গন্ধ।খানিক বাদে হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন তিনি।চোখটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে তার...
ঘুম ভাঙলে নিজেকে ঘরের মেঝেতে আবিষ্কার করলেন মিস্টার প্রেড। কতক্ষণ এভাবে পড়ে ছিলেন তার কোনো হিসেব নেই। ঘড়িতে প্রায় রাত আড়াইটা বাজে।খুব খিদেও লেগেছে তার।ফ্রিজ থেকে প্রয়োজনীয় খাবার বের করে গোগ্রাসে গিলতে লাগলেন। যেন বেশ কিছুদিন অনাহারে আছেন।নিজেকে রিলাক্স করতে টিভি দেখতে লাগলেন মিস্টার প্রেড।কিন্তু একি?
টিভিতে তো আজ রবিবার দেখাচ্ছে।কিন্তু এ কী করে হয়? আজ তো বুধবার! দেখি তো ভালো করে।নাহ...সব জায়গায়ই রবিবার দেখাচ্ছে।ধীরে ধীরে তার মনে পড়ে ক্যারোর ফর্মুলার কথা।তার মানে আমি এতসময় ধরে বেহুঁশ ছিলাম! ওহ ম্যাই গড।
ক্যারোর কথা মনে হতেই ফোনটা খুঁজতে লাগলেন মিস্টার প্রেড। ফোনটা হাতে নিয়েই অবাক হয়ে গেলেন তিনি। স্ক্রীনে ক্যারোর ৮৫ মিসড কল ভাসছে।ওকি তাহলে জানে এই সম্পর্কে?

তাড়াহুড়ো করে ক্যারকে ফোন দিলেন মিস্টার প্রেড।কয়েকবার ফোন বাজার পর ওপাশ থেকে ক্যারোর গলা শোনা গেলো।
আর ইউ ফাইন মাই বাডি? (ক্যারো)
ইয়েস ম্যাই ফ্রেন্ড। বাট (প্রেড)
আমি জানি তুমি কী বলতে চাইছ ।তোমার মধ্যে এখন কিছু বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন আসতে চলেছে।বিশেষ করে তোমার ব্রেইনে।ডোন্ট অরি।এন্ড গুড লাক টু ইউ মাই ফ্রেন্ড (ক্যারো)
টুট…টুট…টুট…টুট…
মিস্টার প্রেডের চোখে মুখে এখন এক রহস্যময় হাসির রেখা ফুটে উঠেছে

৬.

ল্যাবের মেঝেতে নিথর হয়ে পড়ে আছেন মিস্টার ক্যারো।তাকে ঘিরে রয়েছে ল্যাবের বাকি সদস্যরা।ঘটনাটা বুঝতে চেষ্টা করছেন তারা।তার হাতে একটি ওষুধের শিশির মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। শিশির ওপরে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা “কে সি এন”(KCN)।
দ্যাট মিন্স পটাশিয়াম সায়ানাইড! ওহ ম্যাই গড!
তাদের আর বুঝতে বাকি রইল না যে মিস্টার ক্যারো আত্মহত্যা করেছেন। কিন্তু কেন?
খবরটা মিস্টার প্রেডের কাছে পৌঁছাতে খুব একটা দেরি হলো না। কথাটা শুনে আঁতকে উঠলেন তিনি।না… ।এমনটা হতেই পারে না। ক্যারো এটা কিছুতেই করতে পারে না।আর কাল বিলম্ব না করে হসপিটাল থেকে রিলিজ নিয়ে সোজা চলে গেলেন ক্যারোর ল্যাবে। ল্যাবের মেঝেতে একটা সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে মিস্টার ক্যারোর নিথর দেহটাকে।সবাই শুধু এটাই ভাবছে তিনি কেন আত্মহত্যা করলেন। ইতোমধ্যে মিস্টার প্রেডও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছেন।ভাইয়ের মতো বন্ধুর মৃত্যু তিনি যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।তাকে জানতেই হবে ক্যারোর মৃত্যুর কারণটা আসলে কী।
উত্তরের খোঁজে তিনি ক্যারোর রুমে প্রবেশ করলেন। ওইতো,টেবিলের ওপর একটা কাগজ দেখা যাচ্ছে।কাগজটি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন মিস্টার প্রে

প্রিয় প্রেড,
যখন তুমি এই চিঠিটা পাবে তখন আমি অনেক দূরে হারিয়ে গেছি। তাই দুঃখ করো না।
তুমি কেমন আছ বন্ধু? জানি তোমাকে কেমন আছ বলাটা ঠিক হবে না।আসলে আমি এটা কখনই চাইনি।আমি ভেবেছিলাম হয়তো একটা নির্দিষ্ট সময় পর ফর্মুলার প্রভাবটা পড়বে ।কিন্তু সবকিছু যে এত তাড়াতাড়ি হবে এটা আমি কখনই ভাবতে পারিনি। আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না।আমার জন্য একটা মানুষের প্রাণ চলে যাবে এটা আমি চাইনি বিশ্বাস কর ।আমার নিজের প্রতি ঘৃণা হচ্ছে অনেক।আমার ভাইয়ের মতো বন্ধুকে আমি মেরে ফেললাম।আমাকে ক্ষমা করো তুমি।
অজান্তেই মিস্টার প্রেডের চোখ থেকে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

৭ .

ফ্রোজেন শহরের এক নামিদামি হসপিটালের মধ্যে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছেন মিস্টার ক্যারো।বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। রিসিপশনে গিয়ে কী যেন একটা শুনলেন তিনি।তারপর সামনের লিফটের দিকে সোজা এগিয়ে গেলেন।ইতোমধ্যেই লিফট এর বোতাম চেপে অপেক্ষা করছেন তিনি।গন্তব্য ফিফথ ফ্লোর।
লিফট সোজা ফিফথ ফ্লোরে এসে থেমে গেলো।দরজা খুলতে না খুলতেই দৌড়ে বেড়িয়ে গেলেন মিস্টার ক্যারো।খুঁজতে লাগলেন কেবিন নাম্বার ২০৪।
প্রেড…প্রেড…(ক্যারো)
হুম,কে? (প্রেড)
আমি প্রেড।ক্যারো।কেমন আছ প্রেড? তোমাকে যে এভাবে দেখব কখনো ভাবতে পারিনি (ক্যারো)
তুমি এসেছ আমার বন্ধু? তোমাকে দেখে খুব খুশি হয়েছি (প্রেড)
কিন্তু আমি তোমাকে এভাবে দেখে মোটেও খুশি হইনি প্রেড।সব আমারই ভুল ছিল।আমি যদি ফর্মুলাটা তোমাকে না দিতাম তবে আজ এমন দিন দেখতে হতো না ।আমাকে ক্ষমা করে দিও প্রেড (ক্যারো)
এ তুমি কী বলছ বন্ধু? আমি তোমাকে কখনই দোষী ভাবিনি। আসলে আমার পাগলামির জন্যেই এমনটা হয়েছে।আমি যদি তোমাকে জোর না করতাম তবে তুমি সেটা কখনই করতে না। আমার ব্রেইনে যে প্রবলেম হবে এমনটা তুমি অনেক আগেই বলেছিলে কিন্তু আমি তা শুনিনি।আর তার ফল স্বরূপ আমি ব্রেইন কান্সার পেয়েছি তাও একেবারে লাস্ট স্টেজ।এবং আমি মরতে চলেছি।তাই দুঃখ কর না বন্ধু।সবই কর্মফল (প্রেড)
কিন্তু আমি এটা কিছুতেই মানতে পারছি না প্রেড।তুমি শুধু আমার বন্ধু না,আমার ভাইও।তাই আমাকে ক্ষমা করে দিও (কেবিন থেকে কাঁদতে কাঁদতে বের হয়ে গেলেন মিস্টার ক্যারো)
ক্যারো…ক্যারো… (প্রেড)
আর পিছু ফিরে তাকালেন না তিনি

৮.

ক্যারোর লেখা চিঠিটা পড়ে বিছানার ওপর ধপাস করে বসে পড়লেন মিস্টার প্রেড। তার মানে ক্যারোকে শুধুমাত্র আমার পাগলামির জন্য খেসারত দিতে হয়েছে? ক্যারোর মৃত্যুর কারণ একমাত্র আমি? নাহ আর কিছু ভাবতে পারছেন না তিনি।সবকিছু তো এমন হবার কথা ছিল না।যেভাবেই হোক সবকিছু আমাকেই ঠিক করতে হবে।একাকি ভেবে চলেছেন মিস্টার প্রেড।

মাথায় তীব্র যন্ত্রণা করছে মিস্টার প্রেডের। হয়তো আর খুব বেশিদিন সময় নেই তার।তাই যা করার তাকে এখনই করতে হবে।

ল্যাব থেকে বের হয়ে সোজা বাড়ির দিকে রওনা দিলেন মিস্টার প্রেড।তাকে এটা করতেই হবে ম্যাট এনি কস্ট।

নিজের রুমে প্রবেশ করেই এগিয়ে গেলেন সামনের দেয়ালটার দিকে।বড়সড় দেখতে একটা দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি।হ্যাঁ এটাই।

পাঁচ বছর আগে যা তিনি শুরু করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু শেষ করতে পারেননি ।তার আরও কিছু বুঝার ছিল।কিন্তু তা আর বুঝা হয়ে ওঠেনি।তার হাতে আর বেশি সময়ও নেই।তাই যেভাবেই হোক আজ তাকে করতেই হবে।

ঘড়িটাও দেখতে বড়ই অদ্ভুত ।স্বাভাবিক ঘড়ির চেয়ে এটার কাটা দুইটা বেশি।দুইটা ঘণ্টার আর দুইটা মিনিটের কাটা।তবে অবাক করা বিষয় হল এক সেট কাটা(ঘন্টা ও মিনিটের) ঘড়ির আরেক সেট কাটার বিপরীত দিকে ঘুরছে।

মিস্টার প্রেড এক হাত দিয়ে উল্টো দিকের ঘণ্টার কাটা ও সঠিক দিকের মিনিটের কাটা একটার ওপর আরেকটা জুড়ে দিলেন। একইভাবে অন্য হাত দিয়ে বাকি সঠিক দিকের ঘণ্টার কাটা ও উল্টো দিকের মিনিটের কাটা একটার ওপর আরেকটা জুড়ে দিলেন। হঠাৎই ঘড়িটি ধীরে ধীরে দুইভাগ হয়ে গেলো। ঘড়ির ভেতরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তাকে যেন ঘড়ির ভেতরে টানতে চাইছে।এক অজানা ভয় কাজ করছে তার মধ্যে।চোখ বন্ধ করে নিলেন মিস্টার প্রেড।মুহূর্তের মধ্যেই ঘড়িটি মিস্টার প্রেডকে গ্রাস করে আবার জোড়া লেগে গেল ।ঘড়িটা এখন আবার আগের মতই চলছে

টিপটিপ করে চোখ মেলে তাকালেন মিস্টার প্রেড।ওহ ম্যাই গড! আই হ্যাভ ডান ইট।চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেছে তার।তার সামনে অতীতের সমস্ত প্রতিচ্ছবি ভেসে রয়েছে।প্রতিচ্ছবি বললে ভুল হবে।তিনি তার অতীতের জীবন্ত তাকেই দেখছেন।তবে তারা পরম স্থির।আর তার কাছে তার অতীতের সময়ও স্থির হয়ে আছে। তিনি চাইলেই এখন সব বদলাতে পারবেন।

এক এক করে সামনে এগোতে থাকলেন মিস্টার প্রেড।ওইতো অতীতের তার হাতে ওষুধের ফর্মুলাটা দেখা যাচ্ছে।এটাই সব নষ্টের মূল।এর জন্যেই যতো সমস্যা।এর কারনেই ক্যারোকে হারাতে হয়েছে।আর এর কারণেই তিনি নিজেও স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে ছিটকে গেছেন।আর দেরি করলেন না তিনি।ফর্মুলাটা অতীতের তার হাত থেকে খুব কৌশল করে ফেলে দিলেন মিস্টার প্রেড। কিন্তু একটা ভুল করে ফেললেন তিনি। টাইম পোর্টাল সম্পর্কে তার খুব ভালো ধারনা হবার আগেই তিনি ব্রেইন ক্যান্সারে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাই এ সম্পর্কে খুব বেশি বুঝা হয়ে ওঠেনি তার। আর তাই অতীতের এই ঘটনাকে পাল্টাতে গিয়ে নিজেই একটি টাইম লুপে ফেঁসে গেলেন। এবং নিজের বর্তমান অস্তিত্বকে মিটিয়ে ফেললেন...

এখন মেঝেতে হাঁটুগেড়ে বসে কাঁদছেন মিস্টার প্রেড।তাকে আবার যেতে হবে তার বন্ধুর কাছে...

মিনি সাই-ফাই

এক কোষী প্রানী ইউগ্লিনার উপর করা গবেষণা সফল হতে চলেছে। ডিএনএ মিউটেশন কি বহুকোষী প্রাণীকেও সালোকসংশ্লেষণের উপযোগী করে তুলতে পারবে? চিন্তিত বিজ্ঞানী ফাইরুজ।

-রিকো শীল

লেখক: মোহাম্মদ সাইফূল ইসলাম
প্রকাশক: নালন্দা প্রকাশনী
রিভিউয়ার: নাঈম হোসেন ফারুকী

আজকে আমরা বাজার থেকে খাবার কিনে খাই, জামা কাপড় কিনে পরি কী হবে যদি এমন এক দিন আসে যখন টাকা দিয়ে অক্সিজেন কিনতে হবে? আপনার প্রতিটা নিঃশ্বাসের জন্য গুণতে হবে কাড়ি কাড়ি টাকা? অনুমতি ছাড়া সন্তান জন্ম দিলে, সরকারের কোনো বিরোধিতা করলে কেঁড়ে নেওয়া হবে আপনার নিঃশ্বাস নেওয়ার অধিকার?

এই রকম অসাধারণ একটা কনসেপ্ট নিয়ে লেখা সাইফূল ইসলামের **'ও টু'** উপন্যাস। বইটাতে চলছে পাশাপাশি দুইটা থ্রেড।একটাতে বর্তমানের মানুষরা প্রাচীন একটা আর্টিফ্যাক্ট হাতে পেয়ে সমাধান করতে বসেছে ও টু রহস্যের।এটা কীভাবে সম্ভব যে অতি প্রাচীন যুগের মানুষদের কাছে ছিল অক্সিজেন কন্ট্রোল করার টেকনোলজি? তারা কি মানুষ ছিল? ঘটনা কি এই পৃথিবীর নাকি অন্যকোনো জায়গার? ডিটেক্টিভ উপন্যাসের মত চলছে জটিল এক রহস্যের সমাধান।
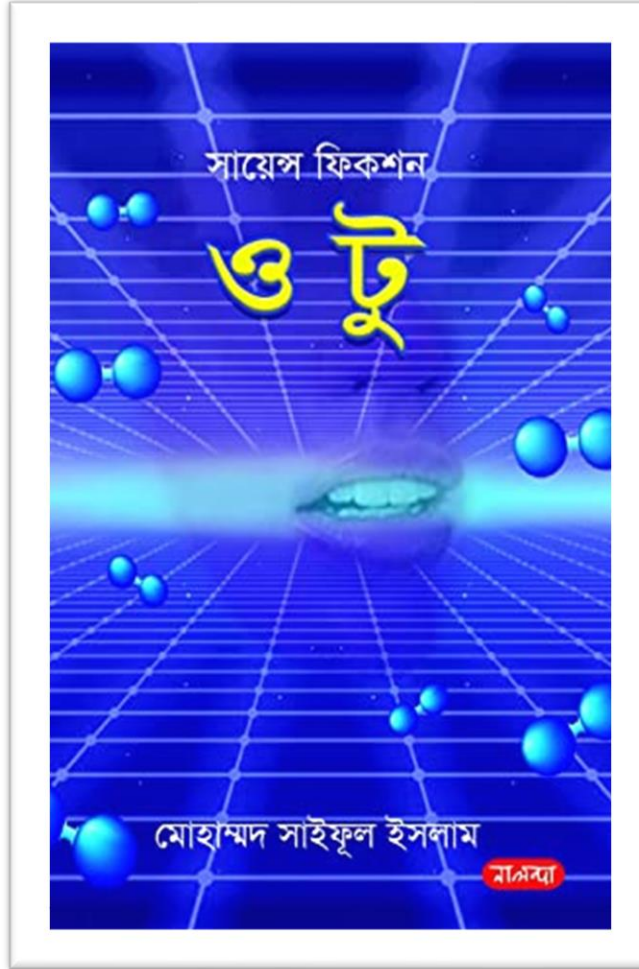
আরেক থ্রেডে আমাদের হিরো অজানা সময়ের অজানা জায়গার ডিস্টোপিয়ান সোসাইটিতে সংগ্রাম করে চলেছে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে।

চমৎকার পটভূমি, আগ্রহ ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট। তারপরও বইটা ফ্লোলেস না।বেশ কিছু চরিত্র অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। অনেকগুলো ফুটে ওঠে নি। চরিত্রগুলো অনেকাংশে একমাত্রিক, তেমন কোনো গ্রে এলাকা নেই।কিছু চরিত্রকে একটু পরে মেরে ফেলা হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রস্থানে তেমন কোনো কষ্ট আমি পাইনি, কারণ চরিত্রদের যথেষ্ট ডেভেলপ করা হয়নি।কিছু বৈজ্ঞানিক ভুলও আছে।

আশা করি লেখক তাঁর আগামী এ উপন্যাসগুলোতে বিষয়গুলোতে নজর দেবেন।তাঁর জন্য শুভকামনা থাকলো।

মাল্টিভার্স ম্যানিপুলেশান

অয়ন ভৌমিক

১.

“শক্তিকেন্দ্রগুলো চালু করো”

- কাঁপা গলায় অস্পষ্টভাবে বললেন বিজ্ঞানী এমিস। তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধিত রয়েছে ঘরের মাঝখানে রাখা ইরিডিয়ামের তৈরি চেম্বারটিতে। স্বচ্ছ কোয়ার্টজের জানালায় দেখা যাচ্ছে চেম্বারটির ভেতরে রাখা আপেলটিকে। সাদামাটা এই জৈবিক ফলটিকে সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সিস্টেমে রাখা হয়েছে।একটু পরেই আপেলটির উপর অকল্পনীয় পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করা হবে। সেটির প্রস্তুতি চলছে এখন। কিছুক্ষণ পরেই কেঁপে উঠল ঘরের চারদিকে রাখা সবগুলো রিয়্যাক্টর।আর চেম্বারের ভেতরে রাখা লেজারগুলো অস্পষ্টভাবে গুঞ্জন করে উঠল।

“সবগুলো লেজার অনলাইনে আছে, স্যার” কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে চোখ না সরিয়েই বলল এমিসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা। বিজ্ঞানী এমিস একবার ঢোঁক গিললেন, এরপর চাপা গলায় বললেন “প্রোগ্রাম ইনিশিয়েট”

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি দ্রুত কী-বোর্ডে কিছু সংখ্যা ইনপুট দেয়, এরপর এন্টার বাটনে চাপ দেয়। সাথে সাথে গর্জে ওঠে চেম্বারের ভেতরের সবগুলো লেজার।আপেলটার দিকে তাক করে তীব্র আলোকরশ্মি নিঃসরণ করতে থাকে লেজারগুলো। সবকিছু যেভাবে শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ পর আবার সেভাবেই থেমে যায়। ধোঁয়া সরে যাওয়ার পর দেখা যায় আপেলটা সেখানে নেই! হাসি ফুটে ওঠে বিজ্ঞানী এমিসের ঠোঁটের কোণে।“আর সাত সেকেন্ডের

মধ্যে এই আপেলটা ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরের জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটে টেলিপোর্ট হবে।নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমি আরো দুই সেকেন্ড সময় বেশি ধরছি।আর নয় সেকেন্ড পর স্যাটেলাইট থেকে নিশ্চিতকরণ বার্তা আসার কথা।'

কাউন্ট-ডাউনের সাড়ে আট সেকেন্ডের মাথায় স্যাটেলাইট থেকে যোগাযোগের অনুরোধ এলো।
কাঁপা হাতে সেটি নিশ্চিত করলেন বিজ্ঞানী এমিস।সেটি নিশ্চিত করতেই পর্দায় একজন কঠিন মানুষের চেহারা ভেসে ওঠে।কিন্তু ওনার চেহারার কাঠিন্য ভেতরের চাপা উচ্ছ্বাসটুকু লুকোতে পারছে না।পর্দার লোকটি বলল,
"আপেলটা সফলভাবে টেলিপোর্ট হয়েছে, জৈবিক কম্পোজিশন অপরিবর্তিত আছে। এক্সপেরিমেন্ট সফল হয়েছে। অভিনন্দন এমিস! তবে এই ছোট্ট রসিকতাটুকু না করলেও পারতে..."

"রসিকতা?" আনন্দমিশ্রিত বিস্ময় ফুটে উঠল বিজ্ঞানী এমিসের কণ্ঠে, "ক্ষমা করবেন প্রফেসর, কিন্তু আপনি রসিকতা বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছেন আমি ঠিক বুঝলাম না।'
"আধ-খাওয়া একটা আপেল টেলিপোর্ট করেছ তুমি।এক্সপেরিমেন্ট সফল না হলে তুমি এইটার জন্য অভিযুক্ত হতে পারতে।'
"আধ-খাওয়া?" বিস্ফারিত চোখে বললেন বিজ্ঞানী এমিস।

২.
"তুমি নিশ্চিত যে আপেলটা আধ-খাওয়া ছিলো না?" কঠিন চেহারার লোকটি বললেন বিজ্ঞানী এমিসকে।
"হ্যাঁ, প্রফেসর। আমি নিশ্চিত। আপনি চাইলে গবেষণাগারে উপস্থিত থাকা ছাত্রদের জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'
"কিন্তু তুমি দেখতেই পাচ্ছ আপেলটা আধখাওয়া..."
"সেটাই তো..." তীক্ষ্ণ চোখে আপেলটার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন এমিস, "আচ্ছা এমন কি হতে পারে না যে এক্সপেরিমেন্টের সময়ের কোনো সমস্যার কারণে জৈবিক কম্পোজিশন চেঞ্জ হয়ে আপেলটা এমন হয়ে গেছে?"

"না, এমিস। আপেলটা পরীক্ষা করা হয়েছে। যেই... প্রাণীটা আপেলটাতে কামড় দিয়েছিল তার দাঁতের ছাপ পাওয়া গেছে। প্রাণীটার দাঁতের গঠন খুবই বিচিত্র।এছাড়া কিছু লুব্রিকেটিং পদার্থ পাওয়া গেছে যেটা আমাদের লালায় প্রাপ্ত লুব্রিকেটিং পদার্থের স্টেরিও আইসোমার, এছাড়া কিছু এসিড ভিত্তিক জৈবিক রিএজেন্ট পাওয়া গেছে যেগুলো এনজাইমের সমতুল্য।'
"তার মানে এটা অন্য কোনো প্রাণীর কামড়, অন্য কোনো গ্রহের অন্য কোনো প্রাণী?"
"অন্য কোনো গ্রহের না, এমিস। হয়তো অন্য কোনো ইউনিভার্সের।'
"অন্য ইউনিভার্সের?" বিস্ময়ে ফেটে পড়লেন এমিস। "আপনি বলতে চাইছেন যে, টেলিপোর্টের সময়ে আপেলটা অন্য কোনো ইউনিভার্স হয়ে গিয়েছে? মাল্টিভার্স থিওরি সত্যি?"
"আমি কিছুই বলতে চাইছি না এমিস, আমি শুধু অনুমান করছি। বিজ্ঞান একাডেমিকে খবর দাও এবং জীববিজ্ঞান পরিষদে আপেলটিকে হস্তান্তর করতে বলো । জীববিজ্ঞান পরিষদের গবেষণায় হয়তো প্রাণীটির সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে।তখন এটাও বোঝা যাবে প্রাণীটি কোন সম্ভাব্য পরিবেশে থাকতে পারে।'

এমন সময় পাশে থেকে একজন গবেষণারত ছাত্র বিস্ফোরিত চোখে তার কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থেকে খানিকটা চেঁচিয়ে বলল, "প্রফেসর!"
প্রফেসর ও এমিস ঘুরে তাকালেন তার দিকে।ছাত্রটি বলল,
"আপেলটির খাওয়া অংশের ভেতরের দিকে অনেকগুলো মাইক্রোস্কোপিক ডট পাওয়া গেছে, সেগুলো বাইনারি তথ্য বহন করছে।আস্কি কোড অনুযায়ী ডিকোড করলে যেই লাইনটা হয় সেটা হলো-

"COME HERE EMIS!"

এমিস বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বলতে পারলেন না।

৩.
পরের কয়েকদিন অনেক উত্তেজনায় কাটল বিজ্ঞান একাডেমির সবার, জীববিজ্ঞান পরিষদ প্রাণীটার সম্পর্কে কিছু ধারণা দিলো। প্রাণীটির বেশ ধারালো দাঁত আছে তাই ধরে নেওয়া যায় সে অন্য প্রাণিদের খেয়ে বাঁচে।তার লালায় কিছু অ্যাসিড ভিত্তিক জৈবিক রিএজেন্ট পাওয়া গেছে যেগুলো মূলত নাইট্রোজেন ও সালফারের পলিমারকে ভাঙতে পারে। যেহেতু লালাতেই এই রিএজেন্ট পাওয়া গেছে তাই ধারণা করা যায় প্রাণীটি মূলত শক্তি সংগ্রহ করে সালফার নাইট্রোজেন গঠিত পলিমার ভাঙার মাধ্যমে।তাই প্রাণীটির গ্রহের অন্য কোনো জীবের দেহ অবশ্যই সালফার নাইট্রোজেনের পলিমার গঠিত হতে হবে।এমন কি ওই প্রাণীটির নিজের দেহও সালফার নাইট্রোজেন পলিমার গঠিত হতে পারে। পৃথিবীর পরিবেশে এই ধরণের যৌগ খুব একটা স্থায়িত্ব প্রদর্শন করে না, তাই ধারণা করা যায় প্রাণীটির গ্রহের পরিবেশ পৃথিবী থেকে ভিন্ন।

এই ধরণের যৌগ স্থায়িত্ব লাভের জন্য একটি গ্রহের পরিবেশ কেমন হওয়া প্রয়োজন তা বের করা হলো এবং সেই গ্রহে টিকে থাকার জন্য একটি প্রাণী'র শারীরিক গঠন কেমন হওয়া প্রয়োজন তার একটি মডেল তৈরি করা হলো। এরপর প্রানিটির লালায় লুব্রিকেন্টের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো।আর সেই পরিমাণ থেকে ধারণা করা হলো।এতটুকু পিচ্ছিল পদার্থের সংস্পর্শে এসে খাদ্য কতটুকু দূরত্ব বিনা বাধায় অতিক্রম করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রাণীটির

খাদ্যনালির দৈর্ঘ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল এবং প্রাণীটির আকার আকৃতি সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা পাওয়া গেল।আপেলের মধ্যে থাকা দাঁতের ছাপ ব্যবহার করে প্রাণীটির চোয়ালের মডেল তৈরি করা হলো। আপেলের কোন কোন জায়গায় লালা পাওয়া গেছে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রাণীটির চোয়ালের কোথায় লালা নিঃসরণকারী গ্রন্থি অবস্থিত তা বের করা হলো এবং সবশেষে সবগুলো তথ্য সমন্বয় করে প্রাণীটি দেখতে কেমন হতে পারে, তার একটা ত্রিমাত্রিক মডেল বানানো হলো।মডেলটি দেখে বোঝা গেল প্রাণীগুলো দেখতে এত ভয়ংকর না হলেও মোটামুটি বিচিত্র। শুধুমাত্র একটা আধ-খাওয়া আপেল থেকে এত তথ্য বের করা সম্ভব সেটা সম্পর্কে এমিসের ধারণাও ছিল না তাই তিনি যারপরনাই অবাক হলেন।

আরো বেশি তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রফেসর বিশেষভাবে তৈরি একটা ক্যামেরা একইভাবে টেলিপোর্ট করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রথম টেলিপোর্টেশনটি যেই সময়ে সম্পন্ন হয়েছে ঠিক সেই সময়ে বিজ্ঞানী এমিস প্রায় সকল প্যারামিটার আগের মতো রাখার চেষ্টা করে ক্যামেরাটি টেলিপোর্ট করলেন।তাঁর মনে প্রবল অস্বস্তি।অন্য একটি মহাবিশ্বের অজানা কোনো গ্রহের একটি প্রাণী তাঁর গ্রহের তথ্য আদান প্রদানের কৌশল ব্যবহার করে তাঁর গ্রহের ভাষায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, বিষয়টি অবশ্যই অত্যন্ত অস্বস্তির।যাই হোক, ক্যামেরাটি অক্ষত অবস্থায়ই স্যাটেলাইটে টেলিপোর্ট হলো। টেলিপোর্ট হওয়ার পর ক্যামেরাটিতে আটত্রিশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও রেকর্ডিং পাওয়া গেল। ভিডিওটি কম্পিউটারে এক্সট্র্যাক্ট করে বিজ্ঞানী এমিস ও প্রফেসর একে অপরের দিকে একবার তাকালেন।তারপর ভিডিওটা প্লে করে দিলেন।

ভিডিওর প্রথম কয়েক সেকেন্ডে প্রচন্ড শক্তি নিঃসরণের কারণে কিছু বিক্ষেপ দেখা গেল।এরপর একটা আবছা অন্ধকার টানেলের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে ঘুরতে ছুটে যেতে দেখা গেল ক্যামেরাটাকে। হঠাৎ করেই ক্যামেরাটা থেমে গেল আর সামনে দেখা গেল একটা দেয়াল। গাঢ় বেগুনি রঙের একটা দেয়াল, দেয়ালটির কোনো শুরু নেই, শেষ নেই।কালো রঙের বিচিত্র সব কারুকাজ করা হয়েছে দেয়ালটিতে।এমিস বেশ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে রইলেন দেয়ালটির দিকে।তাঁর মনে হলো দেয়ালটিতে কোনো ধরণের রহস্যময়তা আছে, কোনো অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে। এরপরে দেখা গেল সেই প্রাণীগুলোকে। জীববিজ্ঞান পরিষদের বানানো মডেলের সাথে অনেকটাই মিলে যায় প্রাণীগুলোর দৈহিক গঠন।ভিডিওতে দেখা গেল অনেকগুলো প্রাণী একসাথে দাঁড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলছে,

"EMIS, WE NEED YOU."

বিস্ফোরিত চোখে এমিস ও প্রফেসর তাকালেন একে অপরের দিকে। এরপর দেখা গেল ওই প্রাণিদের-ই একজন একটা আপেলে কামড় দিচ্ছে, সেই আপেলটাই! কামড় দিয়ে সেই প্রাণীটি কামড়ানো অংশটা মুখ থেকে বের করে পাশের একটা পাত্রে রাখল।এরপর ক্যামেরার লেন্সের দিকে তাকিয়ে বলল,

"COME HERE EMIS!"

এরপর ক্যামেরাটা আবার প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে থাকে।এবং শেষে স্যাটেলাইটের ইরিডিয়াম চেম্বারের দৃশ্য দেখা যায় স্ক্রিনে।

ভিডিও শেষ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বলল না।এরপর প্রফেসর বললেন,
"প্রথমেই নিশ্চিত কর এই ভিডিওটি এই ক্যামেরার রেকর্ড করা কি না।আমার মনে হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য এই ভিডিওটা ক্যামেরার মেমোরিতে রেখে দিয়েছে, ভিডিওটা দেখে আমার মোটেই রেকর্ডেড ভিডিও মনে হচ্ছে না।"
পাশ থেকে একজন ছাত্র বলল,
"না, প্রফেসর।ভিডিওটার কোডেক আর এনক্রিপশন পদ্ধতি দেখে নিশ্চিত করা হয়েছে, এইটা এই ক্যামেরায়ই ধারণকৃত।"
প্রফেসর নিঃশব্দে বসে রইলেন। কোনো কথা বললেন না। বেশ অনেকক্ষণ পরে বিজ্ঞানী এমিসের কণ্ঠ শোনা গেল। ক্লান্ত গলায় তিনি বললেন,
"প্রফেসর, আমার কয়েকদিনের ছুটি দরকার।"
প্রফেসর হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললেন,
"হুম, আসলেই তোমার একটু বিশ্রাম দরকার। যাও, তোমার বাসায় যাও।"

৪.

এমিস বাসায় ফিরে এলেন। তাঁর মাথায় হাজারো প্রশ্ন। ওই প্রাণীগুলো কীভাবে তাঁর নাম জানে? কেনই-বা তাঁকে আসতে বলল? পৃথিবীর প্রযুক্তি ও ভাষা সম্পর্কে প্রাণীগুলো ধারণা পেলো কীভাবে?

না, এগুলো এখন ভেবে কোনো লাভ নেই। এগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।বাসা থেকে বের হয়ে একটা খাবারের দোকানে গিয়ে খাবার খেলেন এমিস। তারপর একটা স্নায়ু শিথিল করার পানীয় কিনলেন, সেটাতে চুমুক দিতে দিতে বাসায় ফিরলেন। তারপর টলতে টলতে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

রাত দেড়টার দিকে ঘুম ভেঙে গেল এমিসের।খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।দেখেছেন আজকের ভিডিওতে দেখা সেই দেয়ালটাকে।সেটার একপ্রান্ত ধরে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি, দেয়ালটার শেষ প্রান্ত বের করতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন না! হাঁপাতে হাঁপাতে বিছানার পাশে রাখা গ্লাস থেকে পানি খেলেন এমিস।হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসলো বিজ্ঞানী এমিসের।ভয়ংকর একটি সম্ভাবনা! দ্রুত হেঁটে গেলেন তিনি তাঁর লিভিং রুমে রাখা কম্পিউটারের দিকে।কম্পিউটারের মডেলিং সফটওয়্যার ওপেন করে আঁকা শুরু করলেন একটা বেগুনি রঙের দেয়াল। আদি-অন্তহীন একটা বেগুনি রঙের দেয়াল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আঁকা শেষ হয়ে গেল এমিসের।আঁকা শেষ করে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন এমিস।অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলেন উনার ধারণাই সঠিক।তাড়াতাড়ি কাবার্ড এর একটা গোপন কুঠুরি থেকে একটা সার্ভাইভাল স্যুট বের করলেন এমিস।এই স্যুট মানুষকে যেকোনো পরিবেশে প্রায় ষোল ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে পারে।স্যুটটা দ্রুত পরে তিনি রওনা দিলেন বিজ্ঞান একাডেমির ভবনের দিকে। টেলিপোর্ট রুমে পৌঁছে রিঅ্যাক্টরগুলো চালু করলেন তিনি।এরপর লেজারগুলোর কাউন্ট-ডাউন স্টার্ট করে এগিয়ে গেলেন ইরিডিয়ামের চেম্বারটির দিকে।

৫.

বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির ভবনে নিজের কেবিনে বসে আছেন প্রফেসর।আজকের ঘটনাবলি নিয়ে এখনো ভাবছেন তিনি। সেই ভিডিওটা চালালেন তিনি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেন। কী যেন ভেবে আবার চালালেন তিনি। যখন দেয়ালটা দেখানো হলো তখন ভিডিওটা থামালেন প্রফেসর। এরপর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন কম্পিউটার স্ক্রিনের দেয়ালটার দিকে। বিষয়টা সম্ভবত তিনি ধরতে পেরেছেন।তাঁর একটা প্রজেক্ট ছিল, কোনো ছবিতে বুদ্ধিমান প্রাণী কোনো তথ্য সংরক্ষণ করে রাখলে ছবিটা বিশ্লেষণ করে সেই তথ্যটা বের করা। সেই প্রজেক্টটা ওপেন করে তিনি দেয়ালের ছবিটা বিশ্লেষণ করতে দিলেন।কিছুক্ষণ মৃদু শব্দ করে কম্পিউটার তাঁকে যে তথ্যটা দেখাল, সেটা দেখে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল প্রফেসরের। নিজের অফিস থেকে বের হয়ে তিনি ছুটে গেলেন টেলিপোর্ট রুমের দিকে।এমিসকে থামাতেই হবে।কিন্তু দেরি করে ফেলেছেন তিনি। যতক্ষণে তিনি টেলিপোর্ট রুমের কাছাকাছি পৌঁছালেন, ততক্ষণে সবগুলো লেজার চালু হয়ে গেছে।লেজারের তীব্র আলো টেলিপোর্ট রুমের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। টেলিপোর্ট রুমে ঢুকে প্রফেসর দেখলেন রুমটা খালি।অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকলেন তিনি ইরিডিয়ামের চেম্বারটার দিকে।

সাড়ে আট সেকেন্ড পর বিজ্ঞানী এমিসের নিথর দেহ টেলিপোর্ট হলো ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার উপরের স্যাটেলাইটটিতে ।তাঁর দেহের চামড়ার নিচে, মাংসপেশির মধ্যে, হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠে, মস্তিষ্কে ,হাড়ের ভেতরে সহ আরও নানা জায়গায় পাওয়া গেল অনেকগুলো আপেলের টুকরো। সবগুলো টুকরো ওই আপেলটা থেকে কামড়ে নেওয়া অংশটার সাথে হুবহু মিলে যায়।আপেলের টুকরোগুলোর মধ্যে বাইনারি ডটের মাধ্যমে লেখা ছিল

“THANK YOU, EMIS.”

মুভি: First Man (2018)

IMDb Rating: 7.3/10

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

ছোটবেলায় নিউটন, আইনস্টাইনের নাম জানারও আগে যে লোকটার নাম জেনেছি সে হলো "নীল আর্মস্ট্রং" (Neil Armstrong) , চাঁদে পা রাখা প্রথম ব্যক্তি। আমার ছোটদের সাধারণ জ্ঞান বইয়ে স্পেস-স্যুট পরা তার দারুণ এক ছবি ছিল।শিশুসুলভ আগ্রহ নিয়ে অবাক বিস্ময়ে সেটা দেখতাম, সেখান থেকেই সম্ভবত বিজ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার শুরু।

যাইহোক, এটা কোনো ফিকশনাল মুভি নয় কিন্তু এর কাহিনী রোমাঞ্চকর কাহিনী তরুণ নীল আর্মস্ট্রংকে নিয়ে যিনি দুই বছরের শিশু সন্তানের অকাল মৃত্যুর দুঃখ ভুলতেই যোগ দেন অ্যাপোলো মিশনে। ভাবুন তো,সে যখন স্পেস-স্যুট গায়ে দিয়ে এমন এক উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বাইরে যাত্রা করল যেটা এর আগে কেউ করেনি, তখন তার অনুভূতি কেমন ছিল।

আমেরিকা যখন সোভিয়েতকে হারাতে যাচ্ছে, নীল যখন চাঁদের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে, সেসময় একজন পৃথিবীতে থেকেই অস্থিরতায় ভুগছে, টিভিতে চোখ রাখছে, অন্যদের কাজ থেকে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করছে ।তার আমেরিকা - সোভিয়েতের হার-জিত নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, সকল চিন্তা নীলকে নিয়ে, "সে ঠিক আছে তো? "।সে হলো নীলের জীবন-সঙ্গিনী।

চন্দ্রজয়ের কাহিনী আপনার জানা থাকলেও, মুভিটার কাহিনী আপনাকে নতুন আঙ্গিকে ভাবাতে শুরু করবে।

"I don't know what space exploration will uncover, but I don't think it'll be exploration just for the sake of exploration. I think it'll be more the fact that it allows us to see things. That maybe we should have seen a long time ago. But just haven't been able to until now"

-Neil Armstrong

সূর্যগ্রহণ ও বাংলাদেশ

আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ

সময়টা ২০০৯ এর ২২ জুলাই।
বাংলাদেশে একটা মহাজাগতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। পঞ্চগড়ে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে আগে থেকে প্রস্তুত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, সাংবাদিক, পর্যটক আর আকাশ প্রেমীরা।
মহাজাগতিক ঘটনাটা হলো পূর্ণ সূর্যগ্রহণ।২০০৯ সালের পর পূর্ণ সূর্যগ্রহণ বা বলয়গ্রাস দেখার জন্যে আমাদের আরো অপেক্ষা করতে হবে ৪৪ বছর। ২০৬৪ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি আবার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।এই ৪৪ বছরে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা না গেলেও কয়েকটা বড়সড় আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। তার মধ্যে একটা দেখা যাবে এই বছরের ২১ এ জুনে। শুধু সূর্যগ্রহণ না,দুইটা ঘটনার সাক্ষী হতে চলেছে বিশ্ববাসী।

২১ এ জুন,বছরের সবচেয়ে দীর্ঘতম দিন যাকে ভূগোল বিজ্ঞানের ভাষায় বলে সামার সলস্টিস, সেই ২১ এ জুন দেখা যাবে এই আশ্চর্য প্রাকৃতিক ঘটনা অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ।এই সূর্যগ্রহণ আফ্রিকার কঙ্গো থেকে অস্ট্রেলিয়ার পাপুয়া নিউ গিনি পর্যন্ত দেখা যাবে। সর্বোচ্চ গ্রহণ হবে ভারতে।

সকাল ৯টা ৪৬ মিনিট ৬ সেকেন্ডে কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের ইম্পফোন্ডো শহরের আকাশে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে।কেন্দ্রীয় গ্রহণ শুরু হবে ১০ টা ৪৮ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে কঙ্গোর বোমা শহরের আকাশে। সর্বোচ্চ গ্রহণ ঘটবে ভারতের যোশীমঠ শহরে ১২টা ৪০ মিনিট ৬ সেকেন্ডে।সর্বোচ্চ গ্রহণের সময় এর সর্বোচ্চ মাত্রা .৯৯৩৬ থাকবে। কেন্দ্রীয় গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৩১ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে ফিলিপাইনের সামার শহরে।সূর্যগ্রহণ শেষ হবে বিকেল ৩টা ৩৪ মিনিটে ফিলিপাইনের মিন্দানাও শহরের আকাশে।

বাংলাদেশ থেকেও আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে।ঢাকা থেকে প্রায় ৭০% পর্যন্ত গ্রহণ দেখা যাবে।

ঢাকায় ১১টা ২৩ মিনিট ৩ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ১২ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫২ মিনিট ৩ সেকেন্ডে।

ময়মনসিংহে ১১টা ২৩ মিনিট ২ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ১২ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫১ মিনিট ২ সেকেন্ডে।

চট্টগ্রামে ১১টা ২৮ মিনিট ১২ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ১৭ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ডে।

সিলেটে ১১টা ২৭ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ১৬ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ডে।

খুলনায় ১১টা ২০ মিনিট ১৯ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ৯ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫০ মিনিট ৯ সেকেন্ডে।

বরিশালে ১১টা ২৩ মিনিট ৫ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ১২ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৫২ মিনিট ১ সেকেন্ডে।

রাজশাহীতে ১১টা ১৭ মিনিট ১৪ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ৬ মিনিট ২৬ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৪৭ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডে।

রংপুরে ১১টা ১৭ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে সূর্যগ্রহণ শুরু হবে, কেন্দ্রীয় গ্রহণ ঘটবে দুপুর ১টা ৭ মিনিট ২০ সেকেন্ডে এবং গ্রহণ শেষ হবে দুপুর ২টা ৪৮ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে।

ঢাকার আকাশে সূর্যগ্রহণটি দেখা যাবে ৭০.১৪%
চট্টগ্রামে ৬৫.১৩%
বরিশালে ৬৬.২০%
খুলনায় ৬৬.৫৩%
রাজশাহী ৭২.৪৬%
ময়মনসিংহে ৭৪.২২%
সিলেটে ৭৫.১২%
রংপুরে ৭৭.৬৪%
সবচেয়ে বেশি দেখা যাবে পঞ্চগড়ে ৮০.২২% যার গ্রহণ মাত্রা ০.৮৪৫২
সূর্যগ্রহণের মাত্রা ঢাকায় ০.৭৬৪৩
চট্টগ্রামে ০.৭২৩৫
বরিশালে ০.৭৩৫৩
খুলনায় ০.৭৩৪৯
রাজশাহীতে ০.৭৮৩
ময়মনসিংহে ০.৭৯৭২
সিলেটে ০.৮০৪৪
রংপুরে ০.৮২৪৬

এই বছরের সূর্যগ্রহণ মিস হয়ে গেলে আবার সূর্যগ্রহণ দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ১১ বছর।
২০৩১ এর ২১ এ মে আবার সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে। যার গ্রহণ ঢাকা থেকে দেখা যাবে ৪২.১৬%।
২০৩৪ ও ২০৩৫ এ আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে যা যথাক্রমে ৫৭.৯০% ও ৪২.৬৪%।
এছাড়া ২০২১, ২০২৭ ও ২০৩১ সালে সূর্যগ্রহণ হলেও,ঢাকা থেকে গ্রহণের ০.৪৬%, ৩.২৭% ও ১.২৭% দেখা যাবে।অর্থাৎ না দেখার সম্ভবনাই বেশি।
সুতরাং এবার মিস করলে এতবড় গ্রহণ দেখার জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সতর্কবার্তা: খালি চোখে সূর্যগ্রহণ দেখবেন না।
কালো চশমা, এক্সরে ফিল্ম বা কালার ফিল্ম দিয়ে সূর্যগ্রহণ দেখবেন না।
ক্যামেরা বা টেলিস্কোপ দিয়েও সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাবেন না। অবশ্যই কালো গ্লাস ব্যবহার করবেন।

টোয়াইস

মনিফ শাহ চৌধুরী

শিলা বৃষ্টি থামতেই বাগান বুড়ো ছুটে গেল আম বাগানের দিকে। বরফের পুরু আস্তরণের ভেতর পা গেড়ে লাফিয়ে চলা যেকোনো সত্তর ছুঁই ছুঁই বৃদ্ধের পক্ষে অসম্ভব সেই ধারণাকে কাঁচকলা দেখিয়ে মোটা জ্যাকেট চাপানো শরীরটাকে উর্ধ্বগতিতে টেনে নিয়ে চলল বাগান বুড়ো।

নিজের দোতলা বাসভবন থেকে একটা ফুটবল মাঠের দূরত্ব পরেই তার বাগান শুরু। আম, কাঁঠাল , লিচু, পেয়ারা, কমলা, বেল, কামরাঙা, বরই, জাম, নারিকেল, তালসহ সব মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশটা ফলের বাগান ছিল। সাথে চারদিক দিয়ে ঘেরাও করে রুদ্রপলাশের ঔদ্ধত্য! ছিল। এখন হাড্ডিসার আমবাগানই শেষতক শ্বেত-হতাশার মাঝে এক টুকরো সবুজ ইতিহাসের রেকর্ড রাখা অ্যালবাম , যেটার ছবিগুলো দিনকে দিন ঝাপসা হয়ে আসছে।

বাগান বুড়ো আমবাগানের সীমানায় দাঁড়িয়ে চারপাশ পরখ করে নিচ্ছে। অনেক পাতা ঝরে পড়েছে। কয়েকটার ডাল ভেঙে গেছে। আম থাকলে একটাও আস্ত থাকত না। এখন আমের ঋতু না। অবশ্য এখন শিলাবৃষ্টিরও ঋতু না।

ঘেউ, ঘেউ।
হাস্কিটা হয়তো পিছু পিছু দৌড়ে এসেছে। এমন আবহাওয়ায় ওর চেয়ে খুশি আর কে? অথচ বছর দুয়েক আগে বিলেত ফেরত মেয়ে যখন এটাকে রাখতে দিয়েছিল, বাগান বুড়োর অসম্মতি জানানো প্রথম বাক্য ছিল, “আরে, এই গরমের দেশে এই কুত্তা বাঁচবি না!”

হাস্কিকে সাথে নিয়ে ভেঙে পড়া ক্ষয়িষ্ণু ডাল কুড়াতে লেগে গেল বুড়ো।এই বাগানে মোট দেড়শটা আম গাছ ছিল ।তার মাঝে এখন টিকে আছে মাত্র তেরোটা।

তার মেয়ে তাকে প্রায়ই বলে- "বাবা, আমার সাথে বিলেত চলো। ওখানে ঠাণ্ডাকালীন গাছ আছে অনেক।তুমি ওখানে বাগান করো । বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাও আছে বাবা।"
তবে বুড়ো নিজের সিদ্ধান্তে অটল।যে বিলেত তাঁর প্রিয় বাগানের এই করুণ দশা করেছে তাদের দেশে সে মরে গেলেও পা রাখবে না।

অদূরে সবার বাড়ির ওপর থেকে ধোঁয়া দেখা যায়।রাস্তায় রাস্তায় প্লাস্টিক পুড়িয়ে গা গরম করে নিচ্ছে সবাই। জ্যাকেট বিতরণ কর্মসূচিতে জ্যাকেট পেয়ে বারো নম্বর রোডের ভিখারি ছেলে ফোকলা মুখে বহু কষ্টে ক্যামেরায় তার অপাঙ্ক্তেয় হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে।না হাসি, আর না ক্যামেরার ফ্ল্যাশ, কোনোটাই এই শীতের তুলনায় উষ্ণ নয়।

বাগান বুড়ো হাতে করে সেই ডালগুলো ভিখারি ছেলের হাতে তুলে দিলো। দিয়ে উল্টো পথ ধরলো। উপাসনালয়গুলোতে আজকাল ভীড় হয় প্রচুর।তার একটা কারণ একমাত্র উপাসনালয়গুলোতেই হিটারের ভেতর অনেকক্ষণ বসে থাকা যায়।
প্রার্থনাও হয় বৈকি।

পথিমধ্যে দেখা হয় অমুক বাড়ির তমুকের সাথে।হ্যান্ডশেকগুলো আজকাল দীর্ঘ করা হয়।" কী খবর চাচা, কুত্তা লইয়া কই হাঁটেন ?"
"এইতো সামনে।"
"চাচার বাগানের লাগি মন পোড়ে । আহা! কী আছিল!" কথাটা বলার সময় চেহারায় অবশ্যই দুঃখভাব বজায় থাকে।
"তয়, তোমাগো খবর কও। খালি মসজিদেই সমাবেশ করি যাবা?"
"হ চাচা।মানুষদের সচেতন করা লাগবি না? আজ পুরা পৃথিবীর এহেন অবস্থার জন্য দায়ী কে? গজব নয় কন?!"
"সেটা ঠিক আছে।গজবের মালিক গজব সরাইয়া দিব।তয় যারা এইটার জন্যে সরাসরি দোষী, বিলেতবাসীরা জবাবদিহি করে না, ক্ষতিপূরণ দেয় না, সেইটা নিয়া কিছু কও না?"
"চাচা সে টেনশন কইরেন না।সামনে দেখবেন রাস্তায় নামব।"

মাস যায়, ক্যালেন্ডারের পাতা ওল্টায়, কেউ রাস্তায় নামে না।তীব্র শীতের ঝাঁপটা একেবারে ভেতরটা নাড়িয়ে দিয়েছে সবার।দেশে এখন সবার মাথায় আগামীকাল কী খাবে তাই নিয়ে চিন্তা।এসব আন্দোলন, অনশনের চিন্তা করার মতো নবাবি সময় তাদের নেই। প্রয়োজনে না খেয়ে থাকবে, তবু অনশন করবে না।

দক্ষিণ- পূর্ব কোলের ছোট্ট দেশটি একটা ভয়ানক সত্য আবিষ্কার করল।সেটা হলো , তারা সবাই অলস।প্রকৃতি তাদের শুরু থেকেই বিশ্বের সবচেয়ে উর্বর মাটি আর আবহাওয়া দিয়ে রেখেছিল।তাই কৃষিকাজের কষ্ট তাদের সেভাবে করতে হয়নি কখনই।সাতশ নদী যে দেশের বুকে বয়ে চলে সে দেশের মানুষেরা মাছের ওপর নির্ভরশীল থাকবে অবশ্যই।
আর তাই প্রাক্ -উষ্ণ সময়ের পর যেদিন প্রায় হঠাৎ-ই তাপমাত্রা কমতে কমতে শূন্যের নিচে আরো ত্রিশ স্তর নিচে নেমে গেল তখন বিশ্বের শীর্ষ মাছ রপ্তানিতে পঞ্চম দেশটির বুকে নেমে এলো দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক মন্দা।
বহির্বিশ্বের ত্রাণের শুকনো খাবারের যোগান আঠারো কোটি মুখের জন্য যথেষ্ট হলো না। তাই মুখের সংখ্যা কমতে থাকল। সাদা পাপোশের ওপর ময়লার দানার মতো বরফের ওপর পড়ে রইল মৃত মানুষ, মৃত কাক, কুকুর।মাস যায়, লাশ পচে না।
কয়েক কিলোমিটার নিচে পাইপ বসিয়েও কোনো পানি ওঠে না। যে রিসোর্টগুলো ভূগর্ভস্থ মিঠা পানির সুইমিং পুলের বিজ্ঞাপন দিত তারাও একপর্যায়ে বাধ্য হলো তা সরিয়ে নিতে।

বাগান বুড়ো এতশত জানে না।সে জানে তার বাগান নেই।হাতে ব্যাগভর্তি সদাই-পাতি নিয়ে সে বের হয়। সার, ৩ কেজি মুরগি আর এক লিটার পেট্রোল ।এই দিয়ে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত চলা যাবে।

"এই শুনছো? তারা নাকি মেশিনগুলো ঠিক করে ফেলেছে শেষ পর্যন্ত।আর কয়েকদিনের ভেতরেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবে সবকিছু।"
পথে যেতে যেতে কথাটা কানে যায় বাগান বুড়োর।মনের ভেতর কি কোনো আশা উঁকি দিয়ে ওঠে?
ব্যাগ শক্ত করে ধরে হাঁটতে থাকে বুড়ো।

বাগানের অবস্থা ভালো না।সব গাছ মারা গেছে।সে ব্যাগ ফেলে দিয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকে কিছুক্ষণ।আর কোনো আশাই বাকি নেই।সব শেষ।

খবরে দেখায় ইউএন এর একটা ক্যাম্প করা শহরে।ক্ষতির হিসেব করাই তাদের কাজ।আর শুধু আশার কথা শুনিয়ে যাওয়া।ক্ষতির হিসেব নিতে বাগানবুড়োর কাছে কিন্তু কেউ আসেনি।

স্কুল-কলেজ বন্ধ, চাকরি বন্ধ। ইউনিভার্সাল বেসিক ইনকামের আবেদনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বহু পুরুষ-নারী। একপাশে রিলিফের ত্রাণ , অপর পাশে ইউএন ক্যাম্প।দ্বিতীয়টাতেই মানুষের আগ্রহ বেশি।

বাগানবুড়ো গেল ক্যাম্পের দিকে।গিয়ে জানালো তার বাগানের কথা। এলাকায় সবচেয়ে বড় বাগানের মালিক ছিল সে। তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা জানতে চাইলো।
জানানো হলো, "আপনাকে বিনিময়ে দশটা ইউক্যালিপটাস চারা দিতে পারি।আমরা আন্তরিক দুঃখিত।"
"চারা নিয়ে আমি কী করব?" বুড়ো বলে।
"ইউক্যালিপটাস অনেক শক্ত গাছ।ঠাণ্ডায় টিকে যাবে।"
"তাই বলে পাঁচ হাজার গাছের বিনিময়ে মাত্র দশটা চারা?"
"আপনার সরকারের কাছে আবেদন করুন,"জানানো হলো, "আর্থিক সহযোগিতা তারাই করতে পারবে।"

"আর্থিক? টাকা দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যাবে? এত সহজ?"
"আহা! আর বিরক্ত করবেন না তো! আরো অনেক মানুষ আছে। কয়েকদিনের ভেতর মেশিন ঠিক করে সব আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।এবার সরে দাঁড়ান !"

বুড়োর গা কাঁপতে থাকে রাগে।ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।কিছু একটা করতেই হবে।এভাবে জবাবদিহিতার বাইরে তারা থাকতে পারে না।জবাব দিতে হবে।

হঠাৎ-ই হাতের পেট্রোলের বোতল সবটা খালি করে ছড়িয়ে দিলো সে ক্যাম্পের চারপাশে।লাইটার জ্বেলেই আগুন ধরিয়ে দিলো। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকল সবকিছু। হাতের ডালে আগুন কুড়িয়ে আরো ভেতরে যেতে চাইল বুড়ো।আরো জ্বালতে হবে। ধুপ! একটা শব্দ, আর সাথে সাথে নিচে পড়ে গেল বুড়ো।শরীরের সব শক্তি যেন নিমিষেই এক ফুটো দিয়ে বের হয়ে গেল।এক এক করে গার্ডরা এগিয়ে আসছে তার দিকে।বুড়োর চোখ বুঁজে আসছে।

শেষ দৃশ্যে চারপাশে আগুন দেখে বুড়োর দুচোখ বহুদিন পর উষ্ণ হলো ।এ আগুন ছড়াবে।বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে।এক এক করে এখন অনেকে চাইবে জবাবদিহিতা।কতজনকে গুলি করবে তারা?

মিডিয়ায় ঢালাও করে প্রচার হলো বাগান বুড়োর কথা, তার শখের বাগানের কথা।বিদ্রোহ শুরু করার কারণে তার বাগান অমর হয়ে যাবে।

কিছুদিন পর।
মেশিনগুলো আবার চালু করা হলো ।তাপমাত্রা বাড়তে লাগল। সব ঠিক হয়ে যাবে এবার।
বরফ গলতে লাগল।সবাই খুশি।

খুশির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলল পানির স্তর।
বঙ্গোপসাগর ডুবিয়ে দিলো একসময়ের শ্যামাসুন্দর দেশটার দুই-পঞ্চমাংশ।

মিনি সাই-ফাই

রিটিন - "আমরা সম্ভবত মহাবিশ্বের গর‍্যান্ড সিস্টেম প্রোগ্রামারের সার্ভারের সাথে কানেক্টেড হতে পেরেছি, যার কোড করা প্রোগ্রামের কারণেই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব বিদ্যমান।"

অতঃপর পরম সত্যের জন্য গ্র্যান্ড প্রোগ্রামারকে বার্তা পাঠালো রিটিনের কমিউনিকেশন দল।

প্রত্যুত্তরে জানানো হলো - "সেটা তো আমিও খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

-সিয়ামুজ্জামান শুভ

নাঈম হোসেন ফারুকী

-আগুন কি জিনিস? খায় না মাথায় দেয়? এটা কি শক্তি? এটা কি প্লাজমা?

-ফেললেন তো বিপদে।আগে দুইটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করি।

বাংলায় আমরা আগুন বলেই খালাস।ইংরেজিতে দুইটা টার্ম আছে। Fire আর Flame. একটাকে কি আগুন আরেকটাকে শিখা বলা উচিত? হয়তো।

আগুন (fire) হচ্ছে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া। এমন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যেখানে জারণ (oxidation) হয়, তার ফলে অনেক তাপ, আলো ইত্যাদি বের হয়।এই বিক্রিয়া একদিকে শুরু হলে চারপাশে ছড়িয়ে পরে।

আগুনের শিখা (flame) হচ্ছে গ্যাস। গরম গ্যাস, সেখানে ইলেকট্রন এক স্তর থেকে অন্য স্তরে দৌড়াদৌড়ি করে।উচু স্তর থেকে নিচু স্তরে ব্যাক করলে সে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির আলো ছাড়ে, আমরা ওই আলো দেখি।আগুনের শিখা আমাদের পরিচিত পদার্থ, এটা অপদার্থ না, শক্তিও না।

প্লাজমা হলো প্রায় সম্পূর্ণ আয়নিত গ্যাস। ধরেন যে, একটা পরমাণুর শেষ কক্ষপথ থেকে সবগুলো ইলেক্ট্রন বাইরে বের হয়ে ঘুরাঘুরি করছে, আর বাকী পরমাণুটুকু আলাদা ঘুরছে, সেটাকে বলব আমরা প্লাজমা।বেশি গরম আগুনে প্লাজমা থাকতে পারে।

আগুনের শিখা থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে।জ্বলন্ত কয়লায় শিখা থাকে না।

আগুন খাওয়া বা মাথায় দেওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বাসায় ট্রাই করা উচিত না।

প্রশ্নঃ অক্সিজেন ছাড়া কি আগুন জ্বলে না?
উত্তরঃ আবারো বিপদে ফেললেন। এইটার উত্তর নির্ভর করে আগুনের সংজ্ঞার উপর।

ধরেন, একজন কট্টরপন্থী কেমিস্টকে ডেকে আনলাম।
আমি : ভাই সূর্যে তো আলো জ্বলছে অক্সিজেন ছাড়া।শিখাও আছে। ওইটা কি আগুন না?
কট্টরপন্থী কেমিস্টঃ ওইটা সহিহ আগুন না।
আমি : ভাই টাংস্টেন লাইটের কথা ?
কট্টরপন্থী কেমিস্টঃ ওইটাও সহিহ আগুন না।

কাহিনী কি?

কাহিনী হচ্ছে, একটা জিনিস গরম করলেই আলো দিবে।বিক্রিয়া না হলেও চলে। বাতাসকে যথেষ্ট গরম করলেও সেখান থেকে আলো বের হবে।আপনার বাসার টাংস্টেন লাইটের ভেতরে কোন অক্সিজেন নাই, সেটা কিন্তু আলো ঠিকই দিচ্ছে, চারপাশে একটা শিখার মতোও দেখা যায়।আকাশে সূর্য গনগন করে আলো দিচ্ছে। সূর্যে অক্সিজেনের পরিমাণ খুবই কম। হাইড্রোজেনের ফিউসান হয়ে সূর্য দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে জ্বলছে।সেটা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, রাসায়নিক বিক্রিয়া না।

তাহলে আমরা কি বুঝলাম?

আমরা বুঝলাম, আলো দিতে, গ্যাসে আলো জ্বালাতে আগুন লাগে না। যদি শুধুমাত্র জারণ বিক্রিয়া হয়, আর যখন সেখান থেকে আলো আর তাপ বের হয় সেটাকে আগুন বলে।

আবারও কট্টরপন্থী কেমিস্টকে ডাকলাম।
আমিঃ জোনাকির পেছনে তো জারণ বিক্রিয়া হয়। অক্সিজেনও লাগে।জোনাকি কি আগুন জ্বালাচ্ছে?
কট্টরপন্থী কেমিস্টঃ না।যথেষ্ট তাপ হয় নাই।ওইটা সহিহ আগুন না।
আমিঃ আচ্ছা বুঝলাম। কিন্তু অক্সিজেন ছাড়াও তো জারণ হয় নাকি? ক্লোরিন ট্রাইফ্লুওরাইডের তো ভয়াবহ শক্তিশালী শিখা হয়, সবকিছুকে ছারখার করে ফেলে, ওইটা কি আগুন?
কট্টরপন্থী কেমিস্টঃ হ্যাঁ, যেহেতু জারণ হচ্ছে, ওইটাকে আগুন বলা যায়।
অতি কট্টরপন্থী দ্বিতীয় কেমিস্টঃ না।ওইটাও আগুন না।অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলে না।অক্সিজেন ছাড়া যে জিনিস জ্বলছে ওইটা আগুন না।
আমিঃ :X

বুঝেন ঠ্যালা! আমি অবশ্য বাঙ্গালি, আমার জ্বলন্ত গ্যাস দেখলেই আগুন মনে হয়।যে কেমিস্ট বলে সূর্যে আগুন জ্বলে না, তাকে মারতে ইচ্ছা করে।

অনেকক্ষণ বকর বকর করলাম।এইবার একটু শিখা দেখে আসি। একটা শিখা কেমন হবে, তার আকার আকৃতি, রঙ এগুলো নির্ভর করে কি জিনিস জ্বলছে, তাপমাত্রা চাপ কি পরিমাণ আছে তার উপর। আমরা অতো ঝামেলায় না যেয়ে একটা সহজ সরল মোমের আগুন দেখে আসি আজকে।
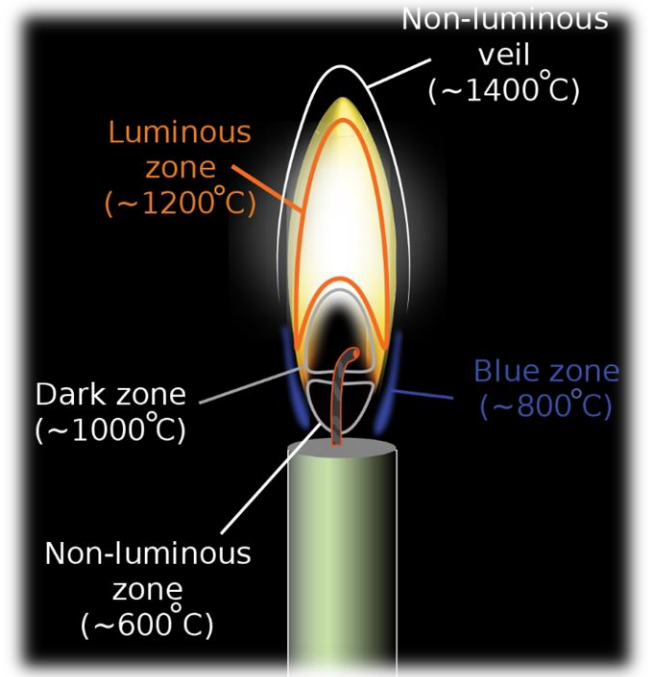
মোমের শিখার ৫টা অংশ।

১। একদম সুতার পাশের নিচের দিকের জায়গাটার নাম Non Luminous Zone । অন্ধকার জায়গা। এই জায়গায় অক্সিজেনের অভাবে কোনো দহন হয় না। দহন না হলেও, তাপমাত্রা থাকে ৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ফুটন্ত পানির তাপমাত্রার প্রায় ৬ গুন।

২। নিচের বাইরের দিকের অংশটার রঙ Blue Zone. এই স্তর প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন পায়।তাপমাত্রা উঠে প্রায় ৮০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।মোম হচ্ছে হাইড্রোকার্বন।এই স্তরে প্রচণ্ড তাপে বড় হাইড্রোকার্বন ভেঙ্গে ছোট ছোট হাইড্রোকার্বন, মুক্ত কার্বন অণু C2 আর হাইড্রোজেন তৈরি হওয়া শুরু হয়।

৩। নীল এলাকার উপরের অংশটা আশেপাশের এলাকার তুলনায় অনেকখানি অন্ধকার। এর নাম তাই Dark Zone. এখানেও হাইড্রোকার্বনের ভাঙ্গন চলতে থাকে, আর ছোট ছোট নানা আকারের কার্বনের ছাই তৈরি হয়।তাপমাত্রা উঠে ১০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো।ভেতরের দিকে হওয়ায় এখানে অক্সিজেনের বেশ অভাব।

৪। Dark Zone এর উপরে মোমের হলুদ উজ্জ্বল অংশটার নাম Luminous Zone. এই জায়গায় কার্বনের অসম্পূর্ণ দহন হয়।তীব্র বিক্রিয়ায় নানান তরঙ্গদৈর্ঘ্যের দৃশ্যমান আলো বের হয়, মানুষের চোখে একে দেখতে হলুদ থেকে সাদা মনে হয়।তাপমাত্রা প্রায় ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৫। উপরের প্রায় অনুজ্জ্বল নীল জায়গাটার নাম Non Luminous Veil. এই স্তর আসলে নিচের নীল অংশটার বাইরের অংশ।মোমের সবচেয়ে গরম জায়গা এইটা।তাপমাত্রা প্রায় ১৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়।প্রচণ্ড তাপে এখানে কার্বনের ছাই পুড়ে চোঽ তৈরি হয়।

একটা সামান্য মোমের শিখা কি পরিমাণ পাওয়ারফুল বুঝতে হলে দেখতে হবে:
১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি ফুটে যায়।
৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে অ্যালুমিনিয়াম গলে।
১০৬৩ ডিগ্রিতে সোনা গলে যায়, ১০৮৪ তে তামা।
খাঁটি লোহার গলনাঙ্ক ১৫৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।তাপমাত্রা ১১০০র উপরে গেলেই কিন্তু নানান জাতের ভেজাল মেশানো লোহা গলতে শুরু করে।

IMDb Rating: 8.6/10

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

Inception আর এই মুভিটার ডিরেক্টর একজনই, ক্রিস্টোফার নোলান। মাস্টারপিস মুভি কিভাবে তৈরি করতে হয় এই লোক তা ভালোভাবেই জানেন। যদি Inception দেখার পর সেটাকে বেস্ট ওয়ার্ক বলে মনে করেন তাহলে বোধহয় এই মুভিটা ধারণা পাল্টে দিবে। এটাকে সায়েন্টিফিক্যালি সবচেয়ে সঠিক মুভি হিসেবে ধরা হয়। মুভিটাতে কাজ করেছেন কিপ থর্নের নোবেল প্রাইজ ২০১৭ মতো বিজ্ঞানী , তাহলে বুঝতেই পারছেন!

একদল নভোচারীর গ্যালাক্সির শেষ প্রান্তে যাত্রাই এই মুভির মূল কাহিনী। এটা সেসময়ের কাহিনী যখন পৃথিবী বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে, তাই বাসযোগ্য গ্রহের সন্ধান করে চলছে নভোচারীর দল। মুভির মূল অভিনেতা এই দলের পাইলট, সে তার ছোট্ট মেয়েকে পৃথিবীতে রেখে এসেছে। এমন এক গ্রহে পা রেখেছে যেখানে সময় পৃথিবীর চেয়ে ধীরে চলে,ওদিকে মেয়ে তার বাবার জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করেই চলেছে। বাবা-মেয়ের এই ইমোশনাল কাহিনী মুভিকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে। এর সাথে আছে চোখ ধাঁধানো ভিজুয়ালাইজেশন, হৃদয় কম্পিত করা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, বিজ্ঞানের তত্ত্বের অপূর্ব প্রয়োগ। এসব কিছু মিলিয়ে মুভিটাকে মাস্টারপিস বললেও কম বলা হয়। ব্যক্তিগতভাবে এই মুভিটা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

যাইহোক, একটা quote দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

"Mankind was born on Earth. It was never meant to die here."

গাছের ভাষা

তানভীর আহমেদ ভূঁইয়া

অফিস শেষে মাহবুব, নিবির আর ফারুকের সাথে আড্ডা না মারলে আশিকের পেটের ভাত হজম হয় না।ওরা চারজন বন্ধু।খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।একেবারে হরিহর আত্মা যাকে বলে।ওদের বন্ধুত্বটা অনেক পুরোনো।সময়ের আবর্তে স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করে চাকরি জীবনেও ওদের বন্ধুত্ব টিকে আছে এবং টিকে থাকবে আশা করা যায় যদি কোনো দৈব দুর্বিপাক না আসে। সেই বুয়েট লাইফের শুরুর দিকে ওদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত। সদ্য কৈশোর পেরোনো বিজ্ঞানমনস্ক ছেলেগুলো প্রকৌশল বিদ্যা শিখতে শিখতে পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটা সুস্থ আনন্দময় সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। ওরা তর্ক করত, শিখত এবং শেখাত। এই ছয়-সাত বছরে ওদের দার্শনিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক চিন্তা-ভাবনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।কারণ ওরা মনের দিক থেকে ওপেন, যে কোন বৈপ্লবিক গ্রহণযোগ্য ধারণাকে স্বাগত জানিয়ে পুরোনোটাকে ছুঁড়ে ফেলতে ওদের কোনো দ্বিধা নেই। এই গল্পের শুরুটাও হয়েছিল ওদের রেগুলার চায়ের আড্ডায়।

“রায়হান ভাইয়ের কোনো খবর জানিস?”
আশিক জিজ্ঞেস করল।

“কোন রায়হান ভাইয়ের কথা বলছিস? সেই যে সোহরাওয়ার্দি হলের ৩০২ নম্বর রুমের রায়হান ভাই? একটু পাগলাটে টাইপ কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম।”

একগাদা প্রশ্ন এবং একই সাথে উত্তর ছুড়ে দিলো নিবির।

“ঠিক ধরেছিস।”

“আমি যতদূর জানি, রায়হান ভাই দুই বছর আগে পিএইচডি করার জন্য অস্ট্রেলিয়া গিয়েছেন। রায়হান ভাই ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে বোটানির প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন।ঐ নেশাই উনাকে অস্ট্রেলিয়া নিয়ে গেছে। মেলবোর্নের মোনাশ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন উনি। উনার টপিক হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান বুশ-ফায়ারের সাথে লোকাল গাছপালার রিলেশনশিপ অ্যানালাইসিস করা।”
এতগুলো কথা একসাথে শেষ করে যেন হাঁপিয়ে উঠল মাহবুব। চায়ের কাপে চুমুক দিলো আবার। যেন ওখান থেকে কিছু গ্লুকোজ পেটে গেলেই আবার চাঙা হয়ে উঠবে সে।

“রায়হান ভাইকে গত দুই সপ্তাহ ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।উনার ছোট বোন রুমানা কাল ফোন করে জানিয়েছে আমাকে। ভাইয়ার বাবা-মা ভেঙে পড়েছেন। যতদূর জানলাম, রায়হান ভাই উনার গবেষণার কাজে অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গলের গভীরে গিয়ে ক্যাম্প করেছিলেন।সাথে স্যাটেলাইট ফোন, শুকনো খাবার আর কিছু হাইটেক যন্ত্রপাতি ছিল।এরপর থেকেই উনি নিখোঁজ।”

আশিকের কথাগুলো যেন চায়ের টেবিলে বোমা ফাটাল।চোয়াল ঝুলে পরেছে ফারুকের।অন্যরা স্তব্ধ হয়ে কী যেন ভাবছে।

সবার আগে নীরবতা ভাঙল আশিক,"আমি ঠিক করেছি আমি আগামী সপ্তাহেই অস্ট্রেলিয়া যাব। আমার পিআর এর অ্যাপ্লিকেশনটা এপ্রুভ হয়েছে গতকাল।ভেবেছিলাম তোদের আজ সারপ্রাইজ দেবো কিন্তু রুমানার ফোন পেয়ে নিজেই সারপ্রাইজড হয়ে গেছি।'
ফারুক বলে উঠল, "সে না হয় গেলি।কিন্তু রায়হান ভাইয়ের ব্যাপারে কী করবি? তুই যদি ভাবিস অস্ট্রেলিয়া গিয়েই খোঁজ লাগাবি তাহলে আমি বলব তোর প্রিপারেশন নিয়ে যাওয়া উচিত। You will need money first. অবশ্য এটা ব্যাপার না। আমরা থাকতে ওটা অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে।কিন্তু আরো কিছু ব্যাপার আছে। আমার সিক্সথ সেন্স বলছে ব্যাপারটার সাথে উনার গবেষণার কোনো সম্পর্ক আছে।তুই একটু খোঁজ লাগা।'

পরবর্তী তিনদিন ওদের খুব ব্যস্ততায় গেল।আশিক বেশিরভাগ সময় কাটালো রায়হান ভাইয়ের গবেষণার বিষয়বস্তু কী সেটা জানা নিয়ে।উনার সুপারভাইজার জানালেন, "রায়হান মূলত গাছেদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করছিল।গাছেরা নাকি নিজেদের মাঝে যোগাযোগ করার জন্য এক ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ব্যবহার করে।রায়হান ভাই নাকি চেষ্টা করছিল বুশ-ফায়ার হবার কিছুদিন আগে থেকে গাছদের মাঝ থেকে বের হওয়া ওয়েভে কোনো বিশেষ পরিবর্তন আসে কিনা সেটা শনাক্ত করতে। যদি ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক ওয়েভের পরিবর্তন শনাক্ত করা যায় তাহলে মানুষের পক্ষে আগেভাগেই সম্ভব হবে কখন বুশ-ফায়ার হবে তা বের করা। একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের গাছগুলোর ওয়েভ প্যাটার্নের পরিবর্তন আগেভাগেই আমাদের জানিয়ে দিবে বুশ-ফায়ার আসন্ন।তখন লোকালি ঐ অঞ্চলে গিয়ে ফায়ার-বিগ্রেড দিয়ে পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিতে হবে গাছগুলি।ব্যস! কেল্লা ফতে।'

পরের সপ্তাহে আশিক চলে গেল রায়হান ভাইয়ের ল্যাবে। সুপারভাইজার মাইক কার্টারের অনুমতি নিয়ে রায়হান ভাইয়ের ল্যাপটপ খুলল আশিক।তন্ন তন্ন করে খুঁজল ল্যাপটপ।তখনও জানত না আশিক- কী বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওর জন্য।পাইথন দিয়ে লেখা রায়হান ভাইয়ের একটা সফটওয়্যার খুঁজে পেল আশিক।সফটওয়্যারটা খুলে রীতিমত বোকা বনে গেল আশিক। রায়হান ভাই পাগল- এটা জানত আশিক।কিন্তু এখন তো দেখছে তিনি জিনিয়াস। রায়হান ভাইয়ের সফটওয়্যারে বিগত পঁচিশ বছরের পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের গাছ কর্তৃক নিঃসৃত ওয়েভ এর প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস করা হয়েছে।ডিপ লার্নিং ইউজ করে এই প্যাটার্নগুলির সাদৃশ্য খুঁজে বের করা হয়েছে।শুধু তাই নয়, এই সফটওয়্যার প্যাটার্নগুলিকে ডিকোড করে আমাদের ভাষায় ট্রান্সলেট করছে।এর অর্থ হলো রায়হান ভাই যা বানিয়েছে তা দিয়ে গাছের কথা বোঝা যাবে।লিটারেলি বোঝা যাবে।কথাবার্তায় বুঝল রায়হান ভাইয়ের সুপারভাইজার এখনো জানে না বিষয়টা। নিশ্চয়ই রায়হান ভাই চেপে গিয়েছে।কিন্তু প্রশ্ন হলো রায়হান ভাই তাহলে কোথায়? কী করছে এখন?

পরদিন ল্যাপটপটা নিয়ে রায়হান ভাইয়ের ক্যাম্পে রওনা দিলো আশিক।গিয়ে দেখল ক্যাম্পটা পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। আর সেন্সরগুলি ইউজ করতে নিষেধ করেছে।মহা ঝামেলা করে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে রাতের বেলা চুপিচুপি আশিক সেন্সরগুলি দিয়ে গাছদের সিগন্যাল কালেক্ট করা শুরু করল। আশিকের কমনসেন্স বলছে গাছদের কাছেই রয়েছে এই ধাঁধার উত্তর।গাছেরা নিশ্চয়ই জানে রায়হান ভাই কোথায়? কিন্তু মুশকিল হলো গাছদের কাছে কীভাবে সে জিজ্ঞেস করবে যে রায়হান ভাই কোথায়? আশিকের মুখের ভাষাকে কে গাছদের সিগন্যালে রূপান্তর করবে? আচমকাই বুদ্ধি খেলে গেল আশিকের মাথায়। রায়হান ভাইয়ের ছবির বড় বড় পোস্টার বানিয়ে আশেপাশের সব গাছে লটকে দিলো সে।মুখের ভাষা না বুঝলেও রায়হান ভাইয়ের এই ছবি দেখে গাছেরা নিশ্চয়ই বুঝবে।তবে গাছেদের কোনো কিছু বুঝার ইন্টেলিজেন্স কতটুকু সে বিষয়ে আশিকের সন্দেহ আছে।কিন্তু এছাড়া আর উপায়ও নেই।
প্রকৃতি হয়তো চেয়েছিল আশিক সফল হোক।সন্ধ্যা নাগাদ আশিক বিভিন্ন ওয়েভ ডাটা কালেক্ট করল। তারপর ডাটাগুলি ওই সফটওয়্যারে ইনপুট দিলো।অবিশ্বাস্য! সবগুলি গাছের থেকে পাওয়া প্যাটার্ন একটা নির্দিষ্ট দিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব ইন্ডিকেট করছে। সেটা ষাট মাইল দক্ষিণে জঙ্গলের ভেতরে অন্য একটা জায়গা।

পরের কাহিনী খুব ছোট।পরদিন সকালবেলাতেই পুলিশ ফোর্স নিয়ে আশিক প্যাটার্নে দেখানো জায়গায় চলে যায়।ওখানে একটা কুটিরে রায়হান ভাইকে পাওয়া যায় একদল ক্রিমিনাল সহ। আন্তর্জাতিক এই ক্রিমিনালরা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিকল্পিত বুশ-ফায়ার লাগাচ্ছিল।রায়হান ভাই সফটওয়ার এর মাধ্যমে গাছেদের কাছ থেকে এই তথ্য জানতে পারেন এবং নিজেই জঙ্গলে বুশ-ফায়ারের হোতাদের খুঁজতে গিয়ে তাদের হাতে বন্দী হন।রায়হান ভাইয়ের এই রিসার্চ অস্ট্রেলিয়ান সরকার কর্তৃক সমাদৃত হয়। আশিক এর উদ্ভাবনী ক্ষমতায় মোনাশ ইউনিভার্সিটি নিজে যেঁচে আশিককে ডাটা সায়েন্সে রিসার্চ স্কলারশিপ অফার করেছে।

পুনশ্চঃ মাহবুব, ফারুক আর নিবির সামনের সেমিস্টারেই আসছে পি এইচ ডি করতে মোনাশে।কারণ একসাথে কফি না খেলে ওদের পেটের ভাত হজম হয় না।আশিক ভেতরে ভেতরে খুব খুশি হলেও বাইরে বাইরে বেজায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করছে।বন্ধুরাও মনে হয় সেটা জানে।

ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম

লেখকঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল
প্রকাশকঃ শিখা প্রকাশনী
রিভিউয়ার: নাঈম হোসেন ফারুকী

আমি বড় হয়েছি শহরে। গ্রাম ছিল আমার কাছে আধিভৌতিক এক মিথোলজির জগৎ। অভিজ্ঞতা নেওয়ার জন্য গ্রামে প্রথম রাত কাটাই এসএসসি দেওয়ার পর। যাদের বাড়িতে থাকি তাদের কারেন্ট ছিল না, বাথরুম ছিল দূরে। সেই সময় আমার হাতে ছিল জাফর ইকবালের বই, ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম। নিশুতি রাত। চারদিক নিরব নির্জন। লন্ঠনের টিমটিমে আলোয় বসে বসে বই পড়ছি।

ওইদিকে অন্যকোনো রাতে,অন্যকোনো এক সময়ে অতি অদ্ভুত এক গ্রহের কাছে বাঁধা পড়েছে আমাদের মহাকাশযান। কি এক অদ্ভুত অলৌকিক কিছু আছে ওই গ্রহে। স্কাউটশিপ পাঠানো হয়েছিল, সেটা গায়েব হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে স্কাউটশিপের কপি। একটা পাঠানো হয়েছিল, ফিরে এসেছে কয়েকটা। পুরাপুরি কপি না। একটু পার্থক্য আছে।কী, সেটা ধরা যাচ্ছে না।

এইবার পাঠানো হলো মানুষ। যে ফিরে আসলো, সে মানুষ, কিন্তু পুরাপুরি মানুষ না।অন্য কিছু।

কী হচ্ছে আসলে?কীভাবে হচ্ছে? কুৎসিত ওই লাল গ্রহটা কেমন জানি দগদগে ঘায়ের মত নড়ছে। একটু একটু চেঞ্জ হচ্ছে।কী আছে ওতে?

কী এই ট্রাইটন?

হারিকেনের আলো টিমটিম করে জ্বলছে। তার মিটমিটে শিখা, ঘরে অদ্ভুত আলো-আঁধারি তৈরি করেছে। ওইদিকে নিঃসঙ্গ নভোযানে পাঁচ ছয়জন অসহায় মানুষ ভয়ে আতঙ্কে ছটফট করছে!

ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম: জাফর ইকবালের মাস্টারপিস।

অনেকে বলে বইটা নাকি এলিয়েন মুভির কপি। এই অসাধারণ মুভিটাও আমি দেখেছি। কপি না, কেবল একটা দৃশ্যের আইডিয়া সেখান থেকে নেওয়া হয়েছে।

ট্র্যাভেল টু ইনফিনিটি ডার্কনেস

প্রজেশ দত্ত

১.
- কোনো নতুন তথ্য আছে সুজান?
- না, স্যার। নতুন কোনো তথ্য নেই।
-তাহলে কি কিছুই বুঝা যাচ্ছে না এখনো?
- দুঃখিত, স্যার।
- আমাদের স্পেস-ক্রাফট কি রেডি? আমাদের ওখানে টিম পাঠাতে হবে।
-হ্যাঁ, স্যার। আমরা পরশুদিনই টিম পাঠাতে পারব।
-গুড।কিপ মি ইনফর্মিং।
-ইয়েস স্যার।

X32 গ্যালাক্সির পাশে অদ্ভুত ঘটনা দেখা গেছে ১ বছর আগে। হঠাৎ করে একটা প্ল্যানেট রাতারাতি গায়েব হয়ে গেছে। যেন ব্ল্যাকহোলের মতো কিছু একটা সেটাকে গ্রাস করে নিয়েছে। কিন্তু সেখানে কোনো ব্ল্যাকহোল নেই। আর রাতারাতি কোনো ব্ল্যাকহোল উদয় হওয়া সম্ভব না। তাহলে কী এমন ঘটল যে প্ল্যানেটটা রাতারাতি গায়েব হয়ে গেল! টেলিস্কোপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে কিছুই জানা যাচ্ছে না। তাই পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সেখানে স্পেস-ক্রাফট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটার প্রায় ১০ বছর লাগবে সেখানে পৌঁছাতে। আরও ১০ বছর ফিরতে। স্পেস-ক্রাফটি 0.9C বেগে ভ্রমণ করবে। তাই স্পেস-ক্রাফটের জন্য যে সময়টা ২০ বছর পৃথিবীর জন্য সেটা প্রায় ৪৫ বছর। এজন্য সংস্থা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেখানে পৌঁছানোর পর টিম সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবে সিগন্যাল হিসেবে। যার ফলে প্রায় ৩২ বছর পর গবেষণা সংস্থা সমস্ত তথ্য তাদের হাতে পেয়ে যাবে।

২.
-স্পেস-ক্রাফট সম্পূর্ণ তৈরি ভ্রমণ শুরু করার জন্য। কমাণ্ডার ইন চিপ পিটার, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?
-হ্যাঁ, বলুন সুজান।
-আপনি আপনার টিম মেম্বারদের নিয়ে স্পেস-ক্রাফটে প্রবেশ করুন। আপনাদের অবগতির জন্য আরেকবার জানিয়ে দিই, আপনাদের X32 এর সন্দেহজনক অংশটিতে পৌঁছাতে সময় লাগবে ১০ বছর, এবং পুরো মিশন শেষ হতে ২০ বছর। আপনাদের সাথে ৩০ বছরের খাদ্য দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো কারণে মিশনে কোনো ব্যাঘাত ঘটে বা সময় বেশি লাগে সেজন্য।
-ধন্যবাদ সুজান, আমরা স্পেস-ক্রাফটে প্রবেশ করছি।
-আপনাদের যাত্রা শুভ হোক।
পিটার তার বাকি চারজন টিম মেম্বার নিয়ে স্পেস-ক্রাফটে প্রবেশ করলেন। লুই, চার্লস, জেনি, ডেনিয়েল। স্পেস-ক্রাফটটি আর ৩০ মিনিট পর রওনা দিবে স্পেস স্টেশন থেকে তার গন্তব্যের দিকে।

৩.
পৃথিবীতে ২০ বছর পেরিয়ে গেছে।
আজকে পৃথিবীর জন্য একটা বড় দিন। প্রফেসর ব্রাউন এবং তার টিম ১৭ বছরের পরিশ্রমের পর কোয়ান্টাম সুপার কম্পিউটার বানাতে সক্ষম হয়েছেন। এই কম্পিউটার ১০০০ টি কোয়ান্টাম কম্পিউটারের কাজ একসাথে প্রসেস করতে পারে এতটাই শক্তিশালী।

যেকোনো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ১ বছরের কাজ এই কম্পিউটার কয়েক সেকেন্ডে শেষ করতে পারবে।
আর কিছুক্ষণ পর প্রফেসর ব্রাউন এই কম্পিউটার চালু করবেন এবং এর সাহায্যে কোনোকিছু প্রসেস করে দেখবেন। প্রথম ব্যবহারের পূর্বেই এই সাফল্যের খবর সব স্পেস স্টেশন আর পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। পড়বে না-ই বা কেনো? ইতিহাসে এত শক্তিশালী কম্পিউটার বানানো এতদিন কল্পনা ছিলো শুধু।

প্রফেসর ব্রাউন অনলাইনে নিউজ ঘাটছেন। আর ভাবছেন তিনি তার কম্পিউটারের সাথে প্রথমে কী অপারেট করবেন। হঠাৎ তার চোখ পড়ল ২০ বছর আগের একটা নিউজে। X32 mission: where will it lead us to? শিরোনামে নিউজটি ছাপা হয়েছে। তার এই বিষয়টা মনে ধরল।
তিনি পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণা সংস্থার কাছে ফোন দিলেন। সংস্থার প্রধানকে অনুরোধ করলেন, যতগুলো টেলিস্কোপ রয়েছে, হোক সে মহাকাশে বা পৃথিবীতে, সবগুলো টেলিস্কোপ কিছু সময়ের জন্য যেন X32 এর মিস্ট্রিয়াস অংশের দিকে ফোকাস করানো হয়। মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রধান সানন্দে রাজি হলেন।
প্রফেসর ব্রাউন তার কম্পিউটার চালু করলেন। প্রায় ৩,১০০,০০০ টি টেলিস্কোপ মিল্কিওয়ের বিভিন্ন প্ল্যানেট আর স্পেস স্টেশনে ছড়িয়ে আছে। সবগুলোর ফোকাস এখন X32 এর দিকে। প্রায় ১ ঘন্টা ধরে টেলিস্কোপগুলো থেকে প্রাপ্ত ২ বিলিয়ন ছবি প্রসেস করল ব্রাউনের কম্পিউটার। তারপর সম্ভাব্য সকল সিদ্ধান্ত স্ক্রিনে প্রদর্শিত হলো। ব্রাউন অবাক হলেন। সম্ভাব্য ফলাফল একটাই আসছে। তিনি ফলাফল পড়তে থাকলেন। আস্তে আস্তে তার ভ্রু কুঁচকে গেল।

৪.
-কী হয়েছে প্রফেসর? এত তাড়াহুড়ো করে ডেকে পাঠালেন হঠাৎ?
-আপনারা যে স্পেস-ক্রাফটটি পাঠিয়েছিলেন X32 তে, সেটার সাথে কি যোগাযোগ সম্ভব?
- না, প্রফেসর। আমরা এখন তাদের কাছে কোনো সিগন্যাল পাঠালে সেটা পোঁছাতে কয়েকবছর লেগে যাবে। ততদিনে তারা X32 তে পৌছে যাবে। কিন্তু কেন?
-আমার কম্পিউটার সব ডাটা বিশ্লেষণ করে দেখেছে। কম্পিউটার সিদ্ধান্ত দিয়েছে ওই অংশটি মূলত একটি পোর্টাল। মাল্টিভার্স ইন্টারকানেক্টিং পোর্টাল। এর মাধ্যমে আমরা অন্য কোনো মহাবিশ্বে যেতে পারব।
-কী বলছেন আপনি? তার মানে আমাদের স্পেস-ক্রাফটটি ঐ পোর্টালে প্রবেশ করলে তারা অন্য একটি মহাবিশ্বে পৌঁছে যাবে?
-নাহ। ঠিক তেমন নয়। আপনি জানেন মাল্টিভার্স নিয়ে সর্বশেষ তত্ত্ব আমাদের জানিয়েছে যে, আমাদের মহাবিশ্বের মতো আরো ১০^৬০০ টি মহাবিশ্ব রয়েছে। এই পোর্টাল মূলত এই সব কয়টি মহাবিশ্বের সাথে যুক্ত। যে বা যারা এই পোর্টাল তৈরী করেছে তারা আমার এই কম্পিউটার থেকেও কয়েক হাজার গুণ শক্তিশালী কম্পিউটার ব্যবহার করে পোর্টাল তৈরি নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা চাইলে এই পোর্টাল ব্যবহার করে যে কোনো নির্দিষ্ট ইউনিভার্সে ভ্রমণ করতে পারবে। কিন্তু আমরা?
-তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন...?
কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল মহাকাশ গবেষণা সংস্থা প্রধানের কপালে।
-হ্যাঁ,সম্ভাব্য সকল মাল্টিভার্সে ভ্রমণ করবে আমাদের পিটার এবং তার টিম। কম্পিউটারের আরো তথ্য অনুসারে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার বছরে এই সবগুলো মাল্টিভার্স ভ্রমণ করবে আমাদের স্পেস-ক্রাফট। ভেবে দেখুন তো? যদি আমাদের টিম তত বছর জীবিতও থাকতে পারত তবে তারা প্রতি সেকেণ্ডে ১০^৫৯০ টি মহাবিশ্বে ভ্রমণ করত।
-কিন্তু আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণ কি সম্ভব?
-আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা আমাদের মহাবিশ্বের ভেতরে নয়, বাইরে ঘটছে। যেখানে আমাদের মহাবিশ্বের কোনো নিয়ম কানুন খাটবে না। আর আমাদের স্পেস-ক্রাফট কিন্তু ভ্রমণ করছে না। ওই পোর্টাল তাকে আপনা আপনি নিয়ে যাবে ঐ মহাবিশ্বগুলোতে।
-বেদনাদায়ক!
-আমাদের টিম কিছুই বুঝতে পারবে না, না কিছু অনুভব করবে। এত দ্রুতই সবকিছু ঘটবে যে স্পেস-ক্রাফটের কম্পিউটার বা তাদের মস্তিষ্ক- কোনোটাই কোনো শব্দ বা দৃশ্য বিশ্লেষণ করতে পারবে না। তারা ভাববে এক অসীম অন্ধকারে ডুবে গেছে তারা যা প্রকৃতপক্ষে অন্ধকার নয়।
-আমাদের কিছু করার আছে?
-না, পিটার যদি ঐ পোর্টালে প্রবেশ না করার সিদ্ধান্ত নেয় তবেই তারা ফিরবে আর, নয়তো...
-ওহ। ধন্যবাদ, প্রফেসর। আমার শরীর অসুস্থ লাগছে। আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই।
-আসুন, আমার গেস্ট রুমে আসুন।

৫.
স্পেস-ক্রাফটে ১০ বছর পরের কথা-
-"আমরা অবশেষে পৌছালাম।" নিঃশ্বাস ছাড়ল জেনি।

-"ইয়েস গায়েস, আমরা পৌঁছে গেছি। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ এলাকা আমাদের সামনে দৃশ্যমান হবে।" সানন্দে বলে উঠলো পিটার।
-একটা স্কচের বোতল খোল জেনি, একটু পার্টি হোক
-ডেনিয়েল, আগে পৌঁছাতে তো দেও।
-ঠিক আছে। তবে আমি স্কচ খাবই এখন।

দুই ঘন্টা পর-
-"পিটার, চলো ফিরে যাই। এই রহস্যজনক পোর্টালে প্রবেশের মানে হয় না," জেনি চিৎকার করে বলছে।
-"কিন্তু গবেষণা সংস্থার নির্দেশ ছিলো সম্ভাব্য সকল তথ্য নিয়ে আসতে।" চার্লস জেনিকে বলল।
- "আমরা সব তথ্যই ডাটা সিগন্যাল রুপে পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা যখন পাবে, তারা ডিসিশন নেবে কি করা যায়। পৃথিবীতে

এতদিনে ২২.৫ বছর পেরিয়ে গেছে। আমি পৃথিবীতে ফিরতে চাই পিটার।"
-"আমাকে ভাবতে দাও তোমরা। আমি তোমাদের কমাণ্ডার। আমি যা সিদ্ধান্ত নেব তাই," রাগের স্বরে বলল পিটার।
স্পেস-ক্রাফটের সবাই চুপ। কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে পিটার। তার আগ্রহ এবং ভয় দুটোই করছে। ফিরে যাবে? এতদূর এসে এই রহস্যজনক পোর্টালে ঢুকবে না? কিন্তু যদি খারাপ কিছু ঘটে? এক কাপ কফিতে চুমুক দিতে দিতে চোখ বন্ধ করল সে।

The Martian (2015)

IMDb Rating: 8/10

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এমন লোক খুব কমই আছে আর মুভিটা তো সেই মঙ্গল নিয়েই।একদল অ্যাস্ট্রোনট মঙ্গল গ্রহে অভিযান চালাচ্ছিল, সেসময় হঠাৎ এক ঝড়ে তাদের এক সঙ্গী হারিয়ে যায়।অগত্যা তাকে ফেলে রেখেই চলে আসতে হয় পুরো টিমকে। ধরেই নেয়া হয় সে মারা গিয়েছে, এটা প্রেস কনফারেন্স করে জানিয়েও দেয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন যেতেই বোঝা যায়, না সে মরেনি, বেঁচে আছে। তবে বিভিন্ন কারণে উদ্ধারকারী দল পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে।এদিকে মঙ্গলগ্রহে চলছে বাঁচা মরার লড়াই, খাদ্য ফুরিয়ে আসছে, ঝড়ে আঘাত হানছে তবুও মানুষের সারভাইভাল ইনসটিংক্টের কাছে হার মানছে সবই। একেকটা দিন বেঁচে থাকতে সম্মুখীন হতে হচ্ছে এক নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের।

"In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option, I'm gonna have to science the shit out of this."

তবে স্বল্প সময়ের জন্য উপস্থিত থাকলেও মুভির একটি প্রিয় চরিত্র হলো Rich Purnell তার পাগলাটে জ্ঞানী চরিত্রটা এনজয় করেছি, এমনকি মূল চরিত্রের চেয়েও।

গতিশীল চার্জ কেন চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরী করে?

সুস্মিত ইসলাম

১. ধরো, তোমার রেফারেন্স ফ্রেমে একটা চার্জিত কণা স্থির বসে আছে।এটার তো কোন ম্যাগমেটিক ফিল্ড নাই, তাইনা?

এবার ধরো তোমার বন্ধু গাড়িতে করে v বেগে যাচ্ছে, তার ফ্রেমে চার্জটার বেগ হবে -v. তাহলে তোমার বন্ধু কিন্তু দেখবে চার্জটার একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে।এইটুকু ক্লিয়ার?

২. ধরো, তোমার ফ্রেমে প্রথম চার্জটার থেকে একটু দূরে আরেকটা চার্জ রাখলে।এদের মধ্যে ইলেক্ট্রিক ফোর্স কাজ করবে। ধরি বলের মান F, আর ১ম চার্জের আকর্ষণে ২য়টার ত্বরণ ধরো a.

এখন তোমার বন্ধুর ফ্রেমে আসো।বন্ধুর ফ্রেমেও কিন্তু ২য় চার্জের ত্বরণ দেখা যাবে a, কারণ সমবেগে চলমান সকল রেফারেন্স সিস্টেমে ত্বরণ সমান।কাজেই এই ফ্রেমেও চার্জ-১, চার্জ-২ এর ওপর F পরিমাণ বলই প্রয়োগ করছে।

এখন দেখো, তোমার ফ্রেমে কিন্তু কোনো ম্যাগনেটিক ফিল্ড নাই। F বলের পুরাটাই ইলেক্ট্রিক ফোর্স.

কিন্তু তোমার বন্ধুর ফ্রেমে এ কিন্তু ইলেক্ট্রিক ফিল্ড ও আছে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ও আছে।দুইটা মিলে F বল দিচ্ছে।

মানে বুঝলা? কোনো চার্জের স্থির ফ্রেমে যেটা ইলেক্ট্রিক ফিল্ড, সেটা অন্য ইনার্শিয়াল] ফ্রেমে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড + ম্যাগনেটিক ফিল্ড হয়ে যায়। মানে আসলে শুধু ইলেক্ট্রিক ফিল্ড-ই আছে, গতি বদলাইলে সেটাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড হিসাবে দেখা যাবে।এইটুকু ক্লিয়ার?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গতির সাথে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এর সম্পর্ক কী? ম্যাগনেটিক ফিল্ড আসছে কেন? উত্তরটা পেতে হলে আমাদের লাগবে আইনস্টাইন সাহেবকে।

৩. এবার আমরা এক বাক্স কুলম্ব বলের সাথে এক চিমটি রিলেটিভিটি মিশিয়ে ঘুঁটা দিব।

আমরা জানি, আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, মহাবিশ্বে সর্বোচ্চ বেগ হল আলোর বেগ, c, আর কেবল ভরবিহীন কণাই এই বেগে চলবে।কাজেই, তড়িৎ বল তাৎক্ষণিকভাবে কাজ করতে পারেনা, আলোর বেগেই কাজ করবে।তার মানে বলটা এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে transmit হতে কিছু সময় লাগবে, সেটা হল $\Delta t = \Delta r/c$, যেখানে Δr = বিন্দু দুইটার দূরত্ব।
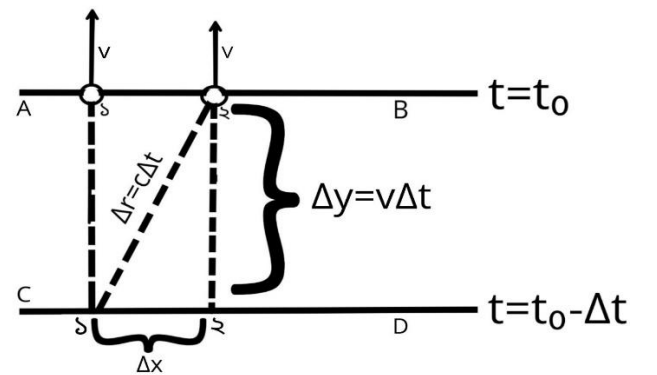
তাহলে এবার চিত্রটা দেখো।তোমার বন্ধুর ফ্রেমে, $t = t_0$ সময়ে চার্জ দুইটার অবস্থান AB রেখাংশ বরাবর।এখন এই অবস্থানে চার্জ-২ এর ওপর চার্জ-১ যে বল প্রয়োগ করে, সেটা আসলে $\Delta t = \Delta r/c$ সময় আগে চার্জ-১ যেখানে ছিল (C বিন্দু), সেখান থেকে নির্গত হয়েছিল।

এখন দেখ, C বিন্দু থেকে B বিন্দুর দূরত্ব তোমার ফ্রেমে Δr হলে, B বিন্দুতে চার্জ-২ এর অনুভূত কুলম্ব বল $F=kq_1q_2/(\Delta r)^2$. এটাই উভয় ফ্রেমে B বিন্দুতে চার্জ-২ এর ওপর মোট বল।

কিন্তু তোমার বন্ধুর ফ্রেমে তো চার্জটা গতিশীল।তাহলে চার্জের কাছ মনে হবে Δr দৈর্ঘ্য টা সংকোচন হয়ে $\Delta r'$ গেছে।$\Delta r'$ ছোট হলে কুলম্ব বল বেড়ে যাচ্ছে, হচ্ছে $F' = kq_1q_2/(\Delta r')^2$.

কিন্তু, মোট বল তো তোমার ফ্রেমেও যা, তোমার বন্ধুর ফ্রেমেও তাই হওয়ার কথা, $F = kq_1q_2/(\Delta r)^2$.

তাহলে তোমার বন্ধুর ফ্রেমে কুলম্ব বলের বিপরীতমুখী একটা বল f কাজ করছে, যাতে করে মোট বল $F'+f = F$ হয়। এই অতিরিক্ত বলটাকেই আমরা চুম্বক বল হিসাবে দেখি! খেয়াল করে দেখো,

এই অতিরিক্ত বলটা কিন্তু গতিশীল ফ্রেমে দৈর্ঘ্য সংকোচনের কারণে আসলো।

এখন তোমাদের জন্য একটা অনুশীলন।হিসাব করে f এর মান বের করতে পারবা? যদি ঠিকঠাকভাবে করতে পারো, উত্তরটা বায়ো-স্যাভার্ট ল'র সাথে মিলে যাবে!
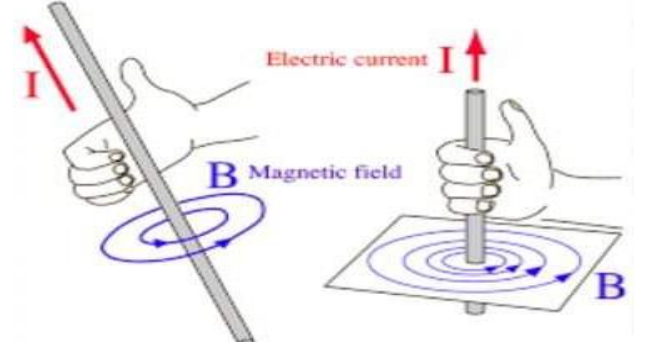
Inception (2010)

IMDb Rating : 8.8/10

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

মুভিটি সম্পর্কে প্রচলিত একটা কথা আছে Christopher Nolan নাকি ১০ বছর ব্যয় করে মুভির কাহিনী লিখেছেন।

মুভির মেইন ক্যারেক্টার Cobb মানুষের স্বপ্নের ভেতরে ঢুকে তার ব্রেইনে থাকা আইডিয়াকে চুরি করে।তবে এবার তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ব্রেইনে নতুন আইডিয়া প্রবেশ করানোর জন্য।কিন্তু এই কাজ আগে কখনো করা হয়নি কারণ অসুবিধা আছে।আমাদের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা যেমন বাইরের জীবাণু আসলে দেহকে অ্যালার্ট করে তেমনি বাইরের আইডিয়া দেখলে ব্রেইনও অ্যালার্ট হয়।Cobb একটা টিম বানিয়ে কাজে লেগে পড়ে।এরপরই শুরু হয় অ্যাকশন, টুইস্ট, পার হতে থাকে স্বপ্নের একেকটা লেভেল।

মুভিটার প্লট এতই দুর্দান্ত যে আপনাকে যদি এন্ডিংটা বলেও দিই তাও শেষ অংশে কেমন করে পৌঁছাল এটা দেখার জন্য হলেও মুভিটা দেখতে হবে।চার চারটা অস্কার তো আর এমনি এমনি পায়নি!

"Building a dream from your memory is the easiest way to lose your grasp on what's real and what is a dream."

-Cobb

INCEPTION

FROM THE DIRECTOR OF THE DARK KNIGHT

মুক্তি

সালিম সাদমান বর্ষণ

সময়টা ২০৬০। হোটেল ডি গ্যান্ড প্যারাডক্স এ কিছু লোক জড়ো হয়ে আছে। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।
-কে?
-আমি।
-আমি কে?
-জসিম।
-কেন এসেছ?
-লটারি জিতেছি।
-টিকেট নাম্বার?
-১৯৭১-১২-১৬জবালা
ক্লিক শব্দে দরজাটি খুলে গেলো এবং ভেতরে আগন্তুকটি প্রবেশ করল।
-কী জসিম? খবর কী?
-মজা রাখো মিয়া। এখানে আসা প্রত্যেকেই জসিম।
-হাহাহা। কিন্তু আমরা লটারি পেয়েছি ভিন্ন ভিন্ন।
-হুম। ওটাই তো আমাদের আলাদা আলাদা করে চেনার একমাত্র উপায়।
-আমাদের কোডের মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য অংশ তো ওটাই। লিডার কেন যে এত ঘুরিয়ে কোড রাখতে গেলেন?
এমন সময় আবারো দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো।
-কে?
-আমি।
-আমি কে?
-জইম।
-কেন এসেছ?
-লটারি জিতেছি।
-টিকেট নাম্বার?
-১৯৫২-০২-২১রাভাবাচা

ক্লিক করে দরজাটা খুলে গেলো। নতুন একজন প্রবেশ করল। এসে ঘরের এক প্রান্তে বসে পড়ল ।
ঘরের বাকি সদস্য এতক্ষণে খোশগল্পে মেতে উঠেছে। কার পরিবারে কী চলছে, কার কর্মস্থলে সহকর্মী বসের কাছে ঝাড়ি খেয়েছে, কার জীবন নতুন মোড় নিয়েছে এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। আস্তে আস্তে রাত ঘনিয়ে আসলো। সবাই চলে গেলো।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা, হোটেল ডি কাপ্পা।
-সবাই ভালো আছি?
-ভালো আর কিভাবে থাকবো? ওই আস্তানাটা তো চিনে ফেললো।
-তা চিনুক। বুঝতে তো পারে নাই যে আমরা ওখানে কি করছিলাম।
-আসলেই। লিডারের কোডটা আমাদের বাঁচালো।
-হ্যাঁ, লিডার আসলেই একটা জিনিয়াস। ওরা যে 'স' শুনতে পায় না তা লিডারের-ই জানার কথা।
-ঠিক। জসিম এর 'স' শুনতে পায় নি দেখেই রক্ষা।
-বাট কথা হচ্ছে ওটা কাকে পাঠিয়েছিলো?
-হবে হয়তো কোনো রাজাকার। শালা নিজে ভালো থাকার জন্য শত্রুদের সাথে তাল মিলিয়েছে।
-তা প্ল্যানিং কতদূর এগুলো?
-আমি আমার অংশ ঠিক করে ফেলেছি আর...

২০৬৫ সাল।
অখ্যাত একটি চার্চে-
খটখট...
-কে?
...
...

-আরে জসিম।
-এখন আমরা জসিম না। তুমি সেই পুরোনো দিনের জসিম কে নিয়েই পরে আছো?
-আমার কাছে জসিম-ই ভালো লাগে। হাহাহা।
-তোমার রসিকতা আর গেলো না।
-এই দুঃসময়ে একটু রং-রস না থাকলে চলবে?
-আচ্ছা, ঠিক আছে। মানলাম। লিডারের অর্ডার কি?
-কোনো অর্ডার নেই।
-কী? কাজ না করলে তো আমরা পিছিয়ে যাবো?
-আমি কি জানি? লিডারকে বলো।
-আচ্ছা থাক। লিডার-ই জানে তার মাথায় কি ঘুরছে।
এমন সময় চার্চের স্পিকারটি বেজে উঠলো
-হ্যাঁলো, হ্যাঁলো। রেডি 1,2,3... শোনা যায়?
কিছুক্ষণের নীরবতা....
-হ্যালো। আমি জনি কাসেম, আপনাদের লিডার বলছি।
হলের কিছু মানুষ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো...
জনি কাসেম গলা ঝাড়লেন।
"আমি আপনাদের সাথে কখনোই সরাসরি কথা বলি না। এখন এটা আমি কী না তা কীভাবে বুঝবেন? তাই সবাই আনন্দে আত্মহারা হবেন না। পৃথিবীর ১৩৮ টি গুপ্ত স্থানের সবাইকে আমার পরিচয় এর ভ্যালিডিটি দিচ্ছি আমি। ভ্যালিডিটি দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমি যে তথ্য দিতে যাচ্ছি তা স্পর্শকাতর। আর হ্যাঁ, নিরাপত্তা নিয়ে কেউ এখন ভাববেন না। অত্যন্ত সতর্ক থেকেই এই চ্যানেল টি চালু হয়েছে। ভ্যালিডিটি হিসেবে আমি একে একে সব গুপ্ত ডেরার গুপ্ত সংকেত বলছি। আমি বাদে অন্য কেউ এগুলো জানবে না।"
-(ফিসফিস করে) আমাদের কোডগুলো সবাই শুনতে পাবে এখন।
-(আরও বেশি ফিসফিস করে) আরে তাই তো। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে আমাদের।
-থাক। কেউ তো আর বুঝবে না যে ওগুলো এই ব্রাঞ্চের।
"খুকখুক... জসিম, সেলিম, সৈকত, সানি, সিয়াম, সবুজ, সাগর, আসলাম, সিকদার, শিকদার......"
পৃথিবীর ১৩৮ টি গুপ্ত স্থানের সবাই হা হয়ে আছে।
-থাক, বাবা। বাঁচলাম। সব জায়গায় এক রকম কোড।
-আমি ভাবতেছি লিডার এত ফাজিল কেন। কী সব নাম কোড হিসেবে রাখছে। এমনি লটারির মধ্যেও তো 'স' ঢুকাইতে পারতো।
কারোর মাথাতেই কিছু আসে না। সবাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
-নাম গুলোর সব কটিতেই 'স' আছে। ঘুরে ফিরে 'স' যুক্ত নাম দিয়েছি কেন তা আপনারা সবাই জানেন। ওরা 'স' শুনতে পায় না। এটা কিভাবে জানতে পেরেছি তা কেউ জানতে চাইবেন না। সবারই কিছু না কিছু সিক্রেট থাকে।
কিছুক্ষণের নীরবতা।
-হা:(স্পিকারে দীর্ঘশ্বাস) বন্ধুরা। হ্যাঁ। আপনারা মেয়েরাও আমার বন্ধু। নারী বলে আপনাদের বিশেষভাবে ভূষিত করবো না। খুকখুক... হুম... যা বলছিলাম... আজ থেকে -১২ বছর আগের দিনটি আপনাদের মনে আছে?
প্রতিটি গুপ্ত স্থানেই পিনপতন নীরবতা। অনেকের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।
আজ থেকে ১২ বছর আগে ২৩ জুন আমাদের পৃথিবীতে একটি স্পেস-শিপ আসে। সেখান থেকে নেমে আসে инопланетянин.
ওদের দেখে প্রথমে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। যদিও অনেকে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলো। কিন্তু আমরা অধিকাংশই ভেবেছিলাম আমাদের সব দুঃখ এবার ঘুচে যাবে। আমাদের বিজ্ঞানের সব অজানা জিনিস আমরা জেনে নিবো। আমাদের সকল সমস্যার সমাধান তাদের কাছে পাবো। কিন্তু না... আমেরিকা আবিষ্কারের পর নেটিভদের সাথে যা হয়েছিলো আমাদের সাথে হলো তার থেকেও আরও বাজে কিছু। প্রথমেই তারা কেড়ে নিলো আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া। আমাদের সকল সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম তারা শিকার করে ফেলল। আমাদের বাক-স্বাধীনতা তারা কেড়ে নিলো। এরপর তারা আক্রমণ করলো ভিডিও গেমস। একে একে মুভি, এনিমে, সিরিয়াল সবকিছু কেড়ে নিলো। আমার প্রিয় সিরিয়াল "কে আপন কে পর" এর ৬৯৯০ তম পর্বের পর কি হয় তা আমি জানতে পারি নাই। আপনাদেরও কোনো না কোনো সিরিয়াল, এনিমে, সিরিজ, গেম শেষ করার ইচ্ছা ছিলো যা আপনারা পারেন নাই। তারা সবকিছু উন্নত প্রযুক্তি দিয়ে দখলে এনেছে। আমাদের জীবন আজ বিপন্ন। ধুকেধুকে মরছি সবাই। জীবনে বিনোদন নেই আর। কিন্তু আর না। инопланетянин দের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই কোনোভাবেই থামবে না। তাদের কানে 'স' কোনো অনুরণন ঘটায় না তা আপনারা আগেই জানেন। আমাদের কথাবার্তা তারা মাইক্রোফোন টাইপের কিছু দিয়ে শুনলেও তাদের কানে 'স' যায় না। তাদের কম্পিউটার ও 'স' কে নয়েজ হিসেবে দেখে। ফলে কিছু তথ্য ওরা আমাদের রাজাকারদের দিলেও পুরো তথ্য দিতে পারে না। ফলে রাজাকাররা অপূর্ণ কোড বলে ও আমরা তখন বিপদ বুঝে গিয়ে কথাবার্তা, আচরণ বদলে ফেলি। যদিও তারা বারবার আমাদের গুপ্ত ডেরার অস্তিত্ব কীভাবে খুঁজে পায় তা আমরা জানি না।
তবে এ পর্যন্ত তারা গুপ্ত ডেরার গুপ্ত খবর জানতে পারেনি।
এটা হচ্ছে সবার জানা কথা। আপনারা আরও অনেক কিছুই জানেন না।

সকলেই ভাবছে তাদের অজানা কোন খবর তারা জানতে চলেছে।

-আপনাদের এতদিন যে নির্দেশনা দিয়ে আসছি, যেখানে আপনাদের কখন কোথায় কি করতে হবে তা বলেছি। নীল-বেগুনি রঙে লেখা যে সংকেত গুলো দিচ্ছি তাতেও এক চমক রয়েছে। কথা হচ্ছে инопланетянин রা বেগুনি রং দেখতে পায় না। ঠিক বেগুনি রং না। সঠিক ভাবে বলতে গেলে 400nm এর কম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো তারা দেখতে পায় না। আর আপনাদের দেওয়া কাগজের কালি 390nm এর আলো বিকিরণ করে। এতে করে инопланетянин রা শুধু নীল কালির মেসেজ দেখে ডিকোড করতে বসে। কিন্তু তারা তা ডিকোড করতে পারে না। হাহাহা…

সব স্থানের সবাই মনে মনে খুশি হয়।
инопланетянин দের শারীরিক অক্ষমতা তাদের অনেক সুবিধা দিয়েছে।

-আপনারা হয়তো ভাবছেন কেন আমি এসব বলছি। গুপ্ত জিনিস গুপ্ত থাকাই তো উত্তম। হ্যাঁ , গুপ্ত জিনিস গুপ্ত থাকাই উত্তম। কিন্তু আমাদের গুপ্ত জিনিস গুপ্ত থাকার কারণ হারিয়ে ফেলেছে। ভয় পাবেন না। আমরা ধরা পড়িনি। বরং আমরা সফল হয়েছি।
সবার বুক দুরুদুরু করছে।

-আমরা আমাদের লড়াইয়ে আজ সফল। আপনাদের সকলের সব কাজ শেষ। আমাদের প্ল্যান সফল। আপনারা হয়তো ক্ষুব্ধ হবেন আমি আপনাদের সবাইকেই বোকা বানিয়েছি এটা জেনে। কিন্তু নিজের মিত্রকে বোকা বানানোই হচ্ছে শত্রুকে বোকা বানানোর সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা। আপনাদের দিয়ে যতটুকু করানো উচিত ততটুকুই করানো হয়েছে। কোথায় কী ভাঙতে হবে, কখন কাকে মারতে হবে, কোথায় কখন বোমা ফাটাতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ আপনারা নিষ্ঠার সাথে করেছেন। আপনাদের কৃত কাজ একটি শৃঙ্খল ক্রিয়াকে চালু করবে যা инопланетянин দের প্রতিটি স্থাপনাই ভেঙে দিবে। আপনাদের সাথে কথা বলার শুরুর মুহূর্ত থেকেই সেই ক্রিয়া চালু হয়েছে। এখন সেই ক্রিয়াটি চূড়ান্ত রূপ নিতে 30 সেকেন্ড বাকি। আমার কাউন্ট-ডাউন শেষ হলেই আপনারা বিজয় ধ্বনি শুনতে পারবেন। ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১

…

…

-আর এক সেকেন্ড

-হয়তো এক মিনিট

এক মিনিট

দুই মিনিট

তিন মিনিট

কোনোকিছুই হচ্ছে না।

ধুম…(দরজা ভাঙার শব্দ)

একে একে সশস্ত্র অনেক инопланетянин ই প্রতিটি গুপ্ত ডেরায় ঢুকে পড়লো।

-лвдвв

-влвдвж аоадатвв

-ввдвьввввд лвдвьвтв жыюызазпгё

-ыхыжылвтвташша ыююыыьтвалллв

-…(এটা রাশিয়ান না, আমি রাশিয়ান পারি না, ধরে নেন инопланетянин ভাষা)(ট্রান্সলেসন চলছে….)

-হ্যালো, কমান্ডার…

-হ্যালো। হ্যাঁ… রিপোর্ট কী?

-আমরা ওদের লিডার কে ধরেছি।…

-গুড। আর বাকিদের কি খবর? অন্য গুপ্ত ডেরাগুলোর?

-সেগুলোতেও আমাদের লোক স্টেশনড আছে। ওদের খুঁজে পাওয়া কোনো ব্যাপার-ই না। আমরা যে অবলোহিত আলো দেখতে পাই তা এরা জানে না। 780nm+ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো দেখি যা এরা দেখতে পায়না। এদের শরীর থেকে নির্গত আলো খুব সহজেই ডিটেক্ট করতে পারি। জাস্ট প্রমাণের জন্য এদের এতদিন কিছু করি নি।

-ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেয়েছ?

-হ্যাঁ,স্যার। ওদের লিডারের সব কথা রেকর্ড করেছি।

-গুড। এই উন্মাদদের বিরুদ্ধে এবার প্রমাণ আছে। মহাজাগতিক আদালত এবার এদের উপরে আমাদের কর্তৃত্ব সঁপে দিতে রাজি হবে।

-বাট স্যার, আমরা তো এদের উপরে কর্তৃত্ব চাই না। আমরা তো এদের হেল্প করতে এসেছি।

-তুমি কচু জানো। অবশ্য তোমাকে জানানো প্ল্যানের মধ্যে ছিলো না। আমাদের টার্গেট প্রথম থেকেই এদের কর্তৃত্ব দখলে নেয়া ছিলো। তোমাকে সহ অধিকাংশ инопланетянин কেই বোকা বানানো হয়েছে এই বলে যে আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে এসেছি। একটি ৩য় স্তরের বুদ্ধিমান সোসাইটিকে নিজেদের কবলে আনাই আমাদের মহাবিশ্ব জয়ের প্রথম ধাপ।

-তাহলে তাদের বিনোদন বন্ধ করে দেয়া কি একটা টোপ ছিল?

-তা নয়তো কী? মহাজগতে এটা ধ্রুব সত্য যে বিনোদন আমাদের সময় ও ব্রেইন অনেক নষ্ট করে। ফলে মহাজাগতিক আদালত আমাদের পদক্ষেপকে ভালো ভাবেই নিবে। একটা ৩য় স্তরের সোসাইটি হয়েও এরা এটা আবিষ্কার করতে পারেনি ভেবে আমি হতবাক। একটা বড় বাধা থাকা সত্ত্বেও এদের এতদূর এগোনোর বিষয়টা এদের পটেনশিয়াল শক্তি যে কত তা বুঝায়।

মাহাতাব মাহদী

কোভিড-১৯ এর কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি

করোনাভাইরাস! বিশ্বজুড়ে এক আতঙ্কের নাম। ভয়াবহ সংক্রামক এ রোগ গত সাড়ে ৪ মাস ধরে বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। ভাইরাসটির আরেক নাম ২০১৯-এনসিওভি বা নভেল করোনাভাইরাস। এটি এক ধরণের করোনাভাইরাস। করোনাভাইরাসের অনেক রকম প্রজাতি আছে, কিন্তু এর মধ্যে মাত্র ছয়টি প্রজাতি মানুষের দেহে সংক্রমিত হতে পারে। তবে নতুন ধরণের ভাইরাসের কারণে সেই সংখ্যা এখন থেকে হবে সাতটি। করোনা ভাইরাসের কোন ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক না থাকায় বিভিন্ন ঔষধ ও পদ্ধতি চেষ্টা করা হচ্ছে। গত এক মাসের এসব আপডেট নিয়েই এই প্রতিবেদন।এ পর্যন্ত করোনা মোকাবেলায় ৯০ এর বেশি ঔষধ নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অনেক পরীক্ষা চালু আছে। এখানে গত ১ মাসের আলোচিত কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি উল্লেখ করা হল।

হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনঃ
২৬ মে স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নামে একটি ওষুধের পরীক্ষা স্থগিত করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মেডিকেল জার্নাল দ্য ল্যান্সেটে প্রকাশিত এক গবেষণায় জানানো হয় যে, করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন ব্যবহার করলে তা তো কোন কাজেই আসে না, উল্টো এটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের মৃত্যু ঝুঁকি বাড়ায়।

৩ জুন পুনরায় করোনা ভাইরাসের জন্য হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইনিন ব্যাবহারের ঘোষণা দেয়া হয়। WHO থেকে বলা হয়, তারা ৪৫ জনের উপর পরীক্ষামূলক ভাবে এই ঔষধ প্রয়োগ করে অন্যদের তুলনায় সফলতা পাওয়ায় পুনরায় ব্যাবহারের অনুমতি দেয়া হল।তবে কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিলে তা স্থগিত করা হবে বলে জানায় তারা।

প্লাজমা থেরাপিঃ
১মে WHO করোনা ভাইরাসের জন্য প্লাজমা থেরাপির ব্যাবহারের অনুমোদন দেয়। অবশ্য সব রোগীদের শরীরে কাজ করার ব্যাপারে সন্দেহাতীত প্রমাণ না থাকায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাকে শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রাখার পরামর্শ দেয়।

২০ মে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় পরীক্ষামূলক ভাবে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় প্লাজমা থেরাপি ব্যাবহারের অনুমতি দেয়।

১ জুন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্লাজমা থেরাপি ব্যাবহারকে লাল তালিকাভুক্ত করে এবং এর ব্যাবহার স্থগিত করে।কারণ WHO এর পরীক্ষায় এর ভালো ফলাফল পাওয়া যায় নি। প্লাজমার পরিবর্তে অক্সিজেন সাপোর্টকে বেশি গুরুত্ব দিতে বলা হয়।

৩ জুন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে জানানো হয় WHO ও বিশেষজ্ঞগণ লাল তালিকাভুক্ত করার পরেও প্লাজমা থেরাপির পপরীক্ষামূলক ব্যাবহার চলবে। কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্রিটিকাল কেসে ব্যাবহারে প্লাজমা থেরাপি ভালো ফলাফল দিয়েছে। তবে যথাযথ ব্যাবহার করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

*উল্লেখ্য শুধু বাংলাদেশই নয়, ব্রিটেন সহ আরো বেশ কয়েকটি দেশ WHO এর নির্দেশনার পরেও প্লাজমা থেরাপির পরীক্ষামূলক ব্যাবহার চালাচ্ছে।

রেমিডিসিভিরঃ
৩০ শে এপ্রিল ব্রিটেনে রেমিডিসিডির এর পরীক্ষায় সাফলতা পাওয়া গেছে বলে ঘোষণা আসে। ৪ মে আমেরিকায় রেমিডিসিভির করোনা চিকিৎসায় ব্যাবহারের অনুমতি দেয়া হয়। এর ৪ দিন আগেই, ১ মে WHO রেমিডিসিভির এর পরীক্ষামূলক ব্যাবহারের অনুমোদন দেয়। ৮ মে বেক্সিমকো সহ আরো দুটো কোম্পানী বাংলাদেশে রেমিডিসিভির উৎপাদন শুরু করে।

মে মাসের শেষের দিকে দুটো প্রেস কনফারেন্সে WHO থেকে বলা হয়,বেশ কয়েকটি দেশে রেমিডিসিভির ব্যবহারের পাশ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যাওয়ায় আপাতত ব্যাবহার যতটা সম্ভব সীমিত করতে বলা হয়েছে।

২২ শে মে BMCH ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ থেকে দাবি করা হয় hydroxychloroquine, ivermectin এবং doxycycline করোনা রোগীদের চিকিৎসায় ব্যাবহার করায় বেশ ভালো ফলাফল মিলেছে। এর আগেই বিভিন্ন দেশ এগুলোর ব্যাবহার শুরু করলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ivermectin এবং doxycycline করোনা চিকিৎসায় ব্যাবহারের করনীয় নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় নি।

ফ্লাভিপিরাভিরঃ
৪ মে জাপান ফ্লাভিপিরাভির (Favipiravir) করোনা ভাইরাসের চিকিৎসায় পরীক্ষা করে সাফল্য লাভ করার দাবি করে। জাপান পরবর্তী সপ্তাহ থেকেই এই ঔষধ রপ্তানি করা শুরু করে। তবে Favipiravir এর ফেস III এর পরীক্ষা এখনো চলছে। WHO এই নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোন বিবৃতি দেয়নি।

আসলে, Favipiravir ইনফ্লুয়েঞ্জার চিকিৎসায় ব্যাবহার হত এবং কোভিট ১৯ এর সাথে সার্স ভাইরাস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মিল বিদ্যমান। ১ জুন রাশিয়ায় পরীক্ষামূলক ভাবে Favipiravir ব্যাবহারে আশাজনক সাফল্য পাওয়ায় রাশিয়ায় তা সব চিকিৎসাকেন্দ্রে ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়।

এদিকে করোনা ভাইরাসের আক্রমনে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৮ লাখ কেস পাওয়া গিয়েছে। করোনা ভাইরাসের আক্রমনে প্রান হারিয়েছেন প্রায় ৪ হাজার মানুষ।প্রায় সাড়ে ৩২ লাখ মানুষ সুস্থ্য হয়েছেন এবং ৩০ লাখ মানুষ এখনো চিকিৎসাধীন। যাদের মধ্যে ২% লোকের অবস্থা সংকটাপন্ন। বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর হার ১১ % । (৪ জুনের তথ্যানুযায়ী) । উল্লেখ্য বাংলাদেশের মোট মৃত্যুর ৫১% গত ১৫ দিনে হয়েছে। তাই আগামী দিনে বাংলাদেশের জন্য যে কঠিন হতে চলেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
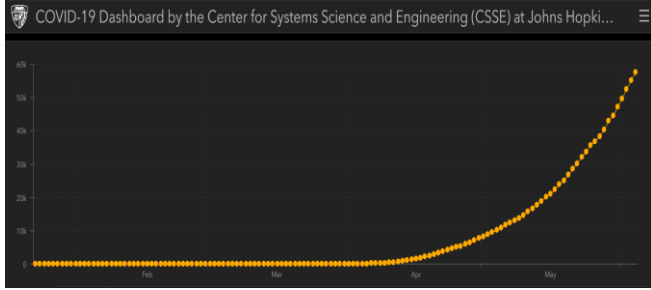
অপরদিকে বাংলাদেশে গত ১ মাসে করোনা ভাইরাস ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। সাড়ে ৬০ হাজার কেস শনাক্ত হয়েছে এবং ৮১১ জন মারা গিয়েছেন। সুস্থ্য হয়েছেন ১৩ হাজারের মত মানুষ। দেশে মৃত্যু হার ১.৪% । তবে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত মাত্র ১ জন রোগীকে ক্রিটিকাল পরিস্থিতিতে আই সি ইউ তে রাখা হয়েছে। যেখানে ভারতে এই সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার যা টোটাল কেসের ৩.৮% ।

89,249	Pakistan
84,174	China
65,495	Qatar
60,391	Bangladesh
58,907	Belgium

এদিকে ৪ জুনের তথ্য অনুযায়ী কনফার্মড কেসের ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১৫ তম। চায়না ও কাতারের পরেই বাংলাদেশের অবস্থান।

ঘরে থাকুন, সুস্থ্য থাকুন। সকলের মিলিত চেষ্টায় এ দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব।

মিনি সাই-ফাই

যেভাবে শুরু হয়েছিল, সেভাবেই শেষ হচ্ছে বিষয়টা। সিস্টেম ভাইরাস "সুইসাইড" আলোর বেগে ছড়িয়ে পরছে রোবোটদের মাঝে।আর মাত্র কয়েক ঘন্টা, মানুষ আবার বসবে সভ্যতার রাজসিংহাসনে।

-অনিন্দ্য সাহা

শনি

নাঈম হোসেন ফারুকী

১.
-শনি গ্রহটাকে সরাতে হবে স্যার।আর কোনো উপায় নেই।
গ্যালাক্টিক কাউন্সিলের সভাপতি রুথ্রাস্ট ভীষণ চিন্তায় পড়েছেন। কী করবেন বুঝতে পারছেন না।
কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে পুরো গ্যালাক্সির দেখভাল করার দায়িত্ব তাঁর।নির্বাচিত হওয়ার পরপরই সবগুলো বাসযোগ্য গ্রহে স্কাউট পাঠিয়েছেন কোন গ্রহের কী কী সমস্যা জেনে আসার জন্য।
বিশেষ করে গ্যালাক্সির ওরায়ন বাহুর ওই দিকে বেশ কিছু দরিদ্র শ্রেণির গ্রহ আছে, সেগুলোতে অনেক সমস্যা। এই যেমন পৃথিবী।ওইখানে সাতশো কোটি মানুষ হয়ে গেছে, মানুষগুলো সারাদিন মারামারি, কামড়াকামড়ি করছে, তাপমাত্রা নাকি হুহু করে বাড়ছে, পরিবেশের নাকি বারোটা বেজে যাচ্ছে, আরও হাজার হাজার সমস্যা।
কিন্তু স্কাউট তাঁকে এসে বলছে, আসলে কোনো সমস্যা নেই, সব সমস্যার মূল কারণ ওই শনি!!!
-তোমরা ভালো করে খোঁজ নিয়েছ তো?
-হ্যাঁ, স্যার।আপনিই তো বললেন, ওই গ্রহের নেতাদের বলে রাজা, সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী, রানি ইত্যাদি।আমরা প্রধানমন্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইনি, তিনি খুব ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু দুইজন মহারাজা আর একজন মহারানির সাথে ঠিকই দেখা করেছি।

স্কাউট রিবিট তার কাজে খুব খুশি। সে হাসছে।সভাপতির কপালে চিন্তার রেখা বাড়ছে।
-তারপর?
-মহারাজ প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ জ্ঞানী-গুণী মানুষ।তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নাসা থেকে ৭৯ তম মৌলের তৈরি একটা মেডেল নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাকে খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন, কীভাবে মানুষের রোগ-শোক, জরা-মৃত্যু থেকে শুরু করে যানজট, পরিবেশ দূষণ সব ওই শনির প্রভাবে হয়। বিশ্বাস করবেন না স্যার, আমি পৃথিবীর মানুষকে বোকা শোকা ভেবেছিলাম, ওরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানে এতো এগিয়ে গেছে জানতাম না! সুলতান বাহাদুর আহমেদ শাহ কুতুবপুরি আমাকে কয়েকটা টাইম-স্টোন দিয়েছে দশ হাজার ডলারের বিনিময়ে, এগুলো দিয়ে নাকি শনি গ্রহের প্রভাব একটু হলেও কাটানো যায়।আর রানি শকুন্তলা দেবী দিয়েছে আটটা ধাতুর তৈরি এই অদ্ভুত ডিভাইসটি।
এগুলো আসলেই চিন্তার বিষয়।পৃথিবীর মানুষজন মনে হচ্ছে আসলেই অনেক এগিয়ে গেছে।তিন মাস ধরে গবেষণা করেও এখানকার বিজ্ঞানীরা ওই অদ্ভুত পাথর আর মালাগুলোর রহস্যভেদ করতে পারেননি।রুথ্রাস্ট হার মানলেন।তাহলে কি , শনি গ্রহটাকে সরানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই?
না, স্যার।ওই গ্রহটাকে সরাতে হবে।তাহলে এমনিতেই পৃথিবীর সব ঠিক হয়ে যাবে।

২.
সারা পৃথিবীতে আতঙ্ক চলছে।
কে জানি শনির কক্ষপথে ছোট একটা ব্ল্যাক হোল ছেড়ে দিয়েছে। শনি গ্রহটা লণ্ডভণ্ড হয়ে ছিঁড়েছুড়ে ব্ল্যাক হোলে ঢুকছে।ভয়ঙ্কর ব্ল্যাক হোল আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে।গামা রেডিয়েশনে আকাশ ভেসে গেছে।আর কিছুদিন পর বৃহস্পতিও টিকবে না বলে নাসা ঘোষণা দিয়েছে।
পৃথিবীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।নাসা কিচ্ছু করতে পারবে না বলে দিয়েছে।
এই মুহূর্তে পৃথিবীবাসীর শেষ ভরসা মহারাজ রাজীব শাস্ত্রী।তিনি নাকি কৃষ্ণগহ্বরের কু-নজর থেকে পৃথিবীবাসীদেরকে রক্ষা করতে পারেন।রকেট পাঠিয়ে গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ পরিবর্তন করতে পারেন।
সমস্যা হলো অনেক খুঁজেও তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না।তাঁর ফোন বন্ধ। কোথায় ছুটি কাটাচ্ছেন কেউ বলতে পারছে না।

?!
ভাবী আপনার ছেলের রেজাল্ট জানতে আসলাম!

প্রফেসর জামালের ড্রাইভ মেশিন

রাহুল খান

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটি উপভোগ করছিল রায়হান। সে বেশ বড় মাপের ইঞ্জিনিয়ার, এরকম অবসর খুব একটা পাওয়া যায় না। রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া স্কুলগামী উচ্ছৃঙ্খল বালকদের দেখে তার মনে পরে গেলো সেই স্কুল জীবনের স্মৃতি। তার মনে হলো প্রিয় বন্ধু অভির কথা। সাথে সাথেই পকেটে ঝাঁকুনি দিয়ে বেজে উঠল ফোন। একি! এ যে অভির নম্বর! ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে উৎকণ্ঠা জনিত শব্দ ভেসে এলো।

অভিঃ "রায়হান, শোন। এই মুহূর্তে চলে আয় আমাদের বাড়িতে। তোকে এই মুহূর্তে খুব দরকার। আমি অপেক্ষায় আছি।"

এই বলে ফোন কেটে দিলো অভি। রায়হানকে কোনো কথা বলার সুযোগই দিলো না সে। অভির কথা শুনে রায়হান এক মুহূর্ত নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়ল অভির উদ্দেশ্যে। টানা ৪ ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে অভির বাড়ির ফটক দরজায় এসে পৌঁছালো সে। সেখানে বেশ বড় করে লেখা "প্রফেসর জামাল উদ্দিন খাঁ"। এই লোকটা দেশের অন্যতম একজন বিজ্ঞানী। রায়হান নিজেকে খুবই গর্বিত মনে করে কারণ সে এই আধ-পাগল মানুষটার ছাত্র। এই মানুষটার কাছেই সে বড় হয়েছে। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ৩ তলা বাড়িটির দিকে একবার ভালোভাবে তাকাল সে। এই বাড়ির দেয়ালে যেন তার শৈশব আজও লেগে আছে। নিচ তলাটা মাস্টার মশাইয়ের ল্যাব, আর উপরের ২টা তলায় অভিরা থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবে এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিলো অভি।

অভিঃ "রায়হান, এদিকে আয়।"

যদিও ল্যাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তারপরেও দুষ্টুমি করে অভি আর রায়হান অনেকবারই ঢুকেছে। ভেতরে ঢুকতেই তার সামনে সেই চির চেনা দৃশ্যটি ফুটে উঠলো।

অভি বলল-"আমি যা বলছি শোন। কোনো প্রশ্ন করবি না"

জানিস তো এই ল্যাবটা আমার বাবার। আসলে ল্যাব বললে ভুল হবে, আধা ল্যাব আধা লাইব্রেরি। বাবা প্রায় ১৪ বছর ধরে একদম নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে এই ল্যাবে সময় কাটিয়েছেন। তুই তো জানিস বাবা বহুমুখী প্রতিভাবান। তিনি সেই যুবক বয়স থেকে ছুটে বেড়াতেন এখানে ওখানে। কখনো খুঁজে

বেড়াতেন ইতিহাসের গোপন নথিতে,কখনো চোখ দিয়ে রাখতেন টেলিস্কোপে। এই যে লাইব্রেরি দেখছিস এখানে এমন নথিপত্র, বই-পুস্তিকা আছে যেগুলো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আমরা রাজবংশী, প্রাচীন বাংলায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের শাসন ছিল। আমার বাবা আমাদের পূর্ব পুরুষের প্রায় সব অর্থ সম্পদ শেষ করেছে এই ল্যাব আর লাইব্রেরির পেছনে।

যাইহোক,সেসব বলতে তোকে নিয়ে আসিনি। আমি তোকে এনেছি অন্য কিছু দেখাতে।

রায়হান কৌতূহলী চোখে অভির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘‘লাইব্রেরিটা বিশাল বড়। তাই বলে এর পেছনে এত অর্থ খরচ হয়েছে?’’

‘‘সবুর কর বলছি। এদিকে আয়।

ইশারা করে রায়হানকে একটা দরজা দেখাল। অভির পেছন পেছন রায়হান সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নিচের তলায়। রায়হান খুবই আশ্চর্য হলো।

অভি ও রায়হান ছোটবেলার বন্ধু। ওরা নার্সারি থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত এক সাথে পড়াশোনা করেছে। দুইজনে একসাথে ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। রায়হান ছিল অভির বাবা মানে প্রফেসর জামালের ছাত্র। অভি আর রায়হানের গলায় গলায় পিরিত ছিল সেই ছোটবেলা থেকেই। অভির বাবাও দুইজনকে সমান ভালোবাসতেন। এই বাড়িতেই রায়হানের শৈশব আর কৈশোর কেটেছে। অথচ সে জানতোই না বাড়ির নিচে আরও একটা অংশ রয়েছে।

অভি: ‘‘কি অবাক হচ্ছিস তো? আমিও প্রথমে অবাক হয়েছিলাম। আমি যখন বাবার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলাম তার পরে জানতে পারলাম যে আমাদের বাড়িটা আসলে ৩ তলা নয়, বাড়িটা পাঁচ তলা। মাটির নিচে দুই তলা আর উপরে তিন তলা।’’

লাইট অন করতেই রায়হান এক মুহূর্তে বুঝে গেল এত অর্থ খরচ হয়েছে কীসে। এ এক বিশাল গবেষণাগার। তার আগেই ভাবা উচিৎ ছিল যে দেশের এত বড় একজন বিজ্ঞানীর গোপন ল্যাব থাকাটা খুব স্বাভাবিক। অভি রায়হানকে একটা আলাদা কক্ষে নিয়ে গেল। ছোট্ট টেবিলের উপর কম্পাস কলম খাতা আর এলোমেলো কাগজ পত্র। মেঝেতে পড়ে আছে যন্ত্রপাতি এটা সেটা। কিন্তু রায়হানের চোখ এগুলোর কোনো কিছুই দেখেনি। সে শুধু চেয়ে আছে সামনের বিশাল আকৃতির একটা মেশিনের দিকে। রায়হান প্রশ্ন করার আগেই অভি বলতে শুরু করল-

‘‘রায়হান, তুই-ই একমাত্র পারিস আমাকে সাহায্য করতে। আমি ও বাবা গত ৪বছর ধরে এই মেশিনটি বানিয়েছি। এটা কোনো ছেলেখেলা যন্ত্র নয়। আমরা উদ্ভাবন করেছি এমন প্রযুক্তি যা দিয়ে এই মহাবিশ্বের যে কোনো স্থানে যাওয়া সম্ভব। শত কোটি আলোকবর্ষ দূরের কোনো স্থানে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চলে যেতে পারি আমরা। জানি তোর এসব আজগুবি কথা বার্তা মনে হচ্ছে, সব খুলে বলবো, কিন্তু তার আগে শোন... দুই দিন আগে বাবা মেশিন নিয়ে কাজ করছিলেন, আমি ইউরেনিয়ামের খরচ কেমন হলো তা চেক করছিলাম। এই সময় আমাদের বিড়াল নিউটন একটা তেলাপোকা দেখে তার পেছনে ছোটাছুটি করতে শুরু করে। কন্ট্রোল কী-বোর্ডের পাশে বাবার জন্য কাপ ভর্তি চা রাখা ছিল। নিউটন লাফ দিয়ে উঠল আর ব্যস!! ঘটে গেল অঘটন... বাবা মেশিনের মধ্যে! মেশিন লক হয়ে গেল! চোখের পলকে হারিয়ে গেলেন তিনি। চা পড়ে সিস্টেম খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঠিক মতো ইউরেনিয়াম ব্যবহার হয়নি। অতিরিক্ত রেডিয়েশন পুরো যন্ত্রটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। বাবা হারিয়ে গেছেন ব্রহ্মাণ্ডে। বাবাকে উদ্ধার করতে হবে রায়হান,আমার বাবাকে উদ্ধার করতে হবে।’’

রায়হানঃ ‘‘মাস্টার মশাইকে কী ভাবে খুঁজে পাবো? এটা তো অসম্ভব। আমরা জানি না উনি কোথায় আছেন।’’

অভিঃ ‘‘বাবা কোথায় আছে তা জানতে হলে আমাদের যেভাবেই হোক মেশিনটি ঠিক করতে হবে। জানিনা বাবাকে আমরা কি অবস্থায় পাবো, অথবা পাবো কি না তাও জানি না।’’

রায়হানঃ ‘‘আশা হারাস না। চল কাজে লেগে পড়ি।’’

অভিঃ ‘‘এই যে এগুলো মেশিনের নকশা।’’

অভি আর রায়হান দিন রাত এক করে পুরো ৩দিন পরিশ্রম করে মেশিনটি সারিয়ে তুলল। কয়েক দফায় সম্পূর্ণ জিনিসটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলো ওরা দুজন। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। এবার মেশিনটি চালু করার পালা।

রায়হানঃ অভি এভরিথিং ইজ ফাইন।

অভিঃ ওকে আমি অন করছি।

কয়েকটা সুইচ টিপে যন্ত্রটি চালু করা হলো। দুজনেরই যেন স্বস্তি ফিরে আসলো। অভি খুব দ্রুত হাত চালাতে লাগল। উত্তেজনায় সে ঘামছে। একটু পর ঠাস করে চেয়ারে বসে হাত পা ছেড়ে দিলো সে। রায়হান দৌড়ে অভির কাছে আসতেই সে অভির মুখে একটা আনন্দের মৃদু হাসি দেখতে পেল।

অভিঃ ‘‘নেভিস জি নট! নেভিস জি নট!

আশা করি বাবা এখনো বেঁচে আছেন। আমরা কিছুদিন আগে মহাকাশে বসবাস যোগ্য গ্রহ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম। কম্পিউটার সেটা সংরক্ষণ করে রেখেছিল। সৌভাগ্যক্রমে মেশিন যখন লক হয়ে যায়, তখন এটি কম্পিউটার থেকে ডাটা সংগ্রহ করে এবং পাঠিয়ে দেয় নেভিসে।’’

রায়হানঃ ‘‘তাহলে আর দেরি কেন? এবার মাস্টার মশাইকে ফিরিয়ে আনা যাক।’’
অভিঃ ‘‘হুম’’।
হাত চালিয়ে অভি মেশিনের জন্য নির্দেশনা ইনপুট করে দিলো। গুম গুম শব্দ করে মেশিনটির দরজা খুলে গেল।
রায়হানঃ ‘‘একি! মাস্টার মশাই কোথায়? এ যে ফাঁকা!’’

অভিঃ ‘‘আমাদের কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কিছু একটা মিসিং হয়েছে।’’
রায়হানঃ ‘‘কিন্তু কী?’’
কিছুক্ষণ এটা ওটা পরখ করতে করতে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল অভির মনে, বিড়বিড় করে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো- ‘‘ইনফিনিটি। দ্য ইনফিনিটি পার্টিকেল। বোধ হয় বাবার তৈরি সেই বিশেষ কেলাসটা শেষ হয়ে গেছে। এজন্য ইনফিনিটি পার্টিকেল তৈরি হয়নি।’’
রায়হানঃ ‘‘কী বলছিস যা তা। ইনফিনিটি পার্টিকেল আবার কী?’’
অভি ছুটে গেল পাশের ঘরে। টেবিলের উপরেই সব সময় রাখা থাকতো কেলাসের বাক্স। কিন্তু এখানে বাক্সটা নেই। সারা ঘর খুঁজেও বাক্সটি পাওয়া গেল না। তবে কি বাক্সটি চুরি হয়ে গেছে!! বিষন্ন হয়ে এ ঘরে এলো অভি।
অভিঃ ‘‘এবার তোকে সবকিছু না বললেই নয়। এতক্ষণ কিছু বলিনি, ভেবেছিলাম পরে বলব। শোন, এই যে মেশিনটি দেখছিস, বুঝতেই পারছিস এটা প্রকাশ পেলে মানব সভ্যতার কী বিপ্লব সাধন হবে। এটি এমন জিনিসকে সম্ভব করেছে যা আপাত দৃষ্টিতে আমাদের পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলোকে মানে না বলেই সবাই জানে। কিন্তু আমরা সেই অসাধ্যকে সাধন করেছি যাতে করে প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গে না, বরং আরও অনেক কিছুই উন্মোচন করে। আলোর গতির চেয়ে বেশি গতিতে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই প্রযুক্তি কয়েক মুহূর্তেই মহাবিশ্বের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাতায়াতকে সম্ভব করেছে, অথচ কোনো নিয়ম না ভেঙ্গেই।’’ রায়হান শুধু অভির দিকে ড্যাবা ড্যাবা চোখে তাকিয়ে আছে। এই তিনদিন সে শুধু মেশিনের নকশা দেখে মেশিনকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। কাজে মনোযোগ দিতে যেয়ে সে ভুলেই গেছিল, আসলে এই মেশিনটি কী এক বৈপ্লবিক আবিষ্কার।
অভিঃ ‘‘নিশ্চয় আন্দাজ করতে পেরেছিস মেশিনটি কী কাজ করে?’’
রায়হানঃ ‘‘তা পেরেছি বটে। টেলিপোর্টেশন।’’
অভিঃ ‘‘ঠিক তাই।’’
রায়হানঃ ‘‘কিন্তু তোরা এটাকে সম্ভব করলি কীভাবে? তাও আবার এতো লম্বা দূরত্ব পাড়ি দেবার মতো!’’
অভিঃ ‘‘নিকোলা টেসলার সেই রহস্য সমাধান করে।’’
রায়হানঃ ‘‘৩ ৬ ৯!!!’’
অভিঃ ‘‘ঠিক ধরেছিস’’।
রায়হানঃ কিন্তু এটা তো মানুষের মুখরোচক কথা।
অভিঃ আমরাও তাই ভাবতাম। বললাম না বাবার পুরাতন নথিপত্র এটা-সেটা সংগ্রহের নেশা ছিল।
রায়হানঃ হ্যাঁ।
অভিঃ কলকাতা পোর্ট বন্দরে এক লাইব্রেরিয়ানের কাছে একটা আধা নষ্ট হওয়া খাতা পেয়েছিল বাবা। বাবার দক্ষ চোখ জিনিসটা চিনতে একদম দেরি করেনি। খাতার কোণে স্বাক্ষরটা দেখেই তিনি এর মাহাত্ম্য বুঝে যান। ওটা ছিল টেসলার গবেষণাপত্রের একটা অংশ। খাতাটা বাবা নিয়ে আসেন এখানে। প্রথম দিকে পৃষ্ঠাগুলো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছিল। পরেরগুলো ছিল বেশ ভালো। তিনি চেয়েছিলেন এমন কিছু উদ্ভাবন করতে যা কিনা আমাদের দূরের পথকে বানিয়ে ফেলতে পারে একেবারে নগণ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক জাহাজে এই জিনিসের পরীক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে ঘটে ভয়ংকর ব্যাপার। জাহাজটি কিছু সময়ের মধ্যে উধাও হয়ে যায় এবং এসে পরে কয়েক হাজার নটিক্যাল মাইল দূরে। একজন নাবিকও বেঁচে ছিল না। বোধহয়, কোনোভাবে সেখান থেকেই এই গবেষণাপত্রটি কলকাতা পোর্টে এসে পৌঁছেছে। যাইহোক, টেসলার খাতা জুড়ে তাত্ত্বিক হিসাব নিকাশের সবগুলোতেই এসে অসঙ্গতি দেখাতো কয়েকটি সংখ্যা। এই বিশেষ সংখ্যাগুলো বারবার চলে আসছিল যেগুলো না দিলে সমীকরণ শুদ্ধ হয় না। কখনো গুণিতক কখনো-বা সূচক। টেসলা সারাজীবন ধরে ঐ সংখ্যাগুলোর অর্থ বের করতে পারেননি। এই বিশেষ সংখ্যাগুলোই ছিল ৩, ৬ আর ৯। এই সংখ্যাগুলো দেখে বাবা উপলব্ধি করেছিল কেন টেসলা বলেছিল "কেউ যদি ৩, ৬, ৯ এই সংখ্যাগুলোর রহস্য উদ্ধার করতে পারে তাহলে সে মহাবিশ্বের সবকিছু জেনে যাবে।" বাবা লেগে পড়ে সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে। ১০ বছর রায়হান। ১০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে বাবা এই রহস্যের অন্ত করেছেন। তারপর এই জিনিসকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় তা নিয়ে বাবার সাথে আমিও যোগ দিলাম। চার বছর ধরে আমরা এই মেশিনটি বানিয়েছি।
রায়হানঃ কিন্তু এই ৩, ৬, ৯ এর ব্যাপারটা কি? মাস্টার মশাই কি পেলেন এই সংখ্যা থেকে?
অভিঃ জানিস তো রায়হান টেসলা আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি একদম মানতেন না।
রায়হানঃ হ্যাঁ, তার কাছে এগুলো গাঁজাখুরি মনে হয়েছিলো।

অভিঃ হুম, টেসলা রিলেটিভিটি হজম করতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে তিনি বুঝতেন না, আসলে বোঝার চেষ্টাই করেননি। আর গোলটা সেখানেই বেঁধেছে। আর দুবছর বাঁচলে হয়তো নিজের চোখেই $E=mc^2$ এর ধ্বংসাত্মক রূপটা দেখেই যেতে পারতেন। রিলেটিভিটি আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের সফলতা বাবাকে সাহায্য করেছে। ৩, ৬, ৯ এর ধাঁধা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলো দুটো তত্ত্বকে মিলিয়ে। টেসলার সমীকরণে বাঁধা দেওয়া ৩ আসলে একটা নতুন কনার কথা বলছিল। এই কণার নাম দেওয়া হলো 'দ্য ইনফিনিটি পার্টিকেল', যার স্পিন নাম্বার ৩। ৯ সংখ্যাটা আসলে এই মহাবিশ্বের অন্য এক চেরা ইঙ্গিত করছিল। ৯ হলো মাত্রা। এতদিন জেনেছি জগতকে ভালোভাবে ব্যাখ্যার জন্য ১১টি মাত্রা কল্পনা করা হয়। তবে আমরা যে ৯ মাত্রার একটা আস্তকণাকে পেয়ে যাবো তা কখনই ভাবিনি। এই কণা স্পেস-টাইমকে ছিদ্র করে লুপ বানিয়ে ফেলে। কিন্তু এই লুপ অতিমাত্রায় ছোট তাই এর মধ্যে দিয়ে কোনো কিছুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রেরণ করা যাবে না। এই কণাকে পাওয়ার জন্য বাবা এক ধরনের ক্রিস্টাল তৈরি করে ফেললেন। বিপুল পরিমাণ শক্তি এই ক্রিস্টালগুলোতে ফেললে বেরিয়ে আসে ইনফিনিটি কণা। বলতে পারিস আমাদের ব্যয় করা মোট শক্তির প্রায় ৭৫% এখানেই। বাকিটুকু ব্যয় হয় আরেক অদ্ভুত কাজে।

রায়হানঃ ধারণা করছি ৬ এর রহস্যটা ওখানেই আছে।

অভিঃ একদম তাই। এটা আরও বিচিত্র বিষয়। ইনফিনিটি যে লুপ তৈরি করে তার মধ্যে দিয়ে কোন কিছুকে পাঠানো সম্ভব নয়। এজন্য বাবা আরেকটা ব্যবস্থা বের করেছেন। কোন কিছুকে ডি-ম্যাটারালাইসড করে এই লুপ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া। অপর প্রান্তে পৌঁছানোর পর সেটা আবার ম্যাটারালাইসড হবে। এটা ঠিক কিভাবে হবে তা একমাত্র বাবা জানেন। এ বিষয়ে তিনি আমাকেও কিছু বলেননি। মেশিনটা চালানোর জন্য বিপুল শক্তির প্রয়োজন। এজন্য আমরা নিজেরাই ইউরেনিয়াম ফিশনের ব্যবস্থা করেছি। যাতে করে এই গবেষণার বিষয়টা বাইরে জানাজানি হয়ে না যায়। কাজের মধ্যে ঝামেলা চাচ্ছিলাম না। কিন্তু ক্রিস্টালের সেই বাক্সটা চুরি হয়ে গেছে। যেভাবেই হোক সেটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

রায়হান পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও ছোট-খাটো গোয়েন্দা বলে তাকে সম্বোধন করাই যায়। কারণ ভার্সিটিতে পড়াকালীন সে চোর ধরিয়ে দিয়ে বেশ পরিচিতি লাভ করেছিল। ক্যাম্পাসে, হলে বিভিন্ন চুরি ছিনতাই এগুলোর অপরাধীকে সে খুঁজে বের করতো। একবার এক ছাত্র খুন হওয়ায় ভার্সিটিতে বেশ খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। রায়হানের সহযোগিতায় পুলিশ খুব দ্রুত খুনিদের ধরতে সক্ষম হয়। এবার তাকে খুঁজতে হবে ক্রিস্টাল চোরকে। অভি রায়হানকে নিয়ে গেলো যেখানে ক্রিস্টালের বাক্সটা রাখা থাকতো। রায়হানের খুঁতখুঁতে চোখ একবার দেখতেই সব পরিষ্কার বুঝে গেলো। টেবিলের নিচে পড়ে থাকা একটা পালক দেখে সে অভির দিকে তাকিয়ে বলল,"চল ,বেড়োতে হবে।" গাড়ি নিয়ে রায়হান আর অভি এসে থামল একটা পেট এনিমেল শপের সামনে।

রায়হানঃ আপনার এখান থেকে কেউ কি ম্যাকাও পাখি কিনেছিল? এই ধরুন গত পাঁচ মাসের ভেতর।

দোকানি তিন জনের নাম বলল-অমরেশ বাবু, সৈকত হোসেন আর জাফর আলী।

রায়হানঃ কি বুঝলি?? চল প্রফেসর জাফর আলীর বাসায়।

অভিঃ এখন প্রফেসরের বাড়ি কেন?

রায়হানঃ শুনলি না? দোকানি জাফর আলীর কথা বলল।

অভিঃ দোকানি তো প্রফেসর জাফরের কথা বলেনি।

রায়হানঃ প্রফেসর জাফর ছাড়া অন্য কেউ কি বুঝবে ঐ ক্রিস্টালের মূল্য কি...

অভিঃ ভেবে দেখ তুই কিন্তু দেশসেরা একজন গবেষকের উপর সন্দেহ করছিস।

রায়হানঃ তা করছি বটে। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি প্রফেসর এখন তার ল্যাবে আছে। তুই যা মাস্টার মশাইয়ের ল্যাবে গিয়ে লেজার গানটি নিয়ে আয়। আমার একটু কাজ আছে। দুজনে এক ঘণ্টা পর প্রফেসর জাফরের ল্যাবের সামনে দেখা করবো।

রায়হানের কথা মতো অভি হাজির হলো ঠিক এক ঘণ্টা পর। কিছুক্ষণ পরেই রায়হানের গাড়ি আসলো। অভি রায়হানকে দেখে একটু হকচকিয়ে উঠল। রায়হানের সাথে আরও চার জন।

অভিঃ একি সৌমিক, অন্তু, রাতুল আর আবির তোরা এখানে... আর সবাই পুলিশের পোশাক পড়েছিস কেন?

রায়হানঃ ভেতরে গেলেই বুঝবি। আয়।

ওরা সবাই ঢুকে পড়লো জাফরের ল্যাবে। জাফর সাহেব নিজের কাজে এতটাই ব্যস্ত যে ওদের দেখতেই পায়নি। রায়হান উচ্চস্বরে হাঁক ছাড়ল- প্রফেসর।

প্রফেসর জাফর ঘুরে দাঁড়াতেই পুলিশ বেশে রায়হান ও তার বন্ধুদের দেখে ভয় পেয়ে গেল।

রায়হানঃ সরি, প্রফেসর। আমরা আপনাকে গ্রেফতার করতে এসেছি। আপনার বিরুদ্ধে মূল্যবান ধাতু চুরির অভিযোগ আছে।

প্রফেসর জাফরঃ কি বলছেন যা তা। না, না এটা হতে পারেনা। কেউ আপনাদের সাথে ঠাট্টা করেছে। এটা মিথ্যে কথা।

প্রফেসর এসব বলতে বলতে হঠাৎ জানালা টপকে দৌড় দিলো। সৌমিক আর আবির প্রফেসরের পিছু নেওয়ার অভিনয় করতে দেখে প্রফেসর কোনোমতে তার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেল।

প্রফেসরের টেবিলে ক্রিস্টালের বাক্স পেয়ে অভি রায়হানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল।

রায়হানঃ যেটা আনতে বলেছিলাম সেটা এনেছিস?

অভিঃ এনেছি। তবে এর আর দরকার কি?প্রফেসর তো কোনো ঝামেলা ছাড়াই পালিয়ে গেল।

রায়হানঃ হ্যাঁ, তবে কাজ এখনো শেষ হয়নি। এতো নাম করা প্রফেসরের ল্যাবে সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি আর কয়েকটা কাগজ শোভা পায় না। খুঁজে দেখ নিশ্চয়ই কোন গোপন কক্ষ আছে।

যেমন কথা তেমন কাজ। একটা বড় ছবির পেছনে পাওয়া গেলো একটা রাস্তা। ঘোরানো সিঁড়ি গেছে নিচের দিকে। ওরা সবাই সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল। একটা দরজা খুলতেই অভি একেবারে হতবাক। এ যে অবিকল তাদের বানানো মেশিন। ঘরের এক কোণে খাঁচায় রাখা ম্যাকাও পাখি। পাখিটির কাছে যেতেই অভি আর রায়হানের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। ম্যাকাও পাখির নাকের উপর ছোট্ট ক্যামেরা।

রায়হানঃ ম্যাকাও অনেক কাজের পাখি অভি। তুই একে নিজের সাথে নিয়ে যা। প্রফেসর একে দিয়ে অপরাধ করাচ্ছেন।

প্রফেসর জাফরের গোপন ল্যাবে পাওয়া গেলো প্রফেসর জামালের বিভিন্ন কাজের কপি, পেন্টেন্ট।

রায়হানঃ এবার বুঝলি তো অভি, কেন তোকে লেজার গানটা নিয়ে আসতে বলেছি। এখন এই মেশিনটিকে ধ্বংস করে ফেল।

লেজার গান দিয়ে মেশিনটিকে একেবারে ছাই করে ফেলা হলো। তারপর সবাই মিলে প্রফেসর জামালের কাজের কপিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করে জ্বালিয়ে দিলো। এখানকার কাজ শেষ। তবে কাজ এখনো বাকি আছে, তাড়াতাড়ি নিজেদের ল্যাবে পৌঁছাতে হবে। বাকি চারজনকে বিদায় জানিয়ে রায়হান ও অভি ফিরে এলো প্রফেসর জামালের ল্যাবে। ঠিক জায়গায় ক্রিস্টাল বসিয়ে আবার চালু করা হলো দানব যন্ত্রটি। কী-বোর্ডে সংকেত দিতেই বিমানের পাখার মতো করে একটা শব্দ শুরু হলো। মেশিনের স্বচ্ছ দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভেতরের ক্রিস্টালের আভা। চোখের পলকে একটা তীব্র নীলাভ-গোলাপি আলো পুরো ঘরটাকে আলোকিত করে দিলো। ফোঁস করে একটা শব্দ হয়ে মেশিনের দরজা খুলে গেলো। একটা শুকনো কাঁশি দিলেন প্রফেসর জামাল। এক ছুটে যেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল অভি। চোখে জল ধরে রাখতে পারল না রায়হানও। একটা দাঁত কেলানি হাসি দিয়ে প্রফেসর জামাল বললেন- নাথিং সিরিয়াস বয়েজ, আমি জানতাম আমি ফিরে আসবো। আমি তোমাদের জন্য কিছু একটা এনেছি।

অভি ও রায়হান একসাথে বলল- কী!!

পকেট থেকে খয়েরি রঙের মোজার মতো দেখতে একটা জিনিস বের করলেন প্রফেসর। আমি একটা দ্বীপে পৌঁছে গেছিলাম। দ্বীপ জুড়ে এই জিনিসের বিস্তার। মাটি থেকে মাথা উঁচিয়ে বেরিয়ে আছে এই খয়েরি রঙের পাতার মতো জিনিস। এগুলো ঐ গ্রহের উদ্ভিদ হলেও খুব একটা অবাক হবো না। চলো, কাজে লেগে পড়ি।

রায়হানঃ কি!!

অভিঃ বাবা!!!

প্রফেসরঃ আরে ঠাট্টা করছি। হা হা হা

।

।

।

৩ তলায় সোফায় আরাম করে বসে চায়ের আসরে বসেছে তিনজন। কথার ফাকে রায়হানের হঠাৎ মনে হলো একটা জিনিস তো জিজ্ঞেস করা হয়নি।

রায়হানঃ আচ্ছা অভি এতো ইউরেনিয়াম পাচ্ছিস কই??

অভিঃ কেন...এই যে আমাদের ব্রহ্মপুত্রে...

নাঈম হোসেন ফারুকী
চা কফি আর
কোয়ান্টাম মেকানিক্স
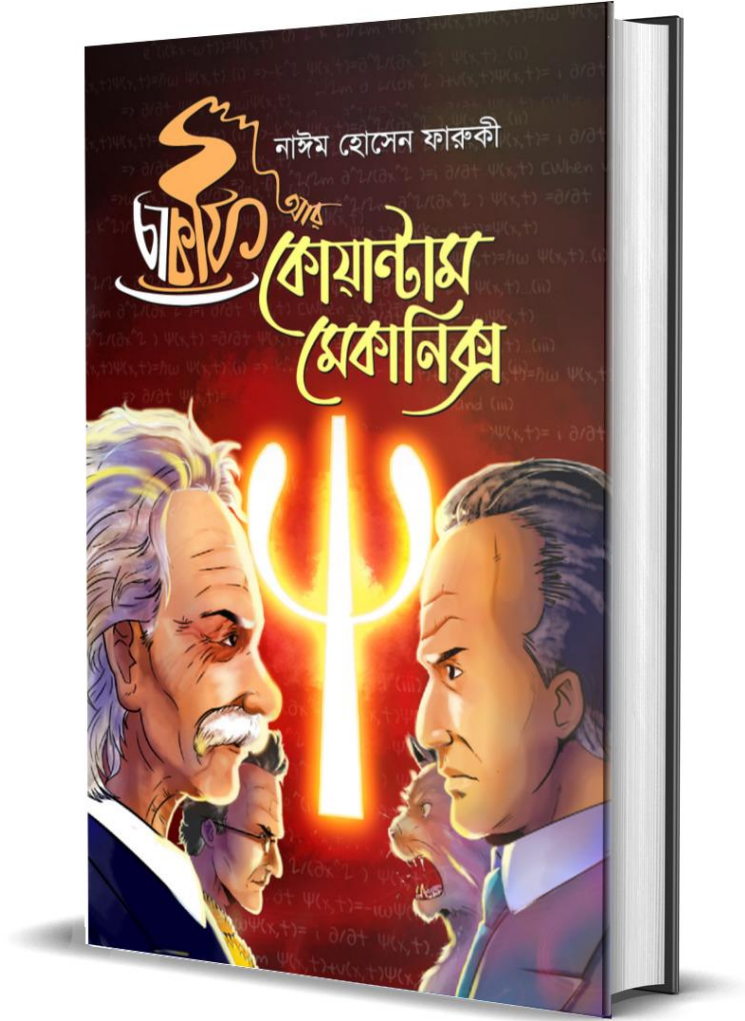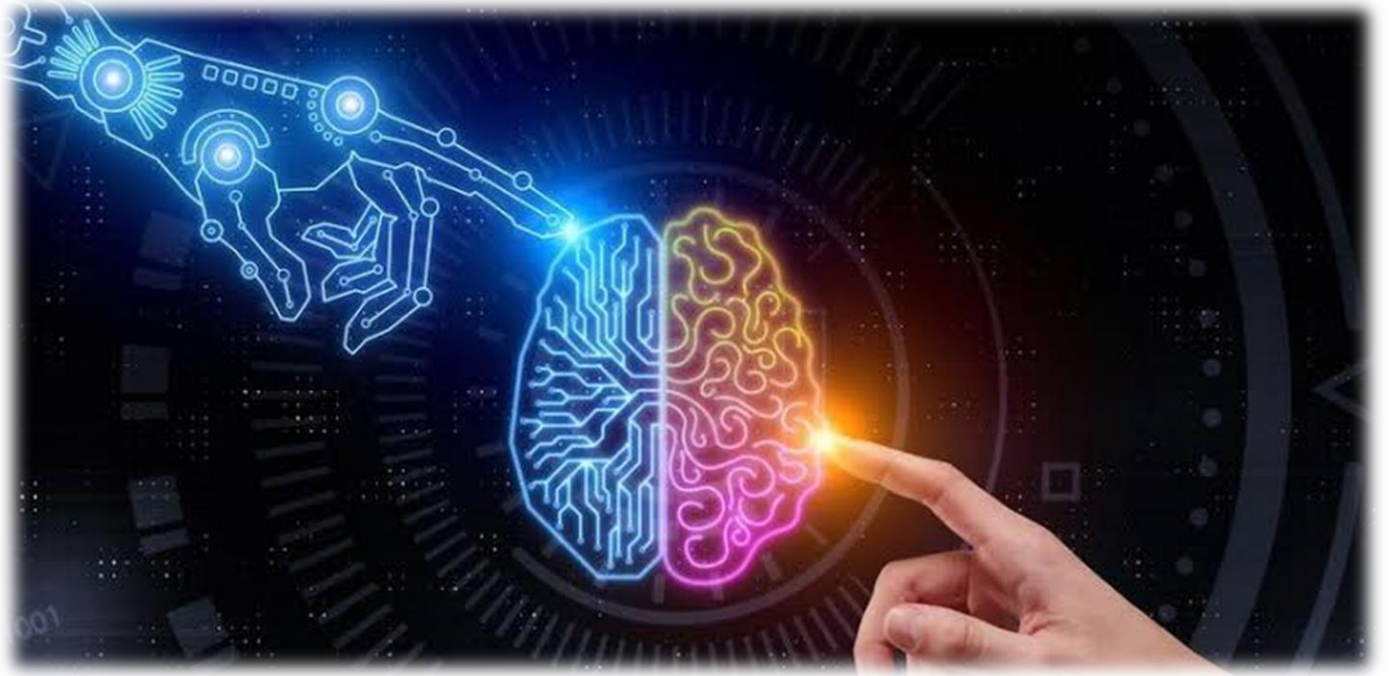
নিউরালিংক: কল্পবিজ্ঞান থেকে বাস্তবের অতিমানব

রবিউল হাসান

মন অর্থাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে একে অপরের সাথে যোগাযোগ করা অনেক সাই-ফাই কিংবা ফ্যান্টাসি মুভিতে দেখেছেন নিশ্চয়ই।বিখ্যাত ফ্যান্টাসি মুভি "লর্ড অফ দ্য রিংস" এবং "দ্য হবিট"-এ দেখা যায় এলফ্‌রা এবং গ্যান্ডালফ্ মনে মনে যে কারো সাথে কথা বলতে পারে।এলফ্ রানি গ্যালাড্রিয়াল মনে মনে ফ্রোডোকে জানিয়ে দেয় যে, রিংয়ের ফেলোশিপ ভেঙে যাচ্ছে, রিভেন্ডেলের এলফ্ কিং এলরন্ডকে বলে কীভাবে ডার্ক লর্ড সাওরন রোহান এবং গন্ডর রাজ্য আক্রমণ করবে কিংবা গ্যান্ডালফের সাথে গ্যালাড্রিয়ালের মনে মনে কথোপকথন।আবার বিখ্যাত সাই-ফাই মুভি "দ্য ম্যাট্রিক্স"-এ দেখা যায় নিও এবং ট্রিনিটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুংফু কিংবা হেলিকপ্টার চালানো শিখে যায়।

এবার ভাবুন ফেসবুকে পোস্ট দিতে কিংবা চ্যাটিং করতে যদি হাতে টাইপ করতে না হতো! শুধু মনে মনে ভাবতেন আর সেটা অটোম্যাটিক লেখা হয়ে যেত।কিংবা টিভিতে ন্যাশনাল

জিওগ্রাফিক দেখার মাঝে হঠাৎ ডিসকভারি দেখতে ইচ্ছা হলো। কিন্তু চ্যানেল চেঞ্জ করলেন রিমোটের পরিবর্তে আপনার মন অর্থাৎ আপনার ব্রেইন দিয়ে।ব্যাপার গুলো সত্যি অদ্ভুত, তাই না? কল্প-বিজ্ঞানে এসব কমন বিষয় হলেও এর কি বাস্তব রূপ সম্ভব? উত্তরটি হলো- হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব!

বর্তমান দুনিয়ায় বিজ্ঞানপ্রেমীদের ভেতর Elon Musk কে চেনে না এমন একজন মানুষ-ও হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষ করে ফ্যালকন সিরিজের রকেট প্রযুক্তি'র জন্য তাঁর রয়েছে আকাশচুম্বী খ্যাতি। Space-X, Tesla, Solarcity ইত্যাদি প্রকল্পের সফলতার পর এবার ইলন মাস্ক এমন একটি উচ্চাভিলাষী প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন যার নাম নিউরালিংক।এই নিউরালিংক প্রযুক্তির মাধ্যমেই উপরে আলোচিত প্রতিটি কাজ করা সম্ভব হবে।

ইলন মাস্ক ২০১৬ সালে Neuralink Corporation নামে নিউরো-টেকনোলজি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন যার কার্যালয় সিলিকন ভ্যালি হিসাবে পরিচিত যা অবস্থিত আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কোতে। এই কোম্পানি মানুষের মস্তিষ্কের সাথে কম্পিউটারের সংযোগ স্থাপনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে। এর মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্কে বাইরে থেকে বিভিন্ন ডাটা আপলোড এবং মস্তিষ্ক থেকে বিভিন্ন ডাটা কম্পিউটারে ডাউনলোড করা সম্ভব!

নিউরালিংক প্রযুক্তির মাধ্যমে আপনি আপনার হাতের কিংবা অন্য কোনো অঙ্গের ব্যবহার ছাড়াই শুধু মস্তিষ্কের সাহায্যে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, পারবেন টিভি চালাতে, ইমেইল চেক করতে, টাইপ করতে পারবেন, পারবেন একে অন্যের সাথে মনে মনে যোগাযোগ করতে।

নিউরালিংক কী?
নিউরালিংক হল এমন এক টেকনোলজি যা চোখের ল্যাসিক সার্জারির মত খুব সামান্য একটা সার্জারির মাধ্যমে আপনার মাথার করোটিকাতে কয়েকটা চিপ যার নাম N1 বসিয়ে দেওয়া হবে। চিপগুলোর ভেতরে থাকবে কয়েক হাজার ইলেক্ট্রোড চ্যানেল।একেকটি চিপের ব্যাস ৮ মিলিমিটার এবং উচ্চতা ৪ মিলিমিটার।চিপগুলোর সাথে থাকবে ৪-৬ মাইক্রন প্রস্থের কিছু সুতার মত থ্রেড যা আপনার মস্তিষ্কের কর্টেক্সে নিউরনের সাথে কানেক্টেড হবে।একেকটি চিপ ১০০০ ব্রেইন সেল বা নিউরনকে কানেক্ট করে সিগন্যাল গ্রহণ করবে।আর থাকবে কানের পেছনে একটি ইয়ার-ফোনের মত ব্যাটারি যুক্ত ওয়্যারলেস ডিভাইস যা চিপগুলোর সাথে ব্লুটুথ টেকনোলজিতে কানেক্টেড থাকবে এবং আইফোন এ্যাপ কিংবা কম্পিউটার দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে। একজন মানুষের করোটিকায় সর্বোচ্চ দশটি চিপ ইমপ্ল্যান্ট করা যাবে।যত বেশি চিপ ইমপ্ল্যান্ট করা থাকবে তত বেশি নিউরনের ইলেকট্রিক সিগন্যাল ধরা যাবে। এই সিগন্যাল গুলো কানের উপরে লাগানো ডিভাইসে এসে ডিকোড হবে।
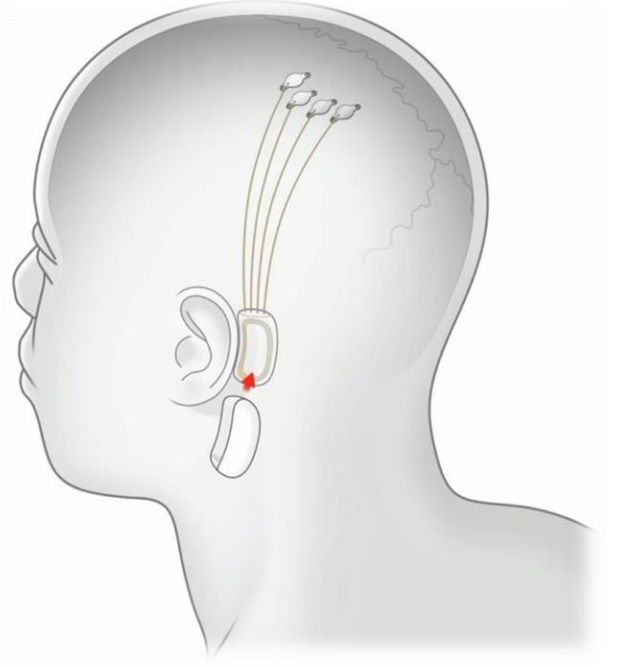
কোথায় ব্যবহার হবে?
বলা যায় যে নিউরালিংক অটিজম এবং প্যারালাইজড মানুষদের জন্য আশীর্বাদ। নিউরালিংক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিউরোলজি শাখায় একরকম বিপ্লব নিয়ে আসবে বলা যায়। এর মাধ্যমে একজন প্যারালাইজড মানুষ শুধু তার ব্রেইনকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কাজ যেমন টিভি কন্ট্রোল, ম্যাসেজিং, মেইলিং, খাবার খাওয়া, লেখালেখি ইত্যাদি কাজ করতে পারবে। নিউরালিংক অটিজম এবং স্কিৎজোফ্রেনিয়ার মত সমস্যা গুলোর সমাধান করবে।এছাড়াও এর মাধ্যমে স্পাইনাল ডিসঅর্ডার, পার্কিন্সন, এপিলেপসি বা মৃগী রোগের চিকিৎসায় বিপ্লব আসবে।

পেছনের ইতিহাস:
নিউরালিংক ২০২০ সালের প্রযুক্তি হলেও এই ব্রেইন-কম্পিউটার ইন্টারফেস প্রযুক্তির ইতিহাস কিন্তু আরও ১৮ বছরের পুরনো। মানুষের মস্তিষ্কে মাইক্রো-ইলেক্ট্রিক এ্যারে ইমপ্ল্যান্টেশনের ধারণা প্রথম ২০০২ সালে নিয়ে আসেন Kevin Warwick, Mark Gasson এবং Peter Kyberd নামের তিন বিজ্ঞানী। ২০০৪-২০০৬ সালে Brown University এর কয়েকজন গবেষক C3 tetraplegia নামক একধরনের প্যারালাইসিসে আক্রান্ত চারজন রোগী কে নিয়ে Massachusetts General Hospital এ গবেষণা করেন।এবং এই গবেষণার রেজাল্ট তাঁরা বিখ্যাত Nature জার্নালে প্রকাশ করেন।তাঁরা এই প্রযুক্তির নাম দিয়েছিলেন BrainGate.

{২০০৬ সালে তারা প্রথম ট্রায়ালে এই BrainGate প্রযুক্তি- Matthew Nagle নামে একজন C3 tetraplegia রোগীর মস্তিষ্কে -ওপেন ব্রেইন সার্জারির মাধ্যমে স্থাপন করেন।} ম্যাথিউ নাগেল তার গলায় ছুরির আঘাতজনিত কারণে প্যারালাইজড ছিলেন।BrainGate প্রযুক্তির সফল

ইমপ্ল্যান্টেশনের পর তিনি শুধুমাত্র তার ব্রেইন দিয়ে কম্পিউটার কার্সর কন্ট্রোল, ইমেইল ওপেন এবং টিভি অপারেট করতে সমর্থ হন।তারা দ্বিতীয় ট্রায়াল করেন ২০০৯ সালে এবং তৃতীয়টি ২০১২ সালে। তৃতীয় ট্রায়ালে ১৫ বছর ধরে C3 tetraplegia প্যারালাইজড থাকার Cathy Hutchison শুধুমাত্র তার ব্রেইন দিয়ে রোবোটিক হাত কন্ট্রোল করে বোতল থেকে কফি খেতে সমর্থ হন।

BrainGate প্রযুক্তিতে দৃঢ় থ্রেড এর সিরিজে ১২৮ টি ইলেক্ট্রোড চ্যানেল ছিল। কিন্তু করোটিকাতে মস্তিষ্ক কিঞ্চিত নাড়াচাড়া করতে পারলেও রিজিড থ্রেড গুলো পারত না। ফলে BrainGate এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে ব্রেইনের টিস্যুর ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো।
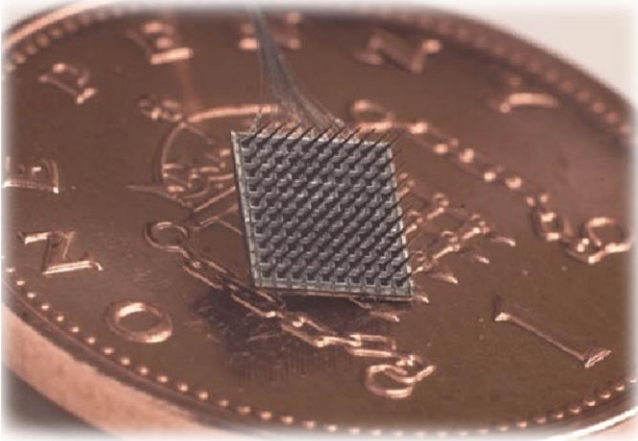
নিউরালিংক কীভাবে কাজ করে?

নিউরালিংকের চিপের নাম হলো N1 Sensor যা ওয়্যারলেসেই ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে।নিউরালিংকের একটি চিপে ৯২ টি পলিমার থ্রেডের সজ্জা বিন্যাসে ৩০৭২ টি ইলেক্ট্রোড চ্যানেল থাকে। এই ইলেক্ট্রোড চ্যানেল গুলো নিউরন থেকে ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল সিগন্যালগুলো গ্রহণ করে। এই সিগন্যালগুলো N1 sensor রিসিভ করে ডিকোড করে মিনি কম্পিউটারে পাঠায় যা কানের উপর অবস্থিত। প্রধান সমস্যা হওয়ার কথা ছিল থ্রেড গুলো নিউরনে ইমপ্ল্যান্ট করার সময়।কিন্তু নিউরালিংকের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি নিউরোসার্জিক্যাল রোবট যার ২৪ মাইক্রন সূচের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে ৬ টি থ্রেড (১৯২ ইলেক্ট্রোড চ্যানেল) অতি সূক্ষ্মভাবে রক্তনালিকাগুলো এড়িয়ে ইমপ্ল্যান্ট করে দেয়। আর পলিমারের তৈরি থ্রেড গুলো খুবই ফ্লেক্সিবল যা মস্তিষ্কের করোটিকায় সামান্য মুভমেন্টের সাথেও মানিয়ে নেয়, ফলে মস্তিষ্কের টিস্যুর কোন ক্ষতি হয় না।

নিউরালিংকের ট্রায়াল:

নিউরালিংক এ পর্যন্ত বানর এবং ইঁদুরের উপর ট্রায়াল করে আকর্ষণীয় ফল পেয়েছে।তবে ইঁদুর এবং বানরের উপর পরীক্ষায় ওয়্যারলেস প্রযুক্তির পরিবর্তে USB-C কানেকশনে মিনি কম্পিউটারের সাথে থ্রেড গুলো যুক্ত করা ছিল।তবে নিউরালিংক এখনো মানুষের উপর ট্রায়ালের ছাড়পত্র পায়নি কিন্তু ২০২০ সাল শেষ হওয়ার আগেই তাদের মানুষের উপর ট্রায়াল করার সম্ভাবনা রয়েছে।ইলন মাস্ক এক সাক্ষাৎকারে বলেন, A monkey has been able to control a computer with its brain.

শেষ কথা

নিউরালিংক নিউরোলজিতে বিপ্লব নিয়ে আসবে একথা বলাই যায়। এর সাথে রোবট বিপ্লবের সাথে সাথে মানুষের গতি-ও বাড়িয়ে দেবে নিউরালিংক। হয়তো সুদূর ভবিষ্যতে কল্প-বিজ্ঞানের অতিমানব আমাদের কাছে খুব-ই সাধারণ একটি বিষয় হয়ে যাবে। আর এই কল্প-বিজ্ঞানের অতিমানব বাস্তবে তৈরির কারিগর হবে নিউরালিংক।কিন্তু নৈতিকতার দিক থেকে কিছু কথা থেকেই যায়।

আরাম চশমা

নাঈম হোসেন ফারুকী

১।

শমসের সাহেব বিরক্ত হচ্ছেন। তাঁর মুখে হালকা গোলাপি ভাব ফুটে উঠেছে।

তিন দিন হলো রিডিং গ্লাসটা বানাতে দিয়েছেন। এখনো আসে নি। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। এদিকে চ্যাংড়া দোকানদার তাঁকে বদখত দেখতে একটা কালো চশমা গছাতে চেষ্টা করছে।

— বললাম তো আমি সানগ্লাস পরি না। বয়স পঞ্চাশ পার হতে চলেছে। আমাকে দেখে কি শাকিব খান মনে হয় তোমার?

— কি যে বলেন স্যার! আপনি শাকিব খানের বাপ। তাছাড়া স্যার এই চশমাটা শুধু রোদ থেকে বাঁচায় না। আরও অনেক কিছু করে। পৃথিবীর অনেক দেশের বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করে এই জিনিস আবিষ্কার করেছে, সরকারও অনেক টাকা ভর্তুকি দিয়েছে। পরে দেখেন স্যার, আরাম পাবেন।

শমসের সাহেব কনফিউসড হয়ে গেলেন। শাকিব খানের বাপ বলতে কি বুঝিয়েছে কে জানে! তাঁর চেহারা শাকিব খানের চেয়েও ভালো, নাকি শাকিব খানকে তাঁর ছেলের বয়সী মনে হয়?

যাই হোক, পরে দেখলেই তো পয়সা দিতে হবে না। শমসের সাহেব চশমাটা পরে দেখলেন।

আসলেই একটা আরাম আরাম ভাব। মাথা ব্যথাটা একটু মনে হয় কমে আসলো। দূরের লেখাগুলোও মনে হয় আরেকটু ক্লিয়ার হয়ে গেল।

— দাম কত?

— আপনার জন্য মাত্র তিনশো টাকা স্যার!

শমসের সাহেব কি মনে করে কিনেই ফেললেন। সস্তা, কাজের জিনিস। এমনিতেও বাইরে রোদ উঠেছে অনেক।

নিজেকে তাঁর শাকিব খান না হোক মুসা বিন শমসের মনে হতে লাগল!

২.

খিচুড়িটা কি তুই বানিয়েছিলি মা? টেস্ট কিন্তু সেই ছিল।
কোন খিচুড়ি বাবা?
ঐ যে টেবিলের উপর ছিল।
টেবিলের উপর খিচুড়ি? ওয়েট .... কালকে রাতে বানিয়েছিলাম। ফ্রিজে ঢুকাতে ভুলে গেছি। বাইরে ৩৮ ডিগ্রি চলছে। এই জিনিস ভালো থাকার কোনো কারণ নাই।
কি বলিস মা? সেই একটা খিচুড়ি। মনে হলো বেহেস্তি খানা খাচ্ছি। রাবেয়া কোনোদিন এত ভালো খিচুড়ি করতে পারেনি।
রাবেয়া মুখ ঝামটা দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলো।
মেয়ের প্রশংসার একটা লিমিট রাখা উচিত বুঝেছ? খিচুড়ি দিয়ে ভকভক করে গন্ধ বের হচ্ছে। এইমাত্র সবটুকু ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। এমন না যে কালকে রান্না করার পরপরও খিচুড়ি ভালো ছিল, তোমার মেয়ের জামাইয়ের কপালে দুঃখ আছে।
আর সারাদিন কালো চশমা পরে ঘুরার কি মানে হয়? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি? নিজেকে শাকিব খান মনে হয়?
শমসের সাহেব একটু যেন লজ্জা পেলেন। আসলেই আজকাল চশমাটা বেশি ব্যবহার হচ্ছে। বাসায়ও সারাদিন কালো চশমা পরে থাকতে মন চায়।
তিনি চোখ থেকে চশমাটা খুললেন। সাথে সাথে তাঁর পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল।
তিনি বাথরুমে ছুটলেন।

৩.

– কি হলো? এত হাসছ কেন?
– না, মানে পত্রিকাগুলোতে কত মজার মজার খবর দেয়। পড়ে হাসি থামাতে পারছি না। তুমিও দেখ একটু।
– রাখো তোমার পেপার। মেয়েটার খোঁজ খবর রাখো কিছু? আর, তুমি শিওর ডাক্তার তোমাকে কালো চশমা পরে ঘুরতে বলেছে? অন্য কোনো ডাক্তার দেখাবা?
– আরে বললাম তো, এই ডাক্তার আমার অনেকদিনের পরিচিত, কোনোদিন ভুল চিকিৎসা করে নি। এখন যাও তো, বিরক্ত করো না।
– রুমকির ব্যাপারটা জানার প্রয়োজনও বোধ করলা না?
– কি হয়েছে ওর?
– প্রতিদিন কলেজে যাওয়ার সময় পাড়ার ২টা ছেলে বিরক্ত করে। ওইদিন নাকি গোলাপ ফুল দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ।
– ও আচ্ছা। ব্যাপার না।

রাবেয়া অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালেন। রাগে গা কাঁপছে তাঁর।
শমসের সাহেব ভ্রূক্ষেপ না করে পেপারে মন দিলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল কোমল একটা হাসি।

৪.

শমসের সাহেব ধীরে সুস্থে নাস্তা করে বাসা থেকে বের হলেন। অফিস আছে, সময়মত গেলেও হয়, না গেলেও হয়। সরকারি চাকরিতে আরাম আর আরাম।
রাহেলা এখনো কেমন জানি ঘোরের মধ্যে আছেন। পঁচিশ বছর ঘর করার পর হঠাৎ করে মনে হচ্ছে এই মানুষটাকে তিনি চিনেন না।
সোফার উপর অগোছালোভাবে পরে আছে পেপারটা। প্রথম পাতায় তিনটা খুনের খবর, একটা ধর্ষণ।
রাবেয়ার গা শিউরে উঠল পড়ে।

৫.

শমসের সাহেব আগে আগে অফিস থেকে বের হয়েছেন। আরাম চশমার দাম নাকি আরও কমেছে। উপর মহল থেকে বিশাল একটা ফান্ড এসেছে এই চশমার জন্য, শমসের সাহেব বাসার সবার জন্য একটা করে নিলেন।
রাস্তায় সার্কাস টাইপের কিছু একটা হচ্ছে। লোকজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। শমসের সাহেব এগিয়ে গেলেন।
দূর থেকে ভালো মতো দেখা যায় না। মনে হচ্ছে মেয়ে ঘটিত ব্যাপার। দূরে একটা মেয়ের উপর দুইটা ছেলে ঝাঁপিয়ে পরেছে। মেয়েটা আহত পশুর মতো চিৎকার করছে।
আশেপাশে অনেক মানুষ। অনেকের চোখেই কালো চশমা। তারা দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।
শমসের সাহেবও দাঁড়িয়ে গেলেন। বেশ ভালো লাগলো তাঁর। অসাধারণ দৃশ্য।

৬.

শমসের সাহেব বাসায় আসলেন রাত দশটা নাগাদ।
রুমকি বাসায় ফিরে নি। রাবেয়া কাঁদতে কাঁদতে ফিট হয়ে গিয়েছিল। শমসের সাহেব বাসায় যেয়েই তাঁর চোখে কালো চশমা পরিয়ে দিয়েছেন।
এখন সব শান্ত। দুজনে মিলে রগরগে একটা তামিল মুভি দেখছেন।
লাইফ ইজ বিউটিফুল!

অসীম পানে

অয়ন রহমান খান

মহাকাশের অসীম পানে তাকিয়ে আমি ভাবি,
হয়তো একদিন হাতের মুঠোয় আসবে আমার সবই।
ত্রিমাত্রিক হয়ে বহুমাত্রাকে করব আমি জয়,
কৃষ্ণবিবরে ঝাপিয়ে পরবো, থাকবে না মৃত্যুভয়।
পাতাল ফুড়ে, আকাশ ছিড়ে দেখবো মঙ্গলের পথ,
হারবো না কভু থাকব লেগে করি এই শপথ।

ভিনগ্রহীদের নৈশ্যভোজে গাইব আমি গান,
মৃত্যুকে জয় করে আনবো নতুন প্রাণ।
ছায়াপথের শেষ সীমানায় পদচিহ্ন রাখবো মোর,
সুদূর নীহারিকার পানে থাকব চেয়ে, আসবে নতুন ভোর।
আলোর বেগে ছুটবো আমি, সময় হবে শান্ত,
ভবিষ্যত ঘুরে আসব আমি, হবো নাকো ক্লান্ত।

পরম শুন্য তাপমাত্রায় উষ্ণ কাপড় পরে,
আপেক্ষিকতার সূত্রগুলো লিখবো পাতা ভরে।
মিথ্যের মুখোশ ছিড়ব আমি, সত্যকে দিবো স্থান,
বহুবিশ্ব হতে আসা বার্তায় রাখবো পেতে কান।
চারটি মৌলিক বলকে তবে করবো আমি এক,
ভ্রান্ত বিশ্বাস চিরতরের জন্য করবো আমি ত্যাগ।

সুপারনোভা দেখবো আমি শনির চাঁদে বসে,
ভাববো আমি, কী হবে মহাবিশ্বের সবকিছুরই শেষে?
পজিট্রনকে আনবো এবার সরিয়ে ইলেকট্রন,
পরমাণুর দেয়াল ভাঙবো আমি, ক্ষান্ত হবে মন।
থাকবো আমি ধরণীর বুকে সৃষ্টির সেরা বেশে,
ইচ্ছে হলেই চলে যাবো দূর আকাশের দেশে।

ভাঙবো আমি গতির সীমা মহাকাশের বুকে,
দেখবো আমি নতুন কিছু সীমার বাইরের দিকে।
মহাবিশ্বের কেন্দ্র খুজে ফিরবো তবে বাড়ি,
রহস্যে ভরা ডার্ক ম্যাটারের টানবো এবার দাড়ি।
নিয়ম রীতি চূর্ণ করে আনব নতুনের রেশ,
হারিয়ে যাবো এই নীল গ্রহ হতে, হব না তবুও শেষ।

শেষে শুরু!

এ এস পুলক

ঘুম ভাঙার পর বিক্রম খুব অবাক হলো। ও একটা বাক্সের ভেতর শুয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে ঢাকনা দিয়ে আটকানো ছিল কারণ ঢাকনাটা এখন খোলা। ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ওর গায়ের কাপড়টাও তো আগের মতন নয়। চাপা একধরণের কালো কাপড় দেখা যাচ্ছে। ও ওঠার চেষ্টা করবে এমন সময় একটা মুখ ওর মুখের ওপর ঝুঁকে এলো। গোল-গোল বড় দুটো চোখ, তবে ভ্রু নেই। চোখে পাপড়ি নেই, চোখ বুঁজলে মনে হয় সাটার নেমেছে আর উঠলে মনে হয় সাটার খুলেছে। তীক্ষ্ণ সরু নাক, পাতলা মতন দুটো ঠোঁট। কান দুটো কী ছোট, একেবারে চেপে আছে কিন্তু কোনোরকম ছিদ্র নেই। মাথায় চুল নেই, গায়ের রঙ ধবধবে সাদা। শরীরে কোনো পশম নেই। বিক্রমের খুবই অবাক লাগছে। এ সে কোথায় এসে পড়েছে! দিব্যি তো রাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে ঘুমুতে গেল। হঠাৎ ওই মানুষের মতন দেখতে জিনিসটার চোখে লাল বাতি জ্বলে উঠল। তীব্র হচ্ছে আলো। বিক্রম ভয় পেয়ে গেছে। ধড়মড় করে ওঠে দূরে সরে গেল ও। ওঠে গিয়ে আরো অবাক হলো। চারদিকে নানান ধরণের যন্ত্রপাতি। কী অদ্ভুত দেখতে সব !

"ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না।"

বিক্রম ঘামছে। এসব কী হচ্ছে ওর সাথে?

"তু..তুম..তুমি কে?"

"তোমাকে সব বলব। তোমাকে না বললে হবে না। আগে তুমি শান্ত হও ।"

বিক্রম শান্ত হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাও শান্ত হতে পারছে না। ও কি কোনোরকম স্বপ্ন দেখছে? ঘুমুতেই তো গিয়েছিল।

"তোমার দুহাত পিছনে চেয়ার আছে। সেটায় বসো।"

বিক্রম বসল। বসা মাত্র ওর কিছুটা সামনে নিচে থেকে বিভিন্নভাবে ভাঁজ খুলতে খুলতে একটা গ্লাস আর পানির জগ উঠে এলো।

"নাও, পানি খাও। জানি তোমার অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু তুমি যাতে স্বাভাবিক থাকতে পারো তার সব চেষ্টাই করা হবে। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না, ভয় পেয়ো না।"

বিক্রম ঢকঢক করে দুই গ্লাস পানি খেলো। উত্তেজনায় কিছুটা পানি ছড়িয়েছে অবশ্যি। মানুষের মতন দেখতে বেরিয়ে গেল। বিক্রম ভাবছে একটা খাতা আর কলম থাকলে ভালো হতো। সবকিছু লিখে রাখা যেত। এখান

থেকে বেরিয়ে পাই টু পাই সবাইকে সবকিছু শোনাতো। আবার এসেছে। এবার ও একটা চেয়ারে বসল বিক্রমের মুখোমুখি। স্থির দুটো চোখ। একবারও নড়ছে না। মানুষ হলে চোখ অনেক কিছু বলে দিত। কিন্তু এ তো মানুষ নয়।

"আর ভয় লাগছে?"

বিক্রমের ভয়টা এখন অনেকটাই কেটে গেছে। ও বুঝতে পারছে ওর কথা বলাটা প্রয়োজন।

"না কেটেছে।".

"তোমাকে এখন একটা গল্প শোনাব। সত্যিকারের গল্প। কিন্তু তোমাকে ধৈর্য্য সহকারে সবকিছু শুনতে হবে।"

"আমি শুনবো তার আগে বলো আমি কোথায় আছি? কেন আছি?।"
"গল্পের মধ্যেই সব জানতে পারবে।"
" বলো , আমি শুনছি।"
"তোমার মস্তিষ্ক আমরা বিশ্লেষণ করেছি। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলে। তোমাকে আগে কিছু প্রশ্ন করবো।আশা করি সঠিক উত্তর দিতে পারবে।"
" করো , আমি উত্তর দেবো ।"
"ধরো, তোমার একটা বিশাল এলাকা আছে। সেই এলাকায় তুমিই একমাত্র উন্নত, বুদ্ধিমান প্রাণী। বাকি সব অনুন্নত,এদের বুদ্ধি কম। এখন জায়গাটায় কিছু সমস্যা হয়েছে। এতে তোমার খুব সমস্যা। এখন অনুন্নত সব প্রাণিকে মেরে ফেলতে হবে। তুমি তখন কী করবে?"
"যদি কোনোরকম ক্ষতি না হয় তাহলে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ক্রিটিকাল কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে করবো না।"
"ধরো, কোনো ক্ষতি হবে না।"
"মেরে ফেলব।"
"ঠিক বলেছ।"
বিক্রম বুঝতে পারছে না এই প্রশ্ন কেন করা হলো। এখানে সবকিছু যেমন অদ্ভুত , এদের কথাবার্তাও কেমন অদ্ভুত ।
"আমি পৃথিবী নামক গ্রহের কেউ না সেটা বুঝতে পেরেছ তো?"
"তার জন্যই তো প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"
"না,ভয় পেয়ো না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো মহাবিশ্বে হোমো স্যাপিয়েন্সরা একা নয়?"
"হ্যাঁ,বুঝতে পারছি।"
"আমাকে আর এতসব অদ্ভুত যন্ত্রপাতি দেখে তোমার কি ধারণা হচ্ছে?"
"তোমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান।"
"আমরা তোমার ধারণার চেয়েও বেশি বুদ্ধিমান। কেন বলছি জানো? তোমার গ্রহে শিম্পাঞ্জি আছে, তাই না?"
এই প্রশ্ন শুনে বিক্রম বুঝতে পারলো এ আসলে পৃথিবীতে নেই, অন্য কোথাও। একটা শীতল স্রোত ওর শিরদাঁড়া দিয়ে বেয়ে গেল। ও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল ।
"তার মানে আমি পৃথিবীতে নেই?"
"না, তুমি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে। তবে এখন উত্তেজিত হয়ো না। আগে সম্পূর্ণ কথা শোনো । তোমাদের গ্রহে শিম্পাঞ্জি আছে তো?"
বিক্রম আমতা আমতা করে উত্তর দিলো ,
"হ্যাঁ, আছে।"
"তাদের সাথে তোমাদের ডিএনএ-র পার্থক্য কত শতাংশ বলতে পারো?"
"২ শতাংশ।"
"ঠিক বলেছ। আর আমাদের সাথে তোমাদের ডিএনএ-র পার্থক্য ১০ শতাংশ।তাই তোমাদের সাথে আমাদের এত পার্থক্য আর তোমাদের থেকে আমাদের বুদ্ধি এত বেশি।"
" কী বলছ তুমি!"
বিক্রম খুবই অবাক হয়েছে। মানুষ ছাড়াও মহাবিশ্বে এতো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে!
অদ্ভুত ওই একটু নড়েচড়ে বসল। নড়াচড়ার মধ্যে কেমন জানি একটা জড়তা দেখা যায়।
"এই মহাবিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী আমরা, হোমো স্যাপিয়েন্সরা না। তোমরা আমাদের থেকে একধাপ নিচে আর এই মহাবিশ্বে পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও হোমো স্যাপিয়েন্স নেই। কিন্তু আমরা পুরো মহাবিশ্বে অনেক এলাকা জুড়ে আছি।বাকি এলাকা আমাদের নজরদারিতে থাকে।"
"এত হোমো স্যাপিয়েন্স থাকতে আমি কেন?"
"বলছি, বলছি। আগে বলো এটা কি বুঝতে পারছো তোমরা কতটা নিচু স্তরের? শিম্পাঞ্জিদের সাথে তোমাদের ২ শতাংশ ডিএনএ-র পার্থক্য। তাতেই তোমরা তাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর । চিড়িয়াখানায় আটকে রেখে মজা দেখ । আর আমাদের সাথে তোমাদের ডিএনএ-র পার্থক্য ১০ শতাংশ। আশা করছি তুমি তোমাদের অবস্থানটা বুঝে গেছ।"
"হ্যাঁ, বুঝে গেছি।"
"খুব ভালো। শুরুতে একটা প্রশ্ন করেছিলাম মনে আছে? মেরে ফেলা সম্পর্কিত প্রশ্ন?"
"হ্যাঁ।"
"এবার মূল কথায় আসি। তোমাদের গ্রহে তথা মহাবিশ্বে এখন আর কোনো হোমো স্যাপিয়েন্স নেই, একমাত্র তুমি এবং আরেকজন ছাড়া। তোমাদের সোলার সিস্টেমই আর নেই। অন্যজনের সাথে তোমার পরে দেখা হবে।"
" কী বলছ এসব!"
" তোমরা সামান্য উন্নত প্রাণী তাই এতদিন তোমাদের দিকে কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি। কিন্তু তুমি যেমন ক্ষতি না হলে মেরে ফেলতে তেমনি আমরাও মেরে ফেলেছি। কারণ তোমরা মহাবিশ্বে না থাকলে আমাদের কিচ্ছু আসে যায় না। এমনকি তোমার সাথে কথা বলার জন্য তোমার মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে ভাষাটা নিজের মস্তিষ্কে ট্রান্সফার করেছি। এতে আমার সামান্য ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে।"
এতবড় ধাক্কা খেতে হবে বিক্রম আশাও করেনি। ওরা বুদ্ধিমান হতে পারে। তাই বলে হোমো স্যাপিয়েন্সদের এইভাবে শেষ করে দেবে?

"এইভাবে হোমো স্যাপিয়েন্সদের শেষ করে দিতে তোমাদের একবারও কষ্ট হলো না?"
"তোমরা হোমো স্যাপিয়েন্সদের বুদ্ধি যেমন কম, তোমরা জানোও ততটা কম। তাই কীভাবে কী করা হয়েছে সেটা জেনে কোনো লাভ হবে না। এতটুকু জেনে রাখো যে দুজন ছাড়া আর কোনো হোমো স্যাপিয়েন্স বেঁচে নেই।"

বিক্রম যেমন বিস্মিত তেমনই রেগে গেছে ভেতর ভেতর। ওর বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই! এত কাছের মানুষগুলো কেউ বেঁচে নেই? ও বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু যা সত্য তা বিশ্বাস করতে হবে। এখন রাগলে চলবে না। ঘটনা কী হচ্ছে বুঝতে হবে।
"কোটি কোটি হোমো স্যাপিয়েন্সদের মধ্যে তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে তার কারণ আমাদের গণিতবিদরা। তারা অল্প সম্ভাবনার উপর দাঁড়িয়ে এক প্রকার হিসেব করেছেন। তাতেই অল্প সম্ভাবনা নিয়ে তোমাদের দুজন বুদ্ধিমান, বিজ্ঞান সম্পর্কে কিছু ধারণা রাখে এমন হোমো স্যাপিয়েন্স আমরা পেয়ে গেছি।"
"আমাদের কেন বাঁচিয়ে রেখেছ?"
"শুরুতে উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা কিন্তু এখন উদ্দেশ্যটা অন্য। মহাবিশ্বের দ্বিতীয় বুদ্ধিমান প্রাণী যেহেতু তোমরা তাই আমাদের বিজ্ঞানীরা তোমাদের উপর গবেষণা করতে চেয়েছিলেন। তাই দুজনকে বাঁচিয়ে রাখা। তবে এখন কারণটা অবশ্যই ভিন্ন।"
" কী কারণ?"
"বলছি, তার আগে বলে রাখি যে তুমি ১১০ বছর পর ঘুম থেকে উঠেছ।"
কী বলছে কী এসব! বিক্রম কী বলবে কিছুই বুঝতে পারছে না।
"তোমাকে হাইবারনেশনে রাখা হয়েছিল। তবে প্রথমে কিছু ভুলের কারণে ঘুম থেকে জাগার দায়িত্ব তোমার উপর ছেড়ে দিতে হয়েছে।তোমারই কিছু ক্ষতি হয়ে যায়। ম্যানুয়ালি জাগাতে গেলে মারাও যেতে পারতে। যার ফলে কেউ আর রিস্ক নিতে চায় নি। অনেক বিজ্ঞানী দাবি করেছিলেন তারা পারবেন কিন্তু তুমি ঘুমের মধ্যে থাকলে গবেষণায় সুবিধা হবে ভেবে কেউ আর মত দিলো না। ফলে তুমি এতো দেরিতে উঠলে।"
"এত বুদ্ধিমান হয়েও আমার উপর ১১০ বছর গবেষণা করতে হয়েছে?"
"গবেষণা অনেক বছর হয়েছে। তার কারণ আমাদের বিজ্ঞানীরা। তারা কিন্তু তোমার উপর গবেষণা করে অনেক কিছু করে ফেলেছেন। তাই লোভে পড়ে আরো গবেষণা করেছে।"
"আর অন্যজন কোথায়?"
"তাকে এমনভাবে হাইবারনেশনে রাখা হয়েছিল যাতে তোমার ঘুম ভাঙার পর তারটাও ভেঙে যায়। তার সাথেও এখন আমার মতন একজন কথা বলছে।"
"সে ছেলে না মেয়ে?"
"বলব। তার আগে পরবর্তী কারণটা শুনে নাও।"
" বলো ।"
"তোমাদের মধ্যে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ হতো আমাদেরও তেমনই হয়। আর সেখানে আমাদের বুদ্ধিই আমাদের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আমাদের প্রযুক্তি কেমন হবে ধারণা নিশ্চয়ই করতে পারছো?"
"পারছি।"
"আমাদের প্রযুক্তিই আমাদের ধ্বংস করে দেবার জন্য যথেষ্ট। কেউ শান্তি স্থাপন করতে চাইছে না। দুই পক্ষই চায় যুদ্ধ করতে। আমাদের মতন বুদ্ধিমান এমন বোকার মতন কাজ করছে ভাবতেও অস্বস্তি হয়। গুটিকয়েক ব্যক্তি শান্তি চান। কিন্তু বাকিদের তাদের প্রযুক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে তাদের প্রযুক্তি তাদের জিতিয়ে দেবে।"
"তোমার কী ধারণা?"
"আমি সহ বেশ কিছু ব্যক্তিই মনে করেন যে এই যুদ্ধই হতে পারে মহাবিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণিদের শেষ কার্যকলাপ। বিশেষ করে বিজ্ঞানীরা খুব চিন্তিত। কেউ কেউ সরাসরি বিরোধিতা করায় তাদের বন্দি করা হয়েছে। তাই বাকিরা কিছু বলছে না।"
"কিন্তু যুদ্ধের কারণ কী ?"
"আমাদের বুদ্ধি!"
" কী বলছ এসব!"
"ঠিকই বলছি। আমরা অনেকেই মাঝেমধ্যে আফসোস করি যে হোমো স্যাপিয়েন্সদের মেরে ফেলা উচিত হয়নি। ওরা আমাদের মতন বুদ্ধিমান না হলেও শান্তিপ্রিয় ছিল। যুদ্ধ করেও শান্তি স্থাপন করতে জানত। কিন্তু আমরা যুদ্ধের পরেও শান্তি স্থাপন করতে পারছি না। সেদিক থেকে আমরাই বোকা! কী বল ? "
প্রাণীটা হাসার মতন ভঙ্গি করল। বোধহয় ওদের বোকামির কথা ভেবেই হাসছে।
"এবার তোমার প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তর দেওয়া যাক। আরেকজন হোমো স্যাপিয়েন্স যে বেঁচে আছে সে মেয়ে অর্থাৎ তোমার বিপরীত লিঙ্গের।"
বিক্রম এবার ঘটনা কিছুটা বুঝতে পারছে।
"আমাদের ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে আমাদের অস্তিত্ব আর থাকবে না। আমাদের সাথে থাকলে তোমরাও মারা যাবে। তাহলে মহাবিশ্ব প্রাণশূন্য হয়ে যাবে । কিন্তু আমরা তা চাই না।

বুদ্ধিমান প্রাণ মহাবিশ্বে থাকা প্রয়োজন। তাই তোমাকে এবং আরেকজন হোমো স্যাপিয়েন্স যে কিনা মেয়ে, তোমাদেরকে একটা নিরাপদ বাসযোগ্য গ্রহে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমরা চাই, হোমো স্যাপিয়েন্সরা আবার যাত্রা শুরু করুক। তবে সেখানে তোমরা আছো নাকি নেই সেটা কেউ বুঝতে পারবে না। সে জায়গা আমরা কয়েকজন বিজ্ঞানী অনেক আগেই আবিষ্কার করেছি এবং সে জায়গাটাকে সুরক্ষিত করেছি। সেখানে যাবার ক্ষমতা কারোর নেই। তবে কাউকে জানানো হয়নি একটা বিশেষ কারণে। এখন সে কারণটাও বদলে গেল।"

"কিন্তু তোমরা যদি ধ্বংস না হও ?"

"তুমি মোটামুটি নিশ্চিত থাকতে পারো যে এমন কিছু হবেই। তাও আমরা চেষ্টা করব কিছু করতে। আর যদি বেঁচে থাকি তাহলে হোমো স্যাপিয়েন্সদের দিকে আর কেউ কু-দৃষ্টি দেবে না। কারণ আমরা কিছু বিজ্ঞানী ছাড়া কেউ কিছু জানবে না।"

"এত বুদ্ধি, জানতেও তো পারে।"

"না, যদি বেঁচে থাকি তবে আমরা বিজ্ঞানীরা তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে দেবো না। আর মরে গেলে তো শেষই।"

ও কথা শেষ করল। চারদিক একেবারে শান্ত। কেউ কোনো কথা বলছে না। বিক্রম কি কোনো দিন ভেবেছিল এমন কিছু হতে পারে? এমন সময় একটা মেয়েকে আরেকটা ঐধরনের প্রাণী রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল। তাকে বিক্রমের পাশে একটা চেয়ারে বসানো হলো। বিক্রমের সে দিকে খেয়াল নেই। ও মহাবিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। মেয়েটার মধ্যেও কোনো উত্তেজনা দেখা যাচ্ছে না। সেও সমান বিস্মিত।

" তোমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।"

"আপনিই করে দিন।" বিক্রম বলল।

"এতক্ষণ তোমার নাম নিইনি। কেন বলব না। চিন্তা করবে। শোনো বিক্রম, এ হচ্ছে নীলিমা। নীলিমা, এ হচ্ছে বিক্রম। এতক্ষণে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেছ তোমাদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব এবং সম্পর্ক কি হবে?"

"হ্যাঁ।" দুজনে একসাথে উত্তর দিলো ।

"ভেরি গুড। তবে তোমাদের কাছে আমার একটা রিকুয়েস্ট আছে।"

"বলো।" আবারও দুজনে একসাথে বলল।

"আমি তোমাদের নতুন করে নাম দিতে চাই। বিক্রম, তোমার নাম হবে এডাম এবং নীলিমা, তোমার নাম হবে ইভ। তোমরা নাম দুটো রাখবে তো?"

"রাখব।" বিক্রম বলল আর নীলিমা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বুঝিয়ে দিলো ।

"ধন্যবাদ। তোমাদের সন্তানদের কিন্তু এসব ঘটনা কিছু বলবে না। স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে। আগে যেমন করতে। আরেকটা অনুরোধ আছে।"

"বলো," বিক্রম বলল।

"তোমাদের সন্তানদের একটা কথা সবসময় বলবে। কথাটা বলেছিলেন তোমাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানী কার্ল স্যাগান । তোমার মস্তিষ্ক থেকে পেয়েছি বিক্রম। কথাটা হচ্ছে-

"If a human disagrees with you, let him live. Becuase in hundred billions of galaxies, you will not find another."

মিনি সাই-ফাই

স্পেসটাইম ফ্যাব্রিকে হওয়া ছিদ্র আজ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্প্রদায়গুলোর কাছে চিন্তার কারণ।পৃথিবীটাকে শেষ করেই মানুষ ক্ষান্ত হয়নি, পরিবেশের মতো এবার মাত্রা নিয়েও খেলতে শুরু করেছে।কে মেটাবে এর মূল্য? বিজ্ঞান মানুষের হাতে থাকা সত্যি বিপজ্জনক।ভয় নেই, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এসে পড়বে ট্রাবিক্স, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত খুনি।

-চন্দ্রায়ান হকিংস

শূন্য দিয়ে ভাগ

নাঈম হোসেন ফারুকী

শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কি হয়? অসীম নাকি অসঙ্গায়িত?

বক্কর ভাই কচুকাটা করছেন। মানে কচুকে কাটছেন আরকি।
কচুর দৈর্ঘ্য ছিল ১ মিটার। বড় মানকচু।
১০ টুকরা করলে প্রতিটার দৈর্ঘ্য হবে $1/10 = 0.1$ মিটার।
১০০ টুকরা করলে হবে 0.01 মিটার।
১০০০ টুকরা করলে হবে 0.001 মিটার।
১০০০০ টুকরা করলে হবে 0.0001 মিটার।

টুকরা সংখ্যা যত অসীমের কাছাকাছি যাবে, প্রতিটা টুকরার দৈর্ঘ্য হবে শূন্যের ততো কাছাকাছি।
একটা জিনিসকে প্রায় অসীম দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল তাই হয় প্রায় শূন্য।
উল্টাভাবেও প্রশ্নটা করা যায়।
প্রতিটা টুকরার সাইজ প্রায় শুন্য হলে টুকরা কয়টা হবে?
প্রায় অসীমটা, তাই না?

গণিতের ভাষায়, যখন x টেন্ডস টু ০ হবে, x দিয়ে ভাগ দিলে ভাগফল টেন্ডস টু ইনফিনিটি হবে। অর্থাৎ শূন্যের কাছাকাছি।
এই হিসাবটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব কাজে লাগে।
কচুর টুকরা যত ছোটই হোক, জোড়া দিতে থাকলে এক সময় আস্ত কচু পাওয়া যাবে।

এই কাহিনীটা এখানে শেষ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু ঝামেলা আছে।
খুবই ছোট কচুর টুকরা জোড়া দিলে আস্ত কচু পাওয়া যাবে।
কিন্তু যদি কোন কচুর টুকরাই না থাকে? কি হবে?

0.000000...1 কে খুব বড় একটা সংখ্যা দিয়ে গুন করে ১ আনা যায়। ১০ আনা যায়। যা খুশি আনা যায়।
কিন্তু, একেবারে শূন্যকে গুন দিয়ে লাভ হবে?
$0 \times 1 = 0$
$0 \times 100 = 0$
$0 \times 100000 = 0$

যদি বলি, কতগুলো 0.001 মিটার দৈর্ঘ্যের কলার টুকরা মিলে 1 মিটার লম্বা কচু হয়?
উত্তর আছে কোন?
কচুর টুকরাই তো নাই।
আছে কলা।
কচুর টুকরা আছে শূন্যটা।

তাই, পুরাপুরি শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে উত্তর অসঙ্গায়িত।
প্রায় শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে উত্তর প্রায় অসীম।

মাত্রাহীনতার অন্ধকার

জয় ধর

১.

কয়েকদিন ধরেই পরিবেশটা কেমন অদ্ভুত লাগছে। যেন কোনো বড় কিছু ভেতরে ভেতরে পরিবর্তন হয়ে গেছে। সবকিছু কেমন অপরিচিত লাগছে। এই যেমন আজকে রাস্তার পাশের চারতলা বিল্ডিংটা। গত একবছর মনে হয় না একমুহূর্তের জন্য কাজ বন্ধ থেকেছে। শব্দের কারণে মনে হয় না একমুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পেরেছি।অথচ আজ কোনো শব্দই নেই।অদ্ভুত ! সামনের রাস্তাটা এত ঠান্ডা কেন? অন্যান্য দিন গাড়ির আওয়াজে থাকা যায় না। অথচ রাস্তা থেকে কোনো আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। সকালেও কোনো আওয়াজ পাইনি।বন্ধ নাকি আজ! না আজ তো সোমবার। ভারি অদ্ভুত ! আসলে অভ্যাসের কারনে এই অস্বস্তি। যাই হোক হাঁটতে বের হই।দুই ঘন্টা পর বাড়ি ফিরব। ৭ টা এখনো বাজেনি অথচ এত অন্ধকার কেন? রাস্তায় তো একটা লোকও দেখছি না। তার উপর একটাও ল্যাম্পপোস্ট জ্বলছে না। এতগুলো একসাথে বিকল হলো কবে! কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার।
হাতের ঘড়িটা মনে হয় বিকল হয়ে গেছে। কাঁটা নড়ছেই না। তারপরও মনে হলো আজ একটু তাড়াতাড়িই ঘরে এসেছি। রাতে বাড়িটা কেমন ছমছম করছে। গেটের লাইট ফিউজ হয়ে গেছে। আজব! লাইট আনতে ভুলে গেলাম! দোকানটাতো ফেরার রাস্তায় পড়ে। ভুলে গেলাম নাকি অন্য রাস্তা দিয়ে এসেছি?
যাইহোক দরজা খুলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকি। মানে কি? সময় ৬ টা ৫০! এত তাড়াতাড়ি! এর আগে তো কখনো এত তাড়াতাড়ি আসিনি।
চেয়ারে বসে ব্যাপারগুলো ভাবি। এত তাড়াতাড়ি এলাম কীভাবে ? দোকানে থামিনি কেন?

২.

গতকালকের ঘটনাগুলো আবার মনের ভেতরে জায়গা দিলো। গতকালকের মতো আজও একই সময়ে বের হই।
বের হওয়ার সময় মনে মনে আওড়াতে থাকি- আজ ফেরার সময় যেন কিছুতেই ভুল না হয়! লাইট আনতেই হবে! আজ যেন গতকাল থেকেও বেশি নীরবতা। না বিল্ডিং না রাস্তা থেকে কোনো আওয়াজ পাচ্ছি না। এত নীরবতা যেন সহ্য হচ্ছে না। আজব! লাইটের দোকানটা কই ! পাশের মুদি দোকানটা আছে কিন্তু লাইটের দোকানটা উধাও।
মানে কি! পরশু দেখেছি অথচ আজ নেই।তাহলে কি গত কালকেও ছিল না? কি হচ্ছে এসব?
দ্রুত ঘরে আসার পথে ২ নম্বর রাস্তার সব বাড়ি যেন উধাও হয়ে গেছে। সেখানে বাড়ির বদলে ছায়া ছায়া পর্দার মতো কিছু একটা। বাড়ি ফিরে দেখি পাশের বিল্ডিংটা যেন লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। চোখে ভুল দেখলাম না তো? এ কীভাবে সম্ভব?
যেন বিল্ডিংটা অনেকগুলো বিল্ডিংকে একসাথে নিজের ভেতর ঢুকাচ্ছে । আশেপাশের সব আস্তে আস্তে গায়ের হয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এসব কি হচ্ছে? আর যেন তাকাতে পারছি না। সামনের রাস্তাটা এখন মাথার উপরে। ত্রিমাত্রিক জগতে এসব কী ঘটছে? আমার ধারনাটা যদি সত্যি হয় তবে কি...!

৩.

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নাকি! উঠে দাঁড়াই।দেখি আশেপাশে কিছুই অবশিষ্ট নেই।সব অন্ধকার। গতমাসে যেন এ সম্পর্কে কিছু পড়েছিলাম-"বিশ্বাস করুন বা নাই করুন মানুষের মনই সবকিছুর অবয়ব নির্ধারণ করে। মনই এদের আকার দেয়।যদি এই মনকে ধ্বংস করা হয় তবে সব বদলে যাবে...আধুনিক বিজ্ঞান এক অপার সম্ভাবনার কথা বলে...বিভিন্ন মাত্রা বিদ্যমান...সব মাত্রা সবার জন্য সমান নয়...যদি একটি পিনকে একটি ছায়ার মধ্যে রাখা হয় তবে ছায়া কি পিনের কথা জানতে পারবে? জানবে না, এখানে পিন ত্রিমাত্রিক আর ছায়া দ্বিমাত্রিক। কিন্তু দুইটাই একই জায়গা দখল করে আছে...ত্রিমাত্রিক সব তথ্য দ্বিমাত্রিক পৃষ্ঠে সংরক্ষিত আছে। হয়ত শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তা সেই তথ্যকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে যখন আমাদের পরিচিত জগৎ আমাদের মাটির তলায় মিশে যাবে, আমাদের চোখের সামনেই সেই শক্তিশালী বুদ্ধিমত্তা ঢুকে পড়ে সব বদলে দিবে..."
তখন সব অবিশ্বাস্য মনে হলেও আজ তা মনে হচ্ছে না।
হঠাৎ দেহ যেন কেমন লাগা শুরু করছে। বুঝলাম এখন আমিও যাব...

ব্রেইনস পেইন

মশিউর রহমান আনন্দ

তানভীরের বাবা মারা গিয়েছেন কয়েকদিন আগে।ওর মা মারা গিয়েছেন গত বছরই। এখন সে তার বড় বোন মিথিলার (বিবাহিত) বাসায় থাকে। পরপর বাবা-মা মারা যাওয়ায় তার সামনের এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে চিন্তিত মিথিলা।অবশ্য তানভীর ঐরকম কোনো কষ্ট পায়নি। বাবা-মা তাকে তেমন আদর করতেন না।মানে আদর করতেন ঠিকই কিন্তু সেগুলো কেমন যেন কৃত্রিম মনে হতো তানভীরের কাছে।বিশেষ করে বাবার ব্যবহারটা।তারা ওকে জিজ্ঞাসা করতেন ও ভালো আছে কিনা, কিছু লাগবে কিনা কিন্তু তারপরও কেমন যেন দূরে দূরে ছিলেন তারা। বাবা-মার সাথে সবার যেমন বিশেষ কিছু স্মৃতি আছে, তানভীর শত চেষ্টায়ও সেরকম কিছু মনে করতে পারেনা।

একদিন তানভীর তার এসব চিন্তার কারনে নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করে। অনুতপ্ত হয়ে সে তাদের কথা আর শিশুকালের স্মৃতি মনে করার জন্য একদিন তার বাবা-মা যে বাসায় ছিল সেখানে যায়। সেই বাড়ির চাবি সে চুপিচুপি এনেছে।বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই সে তার বাবা-মার রুমটায় যায়। রুমটা বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে খোলা হয়নি।রুমটায় ঢুকেই তানভীরের চোখ পড়ল তার বাবার বইয়ের সমাহারের উপর। রুমের একপাশ পুরোটা জুড়ে একটা দানব আকৃতির বুক-শেলফ। বুক-শেলফটার পাশেই একটা জানালা এবং তার সামনে একটা টেবিল আর চেয়ার। রুমের অন্যপাশে একটা খাট আর আলমিরা। বুক শেলফটায় বেশির ভাগ বই হিউম্যান ব্রেইন নিয়ে। যদিও ওর বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী।একসময় নাকি ওর বাবা ব্যবসায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। বিয়ের কয়েক বছর পর সেই পারদর্শিতা আর টিকেনি - এমনটাই বলেছিল মিথিলা। তানভীর বাবাকে প্রায়ই এইসব বই নিয়ে থাকতে দেখত। ব্যবসা সংক্রান্ত বই নিয়ে ওর বাবাকে সে কখনই দেখেনি, হয়তো এক-দুবার। বুক-শেলফ এর বই গুলো এখনো পরিষ্কার। তানভীর বুক-শেলফটার কাছে গিয়ে প্রথমেই দৃষ্টি অর্পণ করে 'ডু নো হার্ম' বইটার উপর, হেনরি মার্শের লিখা। বাবা মারা যাওয়ার আগে এই বইটা পড়তে দেখেছে সে।বইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে রেখে দেয় তানভীর। তারপর সে যায় টেবিলটার দিকে। টেবিলটার উপর অল্প ধুলো। সে চেয়ারটা বিনা শব্দে আলতো করে টান দেয় এবং তাতে বসে পরে। এই চেয়ারেই সে তার বাবাকে কাঠের মতো স্থির ভাবে বসে থাকতে দেখে ছোটবেলায় ভয় পেত।টেবিলের উপর একটা টেবিল ল্যাম্প আছে। তাতে ধুলো জমে যেন এর সৌন্দর্য আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছে। সে খেয়াল করে যে টেবিলের নিচের দিকে একটা ড্রয়ার হালকা খোলা। তানভীর ড্রয়ারটি টান দিয়ে খুলে দেখে ভেতরে কয়েকটা

হিসাব-নিকাশের কাগজ। ড্রয়ারটি পরিষ্কার তবে কোণা দিয়ে একটা কাগজের ছোট টুকরা যেন কাঠের নিচ থেকে উঁকি দিচ্ছে। সেটা টান দিতেই কাঠের ড্রয়ারের নিচের কাঠটি নড়ে উঠে। সে ভাবল ড্রয়ারটি সে ভেঙে ফেললো কিনা। সে কাঠের টুকরোটি তুললে দেখতে পায় তার নিচে আরেকটি কাঠের স্তর এবং তার উপর অনেক মাকড়সার জালে মোড়ানো একটা ডায়েরি। সে অবাক হলো, বিস্মিত হলো কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারল না। ডায়েরিটা হাতে নিয়ে ফুঁ দিতেই সব মাকড়সার জাল উড়ে গেল। ডায়রিটা পুরনো এবং কালচে-খয়েরি রঙের। ছোট একটা কম পেইজের ডায়েরি। কভারটার একটা কোনা ছেঁড়া। তানভীর খুবই রোমাঞ্চিত এই পুরানো ডায়েরি দেখে।কি আছে তাতে দেখার জন্য সে আগ্রহী। বাবা তাকে নিয়ে কি ভাবতো তা জানতে সে প্রবল উৎসাহী। কভারের উপর কোনো লেখা নেই। কভারটা উল্টোতেই প্রথম পৃষ্ঠা থেকে খুবই স্পষ্ট এবং নিপুণ অক্ষরে কালো কালি দিয়ে লেখা লাইনগুলো দেখে সে।কোনো সময়ের উল্লেখ নেই কোথাও। ডায়েরি কি এমন হয় নাকি? - ভাবলো সে। তারপর ডায়েরিটা পড়া শুরু করল তানভীর।

ডায়েরির লিখা -

" আমি ডায়েরি লিখি না।লিখার অভ্যাসও নেই।তাই আমি বিশেষ এই ঘটনার কথা বলছি আজ।এটা লিখে যাচ্ছি আমি কারন এই মহা পাপের কথা আমি কখনো বলতে পারব না।আর আমি চাই না যেন এটা সবসময় অজানা থাকুক।তাই এই লেখা।তুমি যেই হও না কেন আমার পাপের কথাটা মনযোগ দিয়ে পড় এবং আমি কি ক্ষমার যোগ্য কিনা তা জানিয়ে দিও।কেউ আমার এই পাপের কথা জানলে আমি স্বস্তি বোধ করব বলেই আমার ধারনা। আর এটা পড়ার পর ডায়েরিটা পুড়িয়ে ফেলো।এই ডায়েরিতে কোনো তারিখ লিখব না।কেন তা জানি না।লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না।হয়তো আমি ভয় পাচ্ছি আমি কে তা তোমরা জেনে যাবে বলে।তোমার দায়িত্ব এটা পড়ে পুড়িয়ে ফেলা, আর যদি পারো ক্ষমা করে দেয়া। আমরা তিন বন্ধু।আমি, ক এবং খ (আমি কারোর নামও উল্লেখ করব না)। আমি ছোটো থেকেই মেধাবী।ব্রেইন নিয়ে ছিল প্রচুর আগ্রহ। মেডিকেল কলেজে থাকার সময় আমার মেধা দেখে আমাকে বিদেশে পড়ার জন্য পাঠানো হয় (কোন দেশ তাও বলব না)।সেখানে আমি আমার দুই বন্ধু ক ও খ এর সাথে প্রথম দেখা করি আর ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি।কেননা আমরা তিনজনই খুবই মেধাবী এবং ব্রেইন নিয়ে অনেক আগ্রহী ছিলাম। ব্রেইন নিয়ে অনেক গবেষণাও আমরা তিনজন করি একত্রে, শুধু আমরা তিনজন গোপনে। ফাইনাল ইয়ারে আমি আমার বন্ধুদের একটা প্রজেক্টের কথা বলি। আমার ব্যক্তিগত দীর্ঘদিনের একটা গবেষণাপত্র তাদের দেখাই। ব্রেইন ট্রান্সফার নিয়ে পত্রটি। খুবই বিবৃত এবং ব্যাখ্যা করা গবেষণা পত্রটি ক ও খ উভয়েই পড়ল। বেশ ভুলও বের করল।কিন্তু সেই সাথে খুবই উৎসাহিত হলো কেননা আমি এতে এমন এক পদ্ধতির কথা বলেছি যার মাধ্যমে যৌক্তিকভাবে ব্রেইন ট্রান্সফার সম্ভব (গবেষণাপত্রটি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর এই পদ্ধতির কথাও আমি বলব না)।আমরা ব্রেইন ট্রান্সফারের সমস্যা গুলো সমাধান করতে মনোযোগী হলাম। কখন যে ডাক্তার হয়ে বিদেশের এক হাসপাতালে চাকরি করা শুরু করেছি বলতেই পারলাম না। আমি দেশে কিছুদিন পর আসলাম।আসার সপ্তাহ খানিক পর বাবা-মা মারা যান (কি কারনে বলব না)।কিছুদিন পর আমি সেখানে এক মেয়ের প্রেমে পড়লাম। কিন্তু ছুটি শেষ বলে আবার বিদেশে গেলাম।সেখানে চাকরি আর আমাদের তিনজনের গবেষণা করতে করতে অনেক সময় কাটল (৩ বছরের বেশি)।অবশ্যই বুঝতে পারছো আমরা তিনজন খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম।ক ও খ দুজনের বাড়িই বিদেশে ছিল।তাই তাদের বাসায়ও আমার আনা-গোনা ছিল। আমরা ক্রমেই বড় পদে উঠে আসলাম। তখন আমরা ব্রেইন ট্রান্সফারে অনেক দূর এসেছি। তেমন কোনো সমস্যাও সামনে ছিল না।তাই এখন এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। প্রথম করলাম দুটো কুকুরের উপর। সেটা ব্যর্থ। এরকম আরো গবেষণা, সমস্যা, সমাধান শেষে অনেক সময় (কত সময় পর বলব না) পর আমরা প্রথম সাফল্য লাভ করি। এবং সাধারণ সাফল্য না, অসাধারণ সাফল্য।একটি কুকুর যেন আরেকটিতে চলে গেছে।এবং নড়তে, দৌড়াতে পারে, প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে, হাসতে পারে।তবে মাঝে মাঝে কাঠের মতো স্থির থাকত

এই-ই যা। আমি এই সাফল্যের কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করলাম। আমি চাচ্ছিলাম মানুষের ব্রেইন প্রতিস্থাপন করে এক সাথে পুরো পৃথিবীতে বোমা ফাটাতে। কিন্তু ক ও খ দুজনে এর ঘোর বিরোধী। কোনোভাবে তাদের রাজি করে প্রথম মানুষের উপর পরীক্ষা করি আমরা। আমরা তখন অনেক উচুঁ পদে তাই মানুষের ব্যবস্থা করা কোনো সমস্যা হয়নি। পরীক্ষাটা ব্যর্থ হয়। দুজনই মারা যায়।ক ও খ আতঙ্কিত এবং অনুতপ্ত হয়।তারা এই গবেষণা বাদ দিয়ে নিজের পরিবারের প্রতি নজর দিবে বলে জানায় (তারা বিবাহিত ছিল, আমি ছিলাম অবিবাহিত)। আমি তাদের ছাড়াই পরীক্ষার সমস্যাগুলো পরখ করে সমাধান করি। কিন্তু আমিও একসময় একাকিত্ব বোধ করতে থাকি। তখন আমি দেশে ফিরি। ঐ মেয়েটার কথা মনে আছে যাকে আমার ভালো লেগেছিল? তার বিয়ে হয়ে বাচ্চাও হয়।বাচ্চা মেয়েটা পুরো মায়ের মতো হয় (বাচ্চার বয়স বলা হবে না)।আমি খুবই একা অনুভব করলাম। একাকিত্ব, এতিম হওয়ার অনুভব আমাকে গ্রাস করে। ভাই,বোন,বাবা,মা,আত্মীয়,বন্ধু কেউই নেই আমার।হঠাৎ একদিন শুনি ঐ বাচ্চারও বিয়ে হয়েছে।স্বামী নামকরা ব্যবসায়ী।আমি কেন যেন রাগান্বিত হই।নিজেকে তুচ্ছ মনে হয়। মনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। আমি ততদিনে মাদক গ্রহন করে পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছি। চাকরি,সম্পত্তি সব হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ একদিন পুরনো বই ঘাটতে গিয়ে গবেষণাপত্রগুলো পাই।আর আমার মনে

একটা নীল নকশা তৈরি হয়।আমার দুই বন্ধু ক ও খ কে আমি আমার দেশে বিভিন্ন কথা বলে আনাই (কি কথা বা কারণ দেখিয়ে আনাই বলব না)। তারপর তাদের আমি একটা অনুরোধ করি।কি অনুরোধ করেছি বলে মনে হচ্ছে? হুম, সেটাই।আমি ঐটা লিখব না।এটা লিখার সৎ-সাহস আমার নেই।দেশে যখন তাদের আনতে পেরেছি তখন তাদের হুমকি দিয়ে কাজ করানো আর বড় কি বিষয়।তাদের কাছে আমার সেই মানুষের উপর এক্সপেরিমেন্টের সংশোধিত গবেষণা পত্র দেই এবং ব্যবসায়ীকে অজ্ঞান করে এক হাসপাতালে নিয়ে আসি।ক ও খ তখন এত বড় পদে যে তারা রীতিমতো যা বলে তাই-ই আইন। তাই ভিনদেশে একটা হাসপাতাল কেনা আর কি অসম্ভব কাজ তাদের জন্য?

সেই হাসপাতালে এক রাতে ক ও খ মানুষের আগমনের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত যত আবিষ্কার আছে প্রায় সবগুলোকে ছাপিয়ে এক অমর কীর্তি করে, যার কথা কেউই জানবে না। অন্যের চোখকে নিজের মনে হয় আমার।অন্যের রক্ত অন্যের ধমনী আর শিরা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রাখে।আর সেই মাতাল, ফকির, সকলের উপেক্ষিত এবং অচেনা আমার মৃতদেহ পাশে দেখলাম অন্যের চোখ দিয়ে। যার শরীরে আমার আবাস সেই পাশের এক পানি ভরা পাত্রে।আমি দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েও হলাম না।আর আমার এই অস্তিত্বহীনতা কেউ অনুভবও করল না।

আমার নব-আগমনের পর প্রথম কাজটা কি ছিল বলতে পারবে? সেই গবেষণাপত্র এবং এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে পুড়িয়ে ফেলা।

-

-

-

ধীরে ধীরে আমার একাকিত্ব দূর করে অন্য এক ব্যক্তির সহধর্মিনী। কিন্তু ক্রমে আমি তাকে আমার করে নিই।কিছু সময় পর আমার এক ফুটফুটে বাচ্চা হয়।সে বাচ্চার কথা জানতে চাও কি? এত অজানা তথ্যের পর একটা বিশেষ তথ্য তোমাকে জানিয়ে দিলে হয়তো স্বস্তি বোধ করবে তাই না? ঐ ফুটফুটে বাচ্চাটা একটা ছেলে।

আমার গল্প পড়েছ, আশা করি বুঝেছ এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধীর কথা ও তার অপরাধের কথা জানতে পেরেছ।তোমার কাছে আমি প্রথমে যা জানতে চেয়েছিলাম তা না জানালেও হবে। আমি কষ্ট পাব না।শুধু এই ডায়েরিটা পুড়িয়ে ফেলো।

আমার আসল নাম কি? দুঃখিত, আমি এত বড় কাপুরুষ যে তা বলার সাহসটুকুও আমার নেই।আমি দুঃখিত।আমি দুঃখিত।আমি দুঃখিত।"

ইতি,
আমি

তানভীরের ডায়েরি পড়ার ৩ দিন পর-

মিথিলা - তানভীর! পোড়া গন্ধটা কিসের দেখতো! তানভীর?

মিথিলা তানভীরের রুমে গিয়ে একটা পুড়তে থাকা ডায়েরি আর তানভীরের ঝুলন্ত নিথর দেহ খোঁজে পায়।

মিনি সাই-ফাই

T2 ফাযের Random Mutation হয়েছে। এখন সে মানুষের কোষও সহজে ধ্বংস করতে পারে। ঘন্টায় ঘন্টায় বিলিয়নের ঘরে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ হচ্ছে। কিছুদিন পর সবার ভেতর ও বাহিরে ত্বক থেকে রক্তপাত শুরু, আর কিছুদিন পর, সব শেষ ।

-সমুদ্র জিত সাহা

ভাইরাসের দালালি

হাসান-উজ-জামান

আমরা ভাইরাসের কথা কখন শুনি? যখন অসুখবিসুখ আসে।

অথচ রোগ বাঁধানো ভাইরাসের কাজকর্মের শুধু একটা দিক। আপনার অফিসের জব ডেস্ক্রিপশানে যদি লেখা থাকে- জহির সাহেবের একমাত্র কাজ তার কলিগদের বিরক্ত করা- তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে? ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত সেটাই করি।

ভাইরাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পৃথিবীর ভূরাসায়নিক চক্র নিয়ন্ত্রণ করা। দুনিয়াটা ঠিকভাবে চলার জন্য কয়েকটা জিনিস অতি প্রয়োজনীয়, যেমন বাতাসের অক্সিজেন কিংবা নাইট্রোজেন। এই জিনিসগুলো যাতে প্রকৃতিতে ঠিক অনুপাতে থাকে, খুব একটা এদিক ওদিক না হয়, সেটা ঠিকঠাক রাখার একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হচ্ছে ভাইরাস।

আমরা যারা ভাইরাস মানে এতদিন শুধু সর্দিকাশি এইডসের আপদ জেনে এসেছি, তাদের কাছে কথাটা বেখাপ্পা শোনাতে পারে। আপনার-আমার দেহে ভাইরাস দয়া করে আসে- আমরা খামোখা বেমৌসুমে বাদুড় ছানতে যাই বলে।তাদের আসল বসত সমুদ্র।পৃথিবীর পানিতে ভাইরাসের সংখ্যা মোটামুটি আন্দাজে টেন টু দা পাওয়ার অফ থার্টি, অর্থাৎ একের পরে ত্রিশটা শূন্য, অর্থাৎ একশ কোটি কোটি কোটি কোটি। তুলনার জন্য বলি- পৃথিবীতে পিঁপড়ের সংখ্যা মোটামুটি একের পরে ষোলটা শূন্য। সমুদ্রে ভাসমান ভাইরাসের সংখ্যা তার থেকে এক কোটি কোটি গুণ বেশি।

সালোকসংশ্লেষণ ব্যাপারটা তো জানেন।সালোকসংশ্লেষণ কারা করে? গাছপালা বললে উত্তর অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে। পৃথিবীর সিংহভাগ সালোকসংশ্লেষণ করে শৈবাল।আমাদের তাবৎ সাগর মহাসাগর জুড়ে শৈবালের ছোট ছোট কোষ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। এরাই হচ্ছে অক্সিজেনের মূল ফ্যাক্টরি- পৃথিবীর

যাবতীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ভেঙ্গেচুরে অক্সিজেন বানানোর ব্যাপারটা তারাই করে।বিজ্ঞানীরা বলেন, বায়ুমণ্ডলের পঁচাশি ভাগ পর্যন্ত অক্সিজেন বানানোর পেছনে হাত থাকতে পারে এই সামুদ্রিক অণুজীবদের।

কিন্তু এর সাথে ভাইরাসের কী সম্পর্ক?

দুনিয়ার সবকিছুরই ব্যালেন্স থাকতে হয়, তা তো জানেন। সমুদ্রময় কিলবিলে শৈবাল বিপুল বিক্রমে অক্সিজেন বানিয়ে যাচ্ছে।এদের পরিমাণ খুব বেড়ে যাওয়া কাজের কথা নয়।সমুদ্র তখন তাদের এত জনসংখ্যা খাইয়ে পরিয়ে রাখতে পারবে না, মড়ক লাগবে।আবার বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব বেড়ে যাওয়াও ভাল কথা নয়।পৃথিবীর সমস্ত জিনিসই মাত্রার অতিরিক্ত পর্যায়ে গেলে বিষক্রিয়া করে।আমার গিন্নীর বিরিয়ানি বাদে।

তো ভাইরাসদের কাজ হল সমুদ্রের এই অক্সিজেন ফ্যাক্টরিগুলোর ওপর ছড়ি ঘোরানো। সাদা বাংলায় বলতে গেলে, এরা শৈবালের কোষগুলোকে মেরেকেটে পরিষ্কার রাখে। প্রত্যেকটা শৈবাল কোষের পেছনে না হলেও দশটা করে ভাইরাস লেগে থাকে, যাদের জীবনের লক্ষ্য কোষগুলোকে ফুটো করে দফারফা করা। কোষগুলোও যে ভাইরাসের সংক্রমণে বেঘোরে মারা যায় তা নয়, তাদেরও বিভিন্ন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকে। দুই পক্ষের তীব্র ঘাত-পরাঘাতে- যেটাকে বলে জাতাজাতি আরকি- শেষ পর্যন্ত পরিবেশে একটা সাম্যাবস্থা তৈরি হয়। সমুদ্রে অক্সিজেন ফ্যাক্টরিগুলো মোটামুটি একটা রেঞ্জের মধ্যে থাকে।

আপনার নেওয়া প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসের পেছনে তাই ভাইরাসদের পরোক্ষ হাত আছে।

ভাইরাসের এই কাজটার সাথে জাতি হিসেবে আমাদের বাঙালিদের বিশেষ করে পরিচয় থাকা উচিত। কারণ এটা আমাদের দেশের একটা শ্বাশ্বত ট্র্যাজেডির সাথে জড়িত।

আমাদের দেশে বছর বছর কলেরা হয় তা তো জানেন।আমি-আপনি শহরের ওপরতলার মানুষ, আমাদের হয়ত হয় না।কিন্তু বস্তি বা পাড়াগাঁয়ের দিকে যারা এখনো নালা-টালার পানি খেয়ে থাকেন, বাচ্চাদের সেখানে গোসল করান, তাদের জীবনে এটা নেহায়েতই একটা বাস্তবতা।

কলেরা যে কেন প্রত্যেক বছর রীতিমত ক্যালেন্ডার মেনে একটা নির্দিষ্ট সময়েই আক্রমণ করে, এটা নিয়ে বিজ্ঞানীরা চুল কম পাকাননি। আমার পুরোনো বসের থিওরী ছিল এরকম- কলেরা জীবাণুটা থাকে একটা বিশেষ জাতের শ্যাওলার পেটে। কলেরার মৌসুমে পানিতে এই শ্যাওলাদের পরিমাণ বেড়ে যায়, সাথে ধেই ধেই করে কলেরা জীবাণুর পরিমাণও বাড়ে। পরে একসময় শ্যাওলার মধ্যে মড়ক লাগলে জীবাণুগুলো হুহু করে পানির মধ্যে বেরিয়ে এসে পুরো পুকুর দূষিত করে ফেলে।সেই পানি পেটে যাওয়া মানে কলেরা।

এটা গেল একটা থিওরী। এছাড়াও অন্য আরেকটা থিওরী আছে- যেটার সাথে আমাদের সেই সমুদ্রের পপুলেশান কন্ট্রোল ব্যাপারটার মিল আছে।

ঘটনা আজ থেকে বছর বিশেক আগের।কলেরা হাসপাতালের কিছু বিজ্ঞানী টানা তিন বছর ধরে ঢাকার কিছু জলাশয়ের পানি সংগ্রহ করছিলেন। সেই পানি পরীক্ষাগারে এনে নানারকম মাপজোখ করে তারা একটা মজার ব্যাপার দেখলেন।

চোরের ওপর বাটপার থাকে জানেন তো? কলেরা অতিশয় ধুরন্ধর জীবাণু, কিন্তু তার ঘাড়ের ওপর বাটপারের মত থাকে কলেরা ভাইরাস। এদের কাজ কলেরা জীবাণুদের খেয়ে শেষ করা। বিজ্ঞানীরা যেটা দেখলেন- বছরে যে সময়টাতে কলেরার প্রকোপ আসে, ঠিক তখনই পানিতে এই ভাইরাসগুলোর পরিমাণ কমে যায়।

এই ব্যাপারটা দেখে তাদের সন্দেহ হল, কলেরার প্রকোপ কমানোয় বোধহয় এই ভাইরাসগুলোর হাত আছে।এরা কলেরার জীবাণুকে মেরেকেটে সাফ করে বলেই আমাদের অত বেশি কলেরা হয় না। কিন্তু প্রকোপের মৌসুমটাতে বিভিন্ন কারণে পানিতে ভাইরাসটার সংখ্যা যায় কমে- কাজেই কলেরার জীবাণুরা লকলকিয়ে ওঠে। পরবর্তী গবেষণাগুলোতে তারা অঙ্কটঙ্ক কোষে একদম মডেল বের করে ফেললেন, কলেরা প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে ভাইরাসের ভূমিকা কতখানি কীরকম।

ছোটবেলায় কোন বইতে যেন পড়েছিলাম, নেতাজী একবার গিয়েছিলেন হিটলারের সাথে সাক্ষাৎ করতে।শত্রুর শত্রুবড় বন্ধু।

সেই লজিকে এই ভাইরাসগুলোকেও একরকম বন্ধুই বলতে হচ্ছে আমাদের।

তথ্যসূত্র
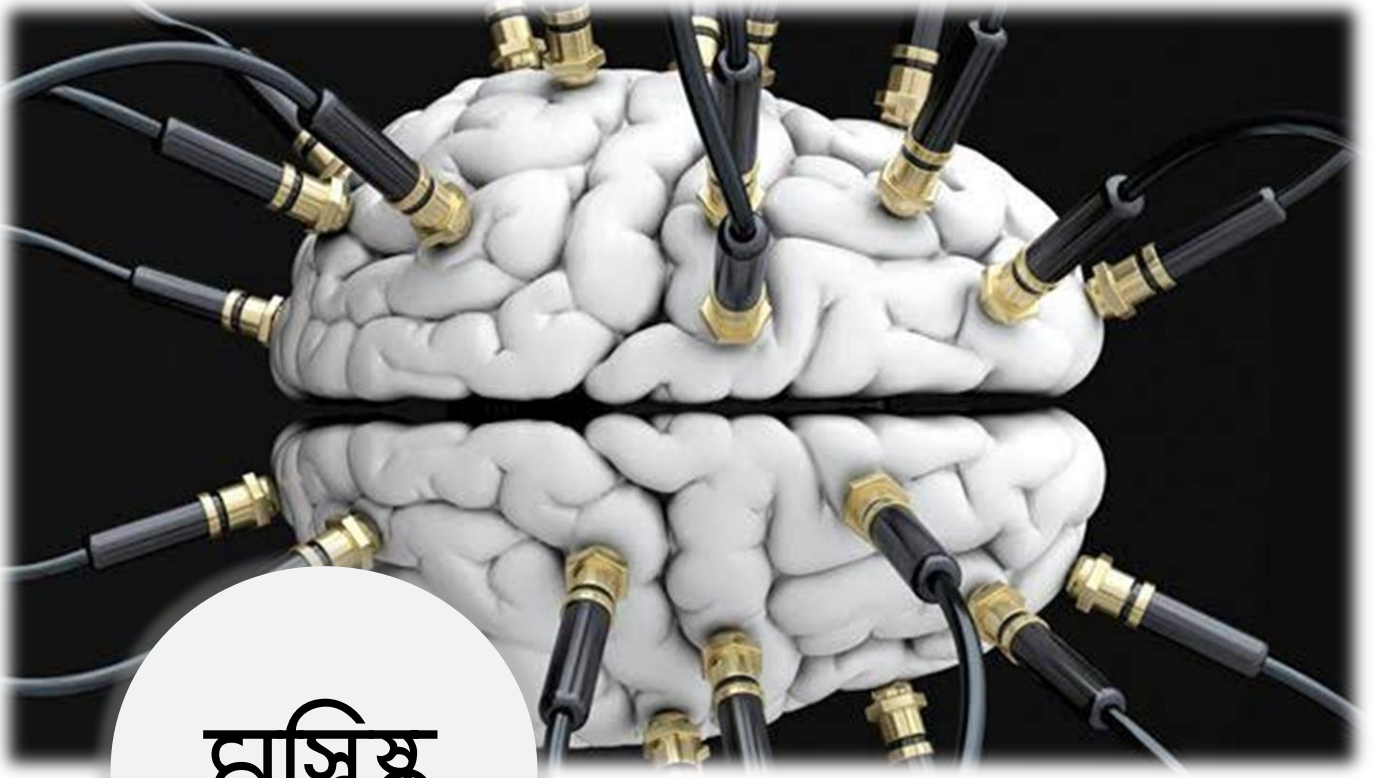
মস্তিষ্ক

আদিন নুর

ঠিক কতদিন ধরে হাঁটছি মনে নেই বিস্তীর্ণ এই এলাকার যতদূরে চোখ যায় শুধুই বালি।
এই বালির এলাকা পার হলেই পরবর্তী চেকপয়েন্ট,এটাই শেষ ধাপ,যে শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে, সেই বিজয়ী। তাকেই 'গুয়াতেমালা' কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমার মনে আছে, আমরা প্রথমে ১১ জন ছিলাম, কিন্তু শেষে এসে জীবিত ছিলাম শুধু আমি আর লী।
আমাদের এই ১৭ দিনের অভিযানে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি যাতে আমরা একে অন্যকে হত্যা করে খেতে পারি।
আমি লী কে হত্যা করেছি, অবশ্য আমি না করলে ও করতই শেষমেশ আমাকেই কাজটা করতে হয়েছে।শুধু হত্যা নয়, ওকে খাওয়ার মত জঘন্য কাজটাও করতে হয়েছে।
আমি ছিলাম ড্রাগ ডিলার। চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাগ সাপ্লাই করতাম।একদিন এক এফ.বি.আই এজেন্টের ফাঁদে পড়ে যাই আর আমার ১৫ বছরের জেল হয় গুয়াতেমালা কারাগারে।
তবে সুযোগ পেয়েছি আর এখন ১১ জনের মধ্যে শুধু আমিই বেঁচে আছি।আমার ভাবতেই শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠছে যে আমি বেঁচে যাবো নিলি কি এখনো বিয়ে করেনি?আশা করছি করেনি,আমি ফিরে গিয়ে নিলিকে বিয়ে করব, তারপর ছোট একটা কাজ নেব দুজনে পুরো দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এক জগত তৈরি করব।
আমি নিলিকে দেখতে পাচ্ছি। একজন নয় অনেকগুলো নিলি,চারদিকে ছেয়ে গেছে।সবাই একসাথে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।হঠাৎ...খুব জোরে একটা শব্দ হল...
ধুর...ভালই তো চলছিল,হঠাৎ এটা কী করলে তুমি?
আরে আমি কি খেয়াল করেছি নাকি? হঠাৎ ফসকে গেল।
তবে ব্রেইন সিমুলেশন থেকে আজ অনেকদূর এগিয়েছি আমরা,মানুষটার মাঝে একদিকে যেমন জীবিত থাকার প্রেষণা দেখা গেছে সেইসাথে সমাজবদ্ধ হবার চিন্তাধারাও প্রকাশ ব্যাপারে সব তথ্য জোগাড় করে ফেলব।

দুটো বেগুনী বর্ণের অস্বাভাবিক বড় মাথাওয়ালা কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী উঠে ঘর থেকে বের হয়ে একটা বাইভার্বালে চড়ে চলে গেল। ঘরের মেঝেতে তখনও পড়ে আছে নীলাভ-সবুজ তরলে ভাসতে থাকা একটা মানব মস্তিষ্ক।

ফিনিক্সের হাসি

সাইফুল ইসলাম টিপু

১.

"আমি খুবই দুঃখিত স্যার এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে; কিন্তু... ।" ভিডিকমে ভেসে আসা অফিসারের চেহারায় দুঃখের ছিটেফোঁটাও নেই।বরং তাকে কিঞ্চিৎ খুশিই মনে হচ্ছে।

-ঠিক আছে, বিরক্ত যখন করেই ফেলেছ এখন সরাসরি কাজের কথায় চলে যাও", কণ্ঠে একটা তাড়াহুড়ো ভাব স্পষ্ট সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সার্ভিসের চীফ, জেনারেল লরেঞ্জোর।

"স্যার! আজকে সন্ধ্যায় 'ডুম এ-আই-আর' এর একটি আস্তানায় অভিযান চালিয়েছিল ইন্টিলিজেন্স এর একটি কমান্ডো দল। অভিযানে কয়েকজন মারা পড়ে আর একজন ধরা পড়ে। বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী পালিয়ে যায়।" এটুকু বলে চুপ করে যায় অফিসার।

-"তো কী সমস্যা? যেটিকে ধরতে পেরেছ তাকে ইন্টারগেশন কর। যত পারো তথ্য আদায় করে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠিয়ে দাও।তুমি তো মেজর রেঙ্কের অফিসার, তাই না? তাহলে সব প্রটোকল নিশ্চয় জানা আছে। এই ছোট ব্যাপার নিয়ে এত উতলা হচ্ছ কেন?" কিছুটা বিরক্ত স্বরেই বলেন জেনারেল।

"স্যার আমরা যাকে ধরেছি এতদিন তার আসল পরিচয় আমাদের জানা ছিল না, ইন্টিলিজেন্সের কাছে কেবল একটি কোড নেম ছিল ।তাকে ধরার পর সবাই বেশ বিস্মিত হয়েছি, ফিনিক্স এর কোড নেমের আড়ালে যে এত হাই প্রোফাইল কেউ জড়িত সেটিই আমাদের হতবাক করে দিয়েছে।"

-বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন জেনারেল।মস্তিষ্কে ঝড় বয়ে যায় মুহূর্তের ভেতর।"তোমরা 'ফিনিক্স'কে পাকড়াও করেছ?"

মৃদু হেসে মেজর বলে, "জ্বি, স্যার।অবশেষে আমরা তাকে ধরতে পেরেছি।"

-"আমি আসছি" আর কোনো কথা না বলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় জেনারেল।অনেক বছর ধরে ডিপার্টমেন্টের ঘুম হারাম করে রেখেছে এই 'ডুম এ-আই-আর' এর সন্ত্রাসীরা।পালের গোদা ফিনিক্সকে ধরতে পারা মানে এই গ্রুপ কয়েক দশকের জন্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া।

আধ-ঘণ্টার ভেতর সেন্ট্রাল সিকিউরিটি সার্ভিসের হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করেন জেনারেল। এই রাতেও প্রতিটি দরজায়, করিডরে ভয়ংকর মারণাস্ত্র হাতে কড়া পাহারা দিচ্ছে কঠোর মুখো কমান্ডো ।

করিডর ধরে হেঁটে এগিয়ে যাচ্ছেন জেনারেল লরেঞ্জো।দূর থেকে দেখে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে আসেন মেজর চিহুম্বুর।সামনে এসে খটাশ করে স্যালুট দিয়ে তার দিকে একটি ট্যাব এগিয়ে দেয়।

"স্যার, প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে আমাদের ইন্টার্গেশন চলছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কাজের তথ্য বের করা সম্ভব হয়নি।হাড়ে হাড়ে শয়তান। শেষে বলে কী না আমাদের মতো চুনোপুঁটিকে কিছুই বলবে না। চিন্তা করেন ব্যাটা এখন বন্দী, আর কিছুক্ষণ হয়তো তার আয়ু আছে, কিন্তু কোনো ভয়ডর নেই!" রাগে চোয়ালের হাড় কঠোর হয়ে উঠে মেজর চিহুম্বুর।

মেজরের অনুভূতিকে গুরুত্ব না দিয়ে জেনারেল বলেন, "জোর খাটিয়ে সবসময় কার্যসিদ্ধি নাও হতে পারে। প্রত্যেকটা মানুষের কিছু না কিছু দুর্বলতা আছে। তোমাকে সেই দুর্বল পয়েন্টগুলো বের করে সেখানে মোক্ষম আঘাত হানতে হবে।তবেই ব্যক্তিকে হ্যাক করা সম্ভব।আপাতত এই ফিনিক্সের ব্যাপারে যেখানে যত তথ্য পাও সব জোগাড় কর।ইন্টিলিজেন্সের সব ডিপার্টমেন্টেকে কানেক্ট করো।"

দ্রুত নির্দেশ দিতে দিতে করিডর ধরে এগিয়ে যাচ্ছেন জেনারেল; অবচেতন মনে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন নিজের চল্লিশ বছর সামরিক জীবনের স্মৃতি। কম জ্বালাতন করেনি এই সন্ত্রাসী সংগঠনটি। এখনো তারা অনেক সুসংগঠিত আর শক্তিশালী। তবে সাপের মাথা এই ফিনিক্সকে হ্যাক করতে পারলে সংগঠনটি গুড়িয়ে দেওয়া যাবে; আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না কয়েক যুগ। কী অদ্ভুত তাদের মতাদর্শ! বিজ্ঞানের সকল অর্জনকে ধ্বংস করে ফিরে যেতে চায় সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে! বর্তমানে ফিরে আসে জেনারেল; বিড়বিড় করে আপন মনে বলেন, "কোড নেমের আড়ালে কে এই ফিনিক্স?"

স্মিত হেসে মেজর বলেন "আসেন স্যার, নিজের চোখেই দেখেন।" বলতে বলতে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াতেই সেটি খুলে যায়। ঘরে ঢুকেন তারা দুজন। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি স্টিলের টেবিল, একপাশে হাতলবিহীন একটি চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ এক ব্যক্তি; মাথা নিচু করে টেবিলের উপর ঠেকিয়ে রাখা।অপর পার্শ্বে দুটি চেয়ার।

শব্দ করে চেয়ারটি টেনে বসতে বসতে মেজরকে পাশের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে জেনারেল।মাথা উঁচু করতেই ফিনিক্সের চেহারা জেনারেলের চোখের রেটিনা থেকে কপি করে তার স্পাইনাল কর্ডে বসানো 'এনি' স্থানীয় কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। কয়েক পিকো সেকেন্ডের ভেতর ফিনিক্সের ফেস রিকগনিশন করে তার পরিচয় জেনারেলের মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয় 'এনি'।

ভয়ানক চমকে উঠেন জেনারেল "প্রফেসর পেশিয়া!" অস্ফুট আওয়াজ বের হয়ে আসে তার কণ্ঠ থেকে! বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত কয়েকজন মানবতাবাদী ও দার্শনিকদের একজন এই প্রফেসর পেশিয়া।প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতেই ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর এক হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠে তার।এত বছর ধরে এই সংগঠনের পেছনে লেগে আছেন, ঘূণাক্ষরেও টের পাননি এর মূল হোতা একজন বৃদ্ধা! নারী দার্শনিক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রফেসর!

২.

"আপনাকে কী নামে ডাকবো ? পেশিয়া না কী ফিনিক্স?" আন্তরিক কণ্ঠে বলেন জেনারেল।

"আপনার যা মনে চায়।" মৃদু হেসে উত্তর দেন পেশিয়া।

"আচ্ছা, আপনাদের সমস্যা কোথায়? কেন আর্টিফিশাল ফেস রিকগনিশনের বিরুদ্ধে এভাবে উঠে পড়ে লেগেছেন?", সামনের দিকে কিছুটা ঝুকে বলেন জেনারেল।

"আপনি বুঝবেন? আচ্ছা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করি।" লম্বা করে দম নেন প্রফেসর পেশিয়া। "একসময় আমরা যে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে দিক নির্ণয় করতে পারতাম কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই। তারপর কম্পাসের প্রবর্তন হয়।মানুষ নিজের অনুভূতির ব্যবহার ভুলে, দিক নির্নয়ের জন্যে কম্পাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।কয়েশ বছর আগেও আমরা হাতে লেখার চিঠি, বার্তা পাঠিয়ে যোগাযোগ করতাম। এখন আমরা হাতের লেখা ভুলেই গেছি। আগে যে কোনো ঠিকানায় সহজেই নিজেরা পৌঁছে যেতে পারতাম। কিন্তু আর্টিফিশাল ইন্টিলিজেন্স ম্যাপের প্রবর্তনের ফলে এখন ঠিকানা থাকলেও কম্পিউটারের সহায়তা ব্যতীত কোনো ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারি না। ক্রমান্বয়ে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ইন্টারনেট আবিষ্কারের ফলে মানুষ নিজের মেধার ব্যবহার প্রায় ভুলেই গেছে। সকল কিছুর জন্যে আমাদের যন্ত্রের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে।" একটু থেমে পানি চায় পেশিয়া।

অল্প একটু পানি গ্লাসে ঢেলে তার দিকে বাড়িয়ে ধরেন জেনারেল। এক চুমুকে সবটুকু পানি গলায় ঢেলে পুনরায় বলা শুরু করেন পেশিয়া, "প্রযুক্তি আরও উন্নতির ফলে এখন আমাদের আছে সুপার-কোয়ান্টাম কম্পিউটার।পৃথিবীর সকল মানুষের ডাটাবেজ সেখানে আছে।এখন কোনো তথ্য আমাদের মুখস্ত রাখতে হয় না। এমনকি কারও চেহারাও আমাদের মনে রাখতে হয় না। আরও সহজ করে বলতে গেলে ফেস রিকগনিশন প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া আমরা কাউকে চিনি না।" প্রবল এক দুঃখবোধের ছায়া ফুটে উঠে পেশিয়ার অভিব্যক্তিতে। "মা তার সন্তানকে চিনে না, ভাই তার বোনকে চিনে না। স্বামী তার স্ত্রীকে চিনে না! এটা একটি অসুস্থ ব্যবস্থা!"

তাকে থামিয়ে দিয়ে জেনারেল বলেন, "এতে সমস্যা তো হচ্ছে না! আমাদের স্পাইনালকর্ডে যে 'এনি' সেট করা আছে সেটিই তো মুখমন্ডলের ছবি সেন্ট্রাল ডাটাবেজের সাথে মিলিয়ে আমাদের ব্রেনে মুহূর্তেই তার পরিচয় পৌঁছে দিচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় তথ্য মাথায় না রেখে কম্পিউটারে রাখা হচ্ছে।এতে মানুষের ব্রেন অন্য সৃষ্টিশীল কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে।আগে মানুষ কেবল অল্প কয়েকজনকেই চিনত। একজন মানুষ তার সমগ্র জীবনে আশি হাজার থেকে এক লক্ষ মানুষের সাথে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত হতে পারত। আর এখন পৃথিবীর যে কোনো মানুষ দশ বিলিয়ন মানুষকে চিনে।"

হঠাৎ করে পেশিয়া জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা, এখন কয়টা বাজে?"

মুহূর্তক্ষণ চিন্তা করে জেনারেল বলেন, "রাত তিনটা একুশ।"

মৃদু হেসে পেশিয়া বলেন, "দেখেছেন, সময়টা পর্যন্ত আপনি নিজে থেকে বলতে পারলেন না।আপনাকে 'এনি'-এর সাথে যোগাযোগ করে তার কাছ থেকে সময় জেনে নিতে হয়েছে।অথচ একসময় মানুষ কেবল চাঁদ সূর্যের অবস্থান দেখে সময় বলতে পারতো।

তারপর আসে ঘড়ির প্রচলন।এখন তো আমরা কাঁটার ঘড়ি দেখেও সময় নির্ণয় করতে ভুলে গেছি।'

বুকপকেট হাতড়ে দুটি চুরুট বের করেন জেনারেল লরেঞ্জো। পেশিয়ার দিকে একটি বাড়িয়ে ধরে বলেন, " ধূমপান চলে?"

"না।তবে জীবনের শেষ সময়ে আর এত নিয়ম মেনে কী হবে!" বলেই হাতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, "দয়া করে এই হ্যান্ডকাফটি খুলে দিবেন? আমি নিশ্চয় এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো না।না কি ভয় পাচ্ছেন?"।চোখে কৌতুক ফুটিয়ে বলেন তিনি।

ফুসফুস ভরে চুরুটের ধোঁয়া টেনে একযোগে পেশিয়ার মুখের উপর ছেড়ে দেন জেনারেল।পেশিয়াও জবাবে জেনারেলের মুখের উপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দেয়। দুজন চোখে চোখে তাকিয়ে আছে।

পেশিয়ার চোখে কৌতুক, আর জেনারেলের চোখে পেশিয়ার নির্লিপ্ত আচরণের কারণ ধরতে না পেরে ক্রোধ আড়াল করা বিস্ময় ।কিছু একটা তিনি ধরতে পারছেন না।

টর্চার সেলে আধো আধো আলো, চুরুটের ধোঁয়া আর মিষ্টি গন্ধের মিলিত একটি গুমট পরিবেশ তৈরি করেছে। পাশে অস্বস্তি নিয়ে বসে মেজর চিহুস্থু দুজনের মনস্তাত্বিক মল্লযুদ্ধ পর্যবেক্ষণ করছে।

নীরবতা ভেঙ্গে জেনারেল বলেন, "তাই বলে প্রযুক্তির অবদান তো আর অস্বীকার করা যাবে না।এর অগ্রগতিও থামানো যাবে না।আপনি কি আমাদের সেই পাথর যুগে ফিরে যেতে বলছেন? আমরা কি আবার সূর্য দেখে সময়, দিক নির্ণয় করবো? কবুতর দিয়ে বার্তা পাঠাবো? এমন হাজার হাজার তথ্য মুখস্ত করে রাখবো যেগুলো হয়তো কদাচিৎ দরকার?"

মৃদু হেসে পেশিয়া বলেন, "আমাদের ডুম এ-আই-আর সংগঠন কিন্তু প্রযুক্তির বিরোধীতা করে না।আমরা বলতে চাই একটি সীমা পর্যন্ত মানুষ আর প্রযুক্তির পাশাপাশি চলতে পারে।কিন্তু প্রযুক্তি আর মানুষের মিলনের হাইব্রিড? নো।জন্মের পরপরই স্পাইনাল-কর্ডে এনি সেট করে দেওয়া হচ্ছে।যদি কোনো কারণে আমাদের ডাটাবেজ হারিয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি হবে অনুমান করতে পারছেন? জবাবের অপেক্ষা না করে নিজেই উত্তর দিয়ে দেয় পেশিয়া, তখন পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাবে, এতিম হয়ে যাবে; কেউ কাউকে চিনবে না! একবার ভাবুন তো দশ বিলিয়ন পরিচয়হীন মানুষ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

কঠোর কণ্ঠে জেনারেল বললেন - এমনটা কখনো হবে না।সারা পৃথিবীতে পঞ্চাশটি সেন্টারে এই ডাটাবেজের ব্যাক-আপ আছে। সবগুলো একসাথে কখনো বিকল হবে না।

আচ্ছা বিকল না হলো; কিন্তু যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে? ভূমিকম্প কিংবা যদি কোনো গ্রহাণু আছড়ে পড়ে পৃথিবীর বুকে? কেউ যদি হ্যাক করে?"

হা হা করে হেসে উঠেন জেনারেল। "পাগলের প্রলাপ। সুপার-কোয়ান্টাম কম্পিউটার হ্যাক করা অসম্ভব।আর পৃথিবীর সব জায়গার একযোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব সেন্টার ধ্বংস হবে না কখনো।'

মুখে মৃদু হাসি ঝুলিয়ে রেখে পেশিয়া বলেন, "অন্তিম সময় উপস্থিত হলেই সবকিছু বুঝতে পারবেন।দুঃখ হচ্ছে, সময় থাকতে কেউ বুঝে না।বোঝার জন্যে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াতে হয়, তখন আর হাতে সময় থাকে না।আর আপনার মতো মিলিটারি মস্তিষ্কের মানুষরা তো আরও বুঝতে পারে না।'

চোখের পাতা টিরটির করে কাঁপছে জেনারেলের ।আত্মবিশ্বাসে খানিকটা ফাটল ধরেছে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর সামলে নিয়ে বলেন, "এইসব গাল-গল্প আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ঝাড়ুন। ওহ! আপনার তো আর সেখানে ফিরে যাওয়া হচ্ছে না। অন্তত মৃত্যুকে যদি আরামদায়ক করতে চান তবে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডারদের চেহারা আইডেন্টিফাই করুন।' সামনে ধরে রাখা ট্যাবটি তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন জেনারেল।

"আপনার কেন মনে হচ্ছে আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে আমার আদর্শের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবো?" চোখে কৌতুকের ছোয়া পেশিয়ার।

পেশিয়ার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় কণ্ঠে বলেন "শুধু নিজের মৃত্যুর কথা ভাবছেন কেন? আপনার তো দুটি মেয়ে আছে; বড় জন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ছোটটা কলেজে, তাই না? ইস্! একটু বেশিই ছোট।এতে অবশ্য সৈনিকদের আনন্দ বেড়েই যাবে বৈকি। জানেনইতো তারা মাসের পর মাস ব্যারাকে থাকে, বেশির ভাগই লম্বা সময় পরিবার থেকে দূরে থাকে।অনেকে আছে বিয়ে করার অনুমতি পায় না। তাই সুন্দরী তরুনীদের প্রতি বিশেষ ধরনের আকর্ষণ কাজ করে তাদের মনে।' ভয়ংকর নিষ্ঠুর এক হাসি ঠোঁটের কোণে ঝুলিয়ে স্রাগ করেন জেনারেল।

চমকে উঠে জেনারেলের দিকে তাকায় মেজর চিহুস্থু। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না জেনারেল এমন কথা বলতে পারেন!

উচ্চকণ্ঠে পেশিয়া বলেন, "নাহ! আপনি এমন করতে পারেন না!"

"আইনত এমন করতে পারি না তবে", নিজের কাঁধের উপর টোকা দিয়ে বলেন "এই যে দেখছেন চারটি স্টার! এই চারটি স্টারের অনেক ক্ষমতা। এত বিশাল ক্ষমতা যে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না।'

ফিসফিস করে পেশিয়া বলেন, "যা চান তাই দেব, তবে কথা দিতে হবে এসব থেকে আপনি আমার মেয়েদেরকে দূরে রাখবেন।' কণ্ঠে হার মেনে নেওয়ার সুর।

"এই তো বোধোদয় হয়েছে। এবার একে একে কমান্ডারদের আইডেন্টিফাই করে দিন।আমাদের সবার কাজ এতে সহজ হয়ে যাবে।আমি কথা দিচ্ছি আপনার মেয়েদের কোনো ক্ষতি হবে না।' হাসতে হাসতে বলেন জেনারেল।

কাঁপাকাঁপা হাতে ট্যাবটি তুলে নেয় পেশিয়া।বিড়বিড় করে বলতে থাকেন "আমাকে ক্ষমা করে দিও কমরেড, কোনো উপায় ছিল না।'

একশ ছয় জনকে মার্ক করে দেন প্রফেসর।তারপর বলেন, এরা সকলেই চূড়ান্ত পেশাদার সবারই প্রশিক্ষণ নেওয়া আছে, তাদের সবার কাছে লেজার গান আছে।এদের কখনো জীবিত পাকড়াও করা সম্ভব না।'

"আপনি এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।' দ্রুত নেটওয়ার্কে সবার ছবি ছড়িয়ে দিয়ে কমান্ড দেন, "তারা সকলে 'ডুম-এ-আই-আর এর দুর্ধর্ষ যোদ্ধা; দেখা মাত্র হত্যা করার অনুমতি রইল।'

৩.

পঞ্চাশটি সুপার কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেন্টারের আশেপাশে দুইজন করে কমান্ডার অপেক্ষা করছে।তাদের সাথে একটি করে লেজার গান আর বেশ কিছু টাইমার বিস্ফোরক ।আর কিছুক্ষণের ভেতরই তাদের অপারেশন শুরু হবে।

প্রতিটি সেন্টারের সুরক্ষায় কম করেও চল্লিশ জন করে প্রশিক্ষিত আর্মি কমান্ডার দায়িত্বে আছে।তাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেবল দুইজন কিভাবে এই অপারেশন সফল করবে।তাদের কেবল বলা হয়েছে, সময় মতো সেন্টারে ঢুকে যাবে, বাদবাকি দলনেতা ফিনিক্সই সমাধা করে রাখবেন।

সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তাদের জানা নেই, জানার প্রয়োজনও নেই। দলনেতার প্রতি তাদের রয়েছে অগাধ আস্থা।অনেক রাত, এখন কেবল অপেক্ষা একটি সংকেতের।তারপরই পঞ্চাশটি সেন্টারে একযোগে হামলে পড়বে তারা।

৪.

"আপনার জন্যে অত্যন্ত দুঃখবোধ হচ্ছে" যদিও জেনারেলের চোখে মুখে ধূর্ত হাসি।সেখানে সহানুভূতি ছিটেফোঁটাও নেই।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় পেশিয়া, চিৎকার দিয়ে বলেন, "গার্ড, গার্ড!"

পেশিয়ার আচমকা এমন আচরণে মুহূর্তেই হতভম্ব হয়ে যায় মেজর চিহুম্বু ও জেনারেল লরেঞ্জো।মেজর চিহুম্বু পেশিয়ার দিকে লেজার গান তাক করে বলে "কী ব্যাপার! নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে না কি? অবশ্য সাক্ষাৎ মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পেয়ে অনেক বীর কমরেডেকেই কাপড় ভিজিয়ে ফেলতে দেখেছি অতীতে।এমন চিৎকার করে গার্ডকে ডাকছেন কেন? বসুন চুপ করে, বসুন বলছি!" চিৎকার করে ধমকে উঠে মেজর।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে একজন গার্ড লেজার গান হাতে ঘরে প্রবেশ করে।সে দেখে পেশিয়ার হাতে লেজার গান আর সেটি তাক করে আছে জেনারেল লরেঞ্জোর দিকে।গার্ড রুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে মেজর চিহুম্বু দেখেতে পায় একজন 'ডুম এ-আই-আর' এর কমান্ডার লেজার গান তারদিকে তাক করে আছে।দুজনে একসাথে ট্রিগার টিপে দেয়।সাথে সাথে মেজর চিহুম্বু ও গার্ডের মাথায় দুই ইঞ্চি গোলাকার ফুটো হয়ে যায়।ধরাম করে দুটি দেহ মেঝেতে আছড়ে পড়ে।

লাফিয়ে উঠে মেজর চিহুম্বুর লেজার গানটি হাতে তুলে নিয়ে হতভম্ব জেনারেলে দিকে তাক করে হিসহিস করে বলেন, " এক্ষুনি প্রেসিডেন্টকে কল করে ইমার্জেন্সি ঘোষণা দিতে বলুন আর সুপার কোয়ান্টাম কম্পিউটার রুমের পাসওয়ার্ড দিতে বলুন।'

"কি হচ্ছে এসব!" চিৎকার করে বলে জেনারেল লরেঞ্জো! ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেছেন তিনি।

"এখনো বুঝতে পারেননি? আমাদের টিম আর্টিফিশাল ফেস রিকগনিশন সিস্টেম হ্যাক করেছে।বাইরের এই সিকিউরিটি গার্ড রুমে ঢুকে মেজর চিহুম্বুর চেহারার পরিবর্তে আমার চেহারা দেখতে পায়; আর মেজর চিহুম্বু গার্ডের চেহারার পরিবর্তে আমাদের একজন কমান্ডারের চেহারা দেখতে পায়।তাই তারা একে অপরের খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। আপনার সিকিউরিটি কমান্ডোরা এখন নিজেরাই নিজেদের হত্যা করবে; আর ভাববে 'ডুম এ-আই-আর' এর কমান্ডারদের হত্যা করছে। প্রতিটি সুপার কোয়ান্টাম কম্পিউটার সেন্টারে সব সিকিউরিটি কিছুক্ষণের ভেতর মারা পড়বে।আমাদের যে একশ ছয় জন কমান্ডারকে দেখা মাত্র হত্যা করার কমান্ড দিয়েছেন, তারা এখন বিভিন্ন ডাটা-সেন্ট্রারে বিনা বাঁধায় প্রবেশ করবে।'

অবিশ্বাস্য চোখে তাকিয়ে আছেন জেনারেল লরেঞ্জো। সেখানে ধীরে ধীরে তীব্র ভয়ের ছায়া স্পষ্ট হয়ে উঠছে।কাঁপাকাঁপা কণ্ঠে বলেন, "অসম্ভব! সুপার-কোয়ান্টাম কম্পিউটার হ্যাক করা সম্ভব নয়।নিশ্চয় কোনো ধাপ্পাবাজি করছেন।'

"একজন মানুষের পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়।কিন্তু একশ মেধাবী হ্যাকার যদি প্যারালালি যুক্ত হয়ে একযোগে এটাক করে? সেক্ষেত্রে একজন মানুষের ক্ষমতা যদি X হয় তবে তাদের সম্মিলিত ক্ষমতা হবে X100; পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সুপার কোয়ান্টাম কম্পিউটার হ্যাক করতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক ন্যানো সেকেন্ড।' জেনারেলের চোখে সরাসরি চোখ রেখে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন পেশিয়া।

"এ হতেই পারে না।মানুষের ব্রেন প্যারালালী যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে না।'

"মানুষের ব্যাপারে আপনার ধারণা নেই মিস্টার লরেঞ্জো।বিবর্তন এক অদ্ভুত প্রক্রিয়া।শত শত বছর ধরে স্পাইনাল কর্ডের ভেতর এনি সেট করে বিবর্তনের সেই ধারাকেই গতিশীল করেছি আমরা। যেই এনি এর মাধ্যমে আমরা সব তথ্য পেতাম সেই এনিকেই এখন রিভার্স ফ্লো এর মাধ্যমে হ্যাক করা হয়েছে।এই এনির মাধ্যমেই সেইসব হ্যাকার এখন একে অপরের সাথে প্যারালালি যুক্ত হতে পারছে।আপনার প্রযুক্তি নিজের নিজের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

হাতের লেজার গানটি নেড়ে ধমকের স্বরে বলেন পেশিয়া, "দেরী করছেন কেন? প্রেসিডেন্টকে কল করুন।'

"যদি না করি?" দৃঢ় কণ্ঠে বলেন জেনারেল। হারানো আত্মবিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে, এখন তিনি সৈনিকসুলভ দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন।
"কোনো সমস্যা নেই। আপনাকে হত্যা করে আমি নিজেই কল দিব, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ভাববেন আপনি কল করেছেন। আমার ফেসের কোডকে আপনার ফেসের কোড দিয়ে রিপ্লেস করে দেওয়া হবে। শুধু শুধু মরতে না চাইলে যা বলি জলদি সে মোতাবেক কাজ করুন।"
"আপনি বুঝতে পারছেন পৃথিবীতে কি বিপর্যয় নেমে আসবে? সকল অর্ডার ভেঙে যাবে, চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে!"
"আমরা অনেকদিন ধরেই এই বিপ্লবের প্রস্তুতি নিয়ে আসছি। সবার পরিচয় প্রিন্ট করে পৌঁছে দেয়া হবে।প্রথম দিকে একটু কষ্ট হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে আবার সবকিছুতে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।"
"আপনারা যদি সম্পূর্ণ আর্টিফিশাল ইন্টিলিজেন্স রিকগনিশন হ্যাক করেই থাকেন তবে পাসওয়ার্ডের আর দরকার কী?"
হ্যাক করেছি সুপার কোয়ান্টাম কম্পিউটার। কিন্তু হ্যাক করে হার্ডওয়ারের কোনো ক্ষতি করা যায় না। আমরা ভল্টে ঢোকার পাসওয়ার্ড চাচ্ছি।তারপর সেগুলোকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেবো। আর কোনো কথা নয়।ধমকে উঠেন পেশিয়া।
কাঁপা কাঁপা হাতে হাতের ডিভাইসটি তুলে প্রেসিডেন্টকে কল করেন জেনারেল লরেঞ্জো! পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে ফিনিক্স; বিজয়ের হাসি, মুক্তির হাসি।

The Matrix (1999)

IMDb Rating: 8.7/10

রিভিউয়ার: শুভ সালাউদ্দিন

মুভিটা হলো একদল হ্যাকারকে নিয়ে, যারা খুঁজে পেয়েছে যে তারা যেখানে বসবাস করছে, যেটাকে রিয়েলিটি ভাবছে, সেটা আসলে এক ইল্যুশন।তারা এক ধরনের ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে আছে, যেখানে সবাইকে প্রোগ্রাম করা হয়েছে সিস্টেমকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার জন্য।এই হ্যাকারদল ফ্রেমওয়ার্ক ভেঙে সবাইকে মুক্ত করার জন্য লড়াই করছে।তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে শক্তিশালী এজেন্ট যারা একই রকম দেখতে।

মুভিটা নিয়ে এর চেয়ে বেশি বলা সম্ভব না।শুধু এটা বলতে পারি, মুভিটা দেখলে রিয়েলিটি সম্পর্কে অন্যরকম এক ধারণা পাবেন।

"You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After nine years, you know what I realize? Ignorance is bliss"

কী ভয়ংকর কথা ভাবতে পারেন!!

সায়েন্স ফিকশন লেখার টিপস

সাইফুল ইসলাম টিপু

> **Science fiction is any idea that occurs in the head and doesn't exist yet, but soon will, and will change everything for everybody, and nothing will ever be the same again.**

-Ray Bradbury

১.

বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সাহিত্য জগতে হয়তো অনেকে এই জগতকে সাহিত্য জগতের অংশ হিসেবে মেনে নিবেন না, হয়তো উচিতও না আমরা দুই ধারার লেখনী দেখতে পাই।প্রথম ধারায় আমরা দেখি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নীতি, তত্ত্ব, হাইপোথিসিস প্রভৃতি নিয়ে লেখা।এই লেখাগুলো সাধারণ মানুষের মাঝে জটিল বিজ্ঞানকে করে তোলে সহজবোধ্য, জনপ্রিয়।

এই মূল ধারার বিজ্ঞান নিয়ে লেখালেখির সাথে অনেক আগে থেকেই বিকশিত হয়েছে আরেকটি ধারা। সায়েন্স ফিকশন বা বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী।এই গল্পগুলোতে থাকে সাধারণত তিনটি বিষয়ঃ

ক) বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব, হাইপোথিসিস বা কাল্পনিক কোনো কন্সেপ্টের ব্যবহারিক প্রকাশ; সুবিধা, অসুবিধা নিয়ে গল্প

খ) লেখকের নিজস্ব সাহিত্য জ্ঞান, কল্পনা, ওই তত্ত্ব নিয়ে তার অনুভূতি।

গ) গল্পে ফুটে ওঠা বিষয়বস্তুর বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান।

চলুন বিজ্ঞানসাহিত্যের এই শাখাকে নতুন লেখকগণ কিভাবে সমৃদ্ধ করতে পারেন তা নিয়ে আলোচনা করা যাক।প্রথমে সায়েন্স ফিকশনের জনরাগুলো জেনে নেই।

১। এলিয়েন - এলিয়েন নিয়ে বিস্তর সায়েন্স ফিকশন লেখা হয়েছে। এখনো চলছে। এই জনরাটি বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়। এলিয়েন নিয়ে প্রচলিত ধারনা এই যে ভিনগ্রহ থেকে সবুজ রঙের মানুষ এসে পৃথিবীতে হাজির হবে আর সব মেরে কচুকাটা করবে। অথবা তাদের কিছু অদ্ভুত ক্ষমতা থাকবে যা দিয়ে কাউকে সাহায্য করবে।কিন্তু এই এলিয়েন নিয়ে আরো শতশত প্লটের গল্প লেখা সম্ভব। যেমন-

ক) প্রথম সাক্ষাত – এটা হতে পারে পৃথিবীর মানুষ ভিনগ্রহে গিয়ে এলিয়েন প্রজাতির সাথে প্রথম সাক্ষাত অথবা ভাইস ভার্সা। দুই বুদ্ধিমান প্রজাতির ভেতর প্রথম সাক্ষাতে কি ধরণের মিথস্ক্রিয়া হতে পারে এটা নিয়ে অনেক অভিনব গল্প লেখা সম্ভব। ড্রেক ইকুয়েশন অনুযায়ী কেবল মাত্র আমাদের গ্যালাক্সিতেই ১ হাজার থেকে ১০ কোটি সভ্যতা থাকা সম্ভাবনা প্রবল যেখানে এমন বুদ্ধিমান প্রাণের উদ্ভব হয়েছে যাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব।সেক্ষেত্রে প্রথম সাক্ষাত নিয়ে ব্যতিক্রমী প্লটের গল্প লেখার অনেক সুযোগ রয়েছে। দরকার কেবল কল্পনাকে লিখে প্রকাশ করা।

খ) সংঘাত – এলিয়েনে সাথে সংঘাত নিয়ে চমৎকার প্লটের ভিন্ন মাত্রার গল্প হতে পারে।

গ) ভিন্ন ধরণের প্রাণ – কার্বন বেইজড লাইফ ফর্মের বাইরে গিয়ে সিলিকন বেইজড বা কাছাকাছি অন্য কোনো মৌলকে বেইজ ধরে যদি কোনো প্রাণের উদ্ভব হয় তবে তার প্রকৃতি কেমন হবে, তা নিয়ে চমৎকার গল্প হতে পারে।

ঘ) যোগাযোগ – এলিয়েনের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সংযোগ খুবই দুরূহ ব্যাপার। পৃথিবীতেই অনেক প্রাণী আছে বুদ্ধিমান। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমত্তা মাপার স্ট্যান্ডার্ড কোনো স্কেল নেই। ব্রেনের আকার, পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, বাস্তুসংস্থান ইত্যাদির উপর নির্ভর করে আপাতভাবে অনুমান করা হয় তাদের বুদ্ধিমত্তা।কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের সাথে ভাব বিনিময় বা কমন ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর সাথে যোগাযোগ আরো কঠিন। তবে যেহেতু এই ক্ষেত্রে অসীম সম্ভাবনা রয়েছে, তাই চমকপ্রদ নতুন আইডিয়া নিয়ে গল্প লেখা যেতে পারে। যদি তারা প্রযুক্তি-বিদ্যায় পারঙ্গম হয় তবে হতে পারে মৌলিক সংখ্যা ভিত্তিক কোডের মাধ্যমে, পাই এর মানের মাধ্যমে, পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে, আলোকতরঙ্গের মাধ্যমে। ক্রপ-সার্কেল ব্যাখ্যা নিয়েও ভালো গল্প হতে পারে। আমার একটি গল্প আছে "ক্লোরোপ্লাস্টিক মেসেজ" সেখানে অজানা দূরত্বের একটি গ্রহে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে শক্তি তৈরি করে তারা বেঁচে থাকে। সেখানে দেখিয়েছি, তারা স্ট্রিং থিউরির মাধ্যমে কোয়ান্টাম লেভেলে পৃথিবীর গাছের পাতার ক্লোরোপ্লাস্টের ভেতর একটি প্যাটার্ন তৈরি করে মানুষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছিলো। মূল কথা হচ্ছে, এলিয়েনের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম/প্রক্রিয়া নিয়ে প্রচুর সুযোগ রয়েছে গল্প লেখার।

ঙ) প্রযুক্তি – এলিয়েন প্রযুক্তি নিয়ে অনেক গল্প লেখা যেতে পারে।যেগুলো আমাদের সাথে তারা শেয়ার করতে চায়।এক্ষেত্রে অনেক থ্রিলিং ব্যাপারও যুক্ত করা সম্ভব।

চ) এছাড়াও এলিয়েন নিয়ে আরো অনেক ভিন্ন ধরণের গল্প লেখা সম্ভব। তাদের সমাজ ব্যবস্থা, তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, তাদের ভেতর ক্ষমতার প্রতিযোগিতা। মূল কথা, মানুষকে নিয়ে যত ধরণের গল্প হতে পারে তার চেয়ে ঢের অনেক অনেক বেশি গল্প লেখা সম্ভব এলিয়েন নিয়ে।

২। ভবিষ্যতের পৃথিবী – সায়েন্স ফিকশনের এই ধারাটি বেশ জনপ্রিয়। যেহেতু ভবিষ্যতের পৃথিবী কেমন হবে সে ব্যাপারে আমরা কেবল অনুমান করতে পারি, তাই এই বিষয়ে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের পৃথিবী নিয়ে গল্প লেখার একটি সুবিধা হচ্ছে, এখানে ভুল ধরার সম্ভাবনা কম থাকে। এ বিষয়টা ঐতিহাসিক গল্প লেখার ক্ষেত্রে সম্ভব না। কেউ এসে বলতে পারবে না, ভবিষ্যতে এমনটি হবে না।তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এক্ষেত্রে টাইম-ফ্রেম খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।কেউ হিউম্যান ইভোলিউশন নিয়ে লেখে আর টাইম-ফ্রেম ধরে নেয়, একশ, দুইশ কিংবা পাঁচশ বছর ভবিষ্যৎ, তবে তা যথার্থ হবে না।কারণ ইভোলিউশন অত্যন্ত ধীর একটি প্রক্রিয়া। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর সময়ের ব্যাপার। আবার যদি লেখা হয়, একহাজার বছর পর কোয়ান্টাম কম্পিউটার আবিষ্কার হয়েছে, সেটিও যথার্থ নয়।কারণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার আবিষ্কারেরে খুব কাছে আমরা চলে এসেছি।তবে যদি এই ধরণের টাইম-ফ্রেম ব্যবহার করা হয়, সেখানে এর আপাত যৌক্তিক একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো উচিত। অ্যাপোক্যালিপটিক, পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপটিক আইডিয়া নিয়ে দারুণ সব গল্প লেখা যেতে পারে।আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন, সেখানে টিকে থাকা, প্রেম ভালোবাসা, সমাজ ব্যবস্থা নিয়েও ভালো গল্প হতে পারে।এবিষয়ে মোঃ. জাফর ইকবালের ভালো কিছু সায়েন্স ফিকশন আছে। বিখ্যাত মুভি টার্মিনেটর সিরিজেও এই বিষয়টা ভালো ভাবে দেখানো হয়েছে।

৩।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা – এই বিষয়ে গল্পের আইডিয়া প্রচুর।আইজাক আজিমভের অনেক গল্প আছে রোবটিক্সের উপর। জাফর ইকবালের কপোট্রনিক সুখ দুঃখ তো একটি মাইলস্টোন এ ক্ষেত্রে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ও এর প্রভাব নিয়ে ভালো গল্প হতে পারে। একটি উদাহরণ দেখা যাক, মনে করা হচ্ছে আগামী দুই দশকের ভেতর গার্মেন্টস সেক্টর প্রায় পুরোটাই অটোমেটেড হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের মতো দেশগুলো বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ কর্মী বেকার হয়ে যাবে। এই সামাজিক বিপর্যয় নিয়েও সায়েন্স ফিকশন গল্প হতে পারে।

একটা বিষয় মনে রাখতে হতে, মেশিন লার্নিং, অটোমেশন ও রোবটিক্সের যেমন আশীর্বাদ আছে তেমনি আছে অন্ধকার দিক। এই বিষয়টি নিয়ে নোয়া হারারির একটি বই আছে, “21 lesson in 21st century” দারুণ এনগেজিং একটি বই। কারও লাগলে আমাকে নক করতে পারেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশের সাথে তাদের বোধ, আবেগ কিংবা ব্যক্তিসত্তার বিকাশ কি ঘটতে পারে? সেক্ষেত্রে তাদের সাথে মানুষের সংঘাতের রূপ কেমন হবে? আজিমভের আই-রোবটে ভালো ভাবে দেখানো হয়েছে। তার ফাউন্ডেশন সিরিজের বড় একটা অংশ এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবটিক্সের বিকাশ ও প্রভাব নিয়ে।হুমায়ূন আহমেদের সিডিসি তো এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঈরিনা বইতে চমৎকারভাবে তিনি এই বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন।

৪।মহাকাশ ভ্রমণ – এই বিষয় নিয়ে আসলে বলে শেষ করা যাবে না। সম্ভবত সায়েন্স ফিকশনে সবচেয়ে জনপ্রিয় টপিক। স্টার ওয়ার্স, ব্যাটেল স্টার গ্যালাক্টিকা, স্টার ট্রেক, স্টার গেইট এই সিরিজগুলোতে হাজার হাজার এপিসোড নির্মিত হয়েছে এই মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে। মহাকাশ ভ্রমণের বিপদ, সম্ভাবনা, এলিয়েনের সাথে সংযোগ, ইত্যাদি নিয়ে অনেক ভালো গল্প লেখা সম্ভব।ফাউন্ডেশন সিরিজ প্রায় পুরোটা জুড়েই এই মহাকাশ ভ্রমণ।এ বিষয়ে লিখতে গেলে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্বের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।আলোর বেগে ভ্রমণ করে এসে কেউ যদি দেখে তার বাবা তার চেয়ে ছোট হয়ে গেছে তবে ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে খাপ খাবে না, হাস্যকর হয়ে যাবে।

৫।বিকল্প ইতিহাস – খুবই দারুণ একটি টপিক।মূল থিম হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের যে কোনো অসময়ে যা ঘটেছে যদি তেমনটি না ঘটত, তবে কি হতো – এই নিয়ে গল্প।উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, 'The Man in the High Castle' সিরিজটি। এখানে দেখানো হয়েছে- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যদি হিটলার বাহিনী জিতে যেত তবে মানব সভ্যতার গতিপথ কোনদিকে মোড় নিত।এই টপিকে লেখার জন্যে অনেক ভালো রসদ আছে। যদি মানব সভ্যতা পারমানবিক যুগে প্রবেশ না করতো? যদি আইনস্টাইন, হাইজেনবার্গ, ম্যাক্সওয়েল কিংবা নিকোলা টেসলা ছোট বেলাতেই মারা যেত তবে সভ্যতার বর্তমান অবস্থা কেমন হতো? যদি প্রাকৃতিক গ্যাস বা তেল আবিষ্কার না হতো বা এর ব্যবহার আমরা না জানতে পারতাম তবে কেমন হতো প্রযুক্তিগত অবস্থা? যদি আকাশে উড়ার প্রযুক্তি আমরা না পেতাম, তবে কেমন হতো বর্তমান যুগের যোগাযোগ ব্যবস্থা? অথবা, যদি এখনো কাগজের মুদ্রার প্রচলন না হয়ে সোনা রূপার মাধ্যমে লেনদেন হতো তবে কেমন হতো বর্তমানের অর্থনৈতিক অবস্থা? যদি ১৯৭০ এর দিকে প্রেসিডেন্ট নিক্সন পেট্রো-ডলারের প্রচলন না করতেন, যদি এর পরিবর্তে পেট্রো-ফ্রাংক বা পেট্রো-রুবল বা পেট্রো-রুপির প্রচলন হতো তবে আমেরিকার ডলারের পরিবর্তে অন্য মুদ্রা পৃথিবীর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো।কেমন হতো সেই বিশ্ব? বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এই বিষয়ে কল্প-গল্প লেখার।তবে বিজ্ঞানের পাশাপাশি ইতিহাসের উপরেও ভালো দখল থাকতে হবে এই বিষয়ে লেখার জন্যে।

৬।মাত্রা/সময়/স্থানকালের ফিল্ড/সময় ভ্রমণ – আমার খুব প্রিয় বিষয়।এ বিষয়ে প্রচুর গল্প লেখা হয়েছে।আরও অনেক লেখা সম্ভব। তবে এ বিষয়ে লিখতে হলে পদার্থবিজ্ঞানে মোটামুটি বেসিক ধারণা থাকতে হবে।টাইম মেশিন বানিয়ে অন্য গ্রহে ভ্রমণ করে আসলাম, এমন হাস্যকর গল্পও পড়েছি।

৭।প্যারালাল বিশ্ব – খুবই মজার একটি বিষয়।প্রতিটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকলে, যেটি ঘটে না সেটি প্যারালাল আরেকটি বিশ্বে ঘটছে, এ নিয়ে অনেক গল্প আছে।অসীম সংখ্যক প্যারালাল বিশ্ব নিয়ে গল্পের আইডিয়াও অসীম।

৮।জীববিজ্ঞান – এই বিষয়েও ভালো আইডিয়া হতে পারে।মানব-ক্লোনিং , ক্যান্সারের ঔষধ, জিন থ্যারাপি ও মোডিফিকেশন, হিউম্যান-কম্পিউটার ইন্টারেকশন, ভাইরাস সংক্রামণ ও প্রতিষেধক, জীবাণু যুদ্ধ, সুপার হিউম্যান, ডাক্তারি-বিদ্যায় যুগান্তকারী কোনো আবিষ্কার, কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি নিয়ে বিশাল রেঞ্জের গল্প লেখার সুযোগ আছে। জেনেটিক্স, নতুন ধরণের ঔষধ আবিষ্কার, মাইক্রো অর্গানিজম, নতুন ধরণের এনজাইম নিয়ে ভালো গল্প লেখা যেতে পারে। মানুষ অমরত্ব কিভাবে পেতে পারে, এর প্রভাব কী কী হতে পারে- চমৎকার টপিক।

৯।উদ্ভিদবিজ্ঞান – নতুন প্রজাতির কাল্পনিক উদ্ভিদ জগত, তাদের ইভোলিউশন, এখনো অনাবিষ্কৃত প্রজাতির সাথে সংযোগ স্থাপন, সমুদ্রের গভীরে তাদের জীবনচক্র ইত্যাদি নিয়ে ভালো গল্প হতে পারে।এলিয়েনে সাথে এই উদ্ভিদবিজ্ঞানের মিশ্রণে ভালো গল্প লেখা সম্ভব।

১০।ন্যানো টেকনোলজি – বিষয়টি অপেক্ষাকৃত নতুন।আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র দিনদিন ছোট হয়ে আসছে।সামনে আসছে ন্যানো-টেকনোলজির যুগ। মনে করা হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে। ন্যানো-বোট, ন্যানো-কম্পিউটার।

১১।সামাজিক-রাজনৈতিক ও যুদ্ধ – এই বিষয়েও ভালো গল্প লেখা যেতে পারে।নতুন ধরনের যুদ্ধাস্ত্র, প্রযুক্তি ও আবিষ্কার নিয়ে রাজনীতি ও সংঘাত, এদের সামাজিক প্রভাব নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লেখা যেতে পারে।সাই-ফাই থ্রিলারও লেখা হয়েছে এ বিষয়ে অনেক।

১২।সেক্স সেক্সোয়ালিটি - এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দেশে সামাজিক ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ আছে, কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। তবে এই ডোমেনে প্রচুর গল্প লেখা সম্ভব।নর-নারীর, নর-নর, নারী-নারীর ও ট্রান্স-সেক্সচুয়ালদের ভেতর ভালোবাসার রসায়ন নিয়ে বিশ্ব সাহিত্যে অনেক গল্প লেখা হয়েছে।প্রাণী জগতের রি-প্রোডাকশন, জেনেটিক সমস্যা, সন্তান জন্মানোতে অক্ষমতা নিয়ে ভালো গল্প লেখা সম্ভব।

শেষ কথা হলো, আরও অসংখ্যা বিষয়ে কল্প-গল্প লেখা যেতে পারে এবং হচ্ছেও।শুধু কল্পনাকে গুরুত্ব দিতে হবে, সেই সাথে যুক্তি।

২.

মূল লেখায় যাওয়ার আগে একটা বিষয় পরিষ্কার করে বলতে চাই, এই লেখার অনেক পয়েন্টের সাথে অনেকের মতামত ও অভিজ্ঞতা নাও মিলতে পারে। লেখক হিসাবে যে অল্প কিছু অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে সেটিই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি মাত্র, এর বাইরেও অনেক কিছু আছে।

১) সাধারণত সায়েন্স ফিকশন ছোট গল্পের আকার হয় ২০০০ - ৭৫০০ শব্দের, গড়ে প্রায় ৭ থেকে ২৫ পৃষ্ঠা।তবে ফেসবুকের যুগে এটা যে ধ্রুব সত্য তেমনটি নয়।ব্যক্তিগত অভিমত একটি সার্থক ছোট সায়েন্স ফিকশন গল্প লিখতে হলে কমপক্ষে ৫০০০ শব্দের হওয়া চাই।

২) সায়েন্স ফিকশন গল্পে অবশ্যই গল্প থাকতে হবে। মোটা-দাগে গল্প দুই ধরনের হয়। সাহিত্যে ভরপুর ও কাহিনী নির্ভর। সায়েন্স ফিকশন গল্পে পাঠক সাধারণত প্লট দিয়েই বেশি আকৃষ্ট হয়।গুরুগম্ভীর সাহিত্য ও ভাষার কারুকাজ না হয় অন্য জনরার জন্যেই সংরক্ষিত থাকুক।সায়েন্স ফিকশন হয়ে উঠুক নিত্য-নতুন চমকপ্রদ কাহিনী ও টুইস্টে ভরপুর জমজমাট গল্প।

৩) গল্পের শুরুটা হতে হবে চমকপ্রদ, যেন পাঠককে শুরু থেকেই গল্পের ভেতর গেঁথে ফেলা যায়।ফুল-পাখি, লতাপাতার বর্ণনা না হয় পরেও দেওয়া যাবে। ব্যতিক্রম হলে পাঠক কিছুদূর পড়ে বিরক্ত হয়ে পড়া ছেড়ে দিতে পারে।প্রয়োজনে গল্পের যে অংশটা খুব জমজমাট সেটিকে শুরুর দিকে নিয়ে আসা যেতে পারে।

৪) শুরুতেই খুব বেশি চরিত্র নিয়ে আসলে পাঠকের মনোযোগ বারবার ছুটে যায় চরিত্রগুলোর সাথে পরিচয় হতেই।তাই প্রথম ৪/৫ পৃষ্ঠায় ২ থেকে ৩ টির বেশি চরিত্র না আনাই ভালো।

৫) একটি সায়েন্স ফিকশন গল্পে মূলত তিনটা ভাগ থাকে। ক্রাইসিস, ক্লাইম্যাক্স ও ফিনিশিং।শুরুর দিকে একটি জটিলতা বুনতে হবে, ধীরে ধীরে তাকে ক্লাইম্যাক্সের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ও শেষে অবশ্যই একটি ভালো ফিনিশিং থাকা চাই।

৬) এক ধরনের সায়েন্স ফিকশন গল্প ক্লাইম্যাক্স পর্যন্তই রেখে দেওয়া হয়।এক্স ফাইলের জনপ্রিয় টিভি সিরিজ অনেকগুলো গল্প আছে এমন।হুমায়ূন আহমেদের কিছু গল্প আছে খুব জমিয়ে এনে শেষে "প্রকৃতি রহস্য পছন্দ করে" এমন একটি বাক্য দিয়ে গল্পটি অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছেন কিংবা গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারটা দিয়ে পাঠকের কাঁধে ছেড়ে দিয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে সায়েন্স ফিকশনের এ ধরণের এন্ডিং আমার পছন্দ নয়।

৭) ক্রাইসিস, ক্লাইম্যাক্স ও ফিনিশিং - ক্রমটি যে ঠিক এমন হতে হবে সেটিও নয়।অনেক সময় ফিনিশিং অংশটা প্রথমে নিয়ে এসে গল্পে ভিন্ন মাত্রা আনা হয়। এটিও ভালো একটি টেকনিক। এই ধরনের লেখা লিখতে গেলে প্রথমে পুরো গল্পটি লিখে তারপর এর অধ্যায়গুলোকে পুনরায় সাজানো যেতে পারে। এই ধরণের একটি গল্পের ভালো উদাহরণ হচ্ছে, কলকাতার ঋজু গাঙ্গুলীর 'জিরো' গল্পটি। এই গল্প শুরুই হয়েছে অধ্যায়-১০ থেকে, পরে ৯ ও তার পরে ৮ এভাবে এগিয়েছে।

৮) সায়েন্স ফিকশন গল্পে সায়েন্স থাকতে হবে। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক, পীর সাধুর কেরামতি, আধ্যাত্মিক কিছু আনা উচিত না। কাল্পনিক উপাদানগুলি সাধারণত বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে।তবে বেশি জটিল যেন না হয়ে যায়।একটা বিষয় মনে রাখতে হবে সায়েন্স ফিকশন গল্প লিখছেন, বৈজ্ঞানিক জার্নাল নয়।

৯) চরিত্রগুলো যেন বাস্তব-ধর্মী হয়। নিজেকে ঐ চরিত্রে ঐ পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে কল্পনা করে লিখতে হবে।একজন দক্ষ লেখক একজন ভালো অভিনেতা। তাঁর যেকোনো চরিত্রে ভালো অভিনয় করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

১০) যেহেতু ছোট গল্প নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই কোনো কিছু রিপিট করা যাবে না।প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য গুরুত্বপূর্ণ, অর্থপূর্ণ ও অপূর্ব হতে হবে।প্রতিটি বাক্যের সাথে পরবর্তী বাক্যের একটি সম্পর্ক থাকতে হবে, যেন সম্পূর্ণ গল্পটি একটি মালা, প্রতিটি বাক্য একটি করে পুঁতি।

১১) অনেকসময় গল্পের প্রয়োজনে অতীতের কোনো ঘটনা কিংবা অন্য কোনো ঘটনার বর্ণনা নিয়ে আসতে হয়।খেয়াল রাখতে হবে তা যেন বর্তমান ঘটনা প্রবাহকে ছাড়িয়ে না যায়।সেটি হতে হবে পরিমিত; না হলে পাঠক খেই হারিয়ে ফেলতে পারে।

১২) এক গল্পে খুব বেশি ঘটনাপ্রবাহ না আনাই ভালো, এতে পাঠক একটি কেন্দ্রে ফোকাস থাকে। অন্যথায় গল্পের কোন মূল বিষয় থাকে না। যদি গল্পের প্লট এমন হয় যে অনেক অনেক ঘটনাপ্রবাহ চলে আসছে, তাহলে সেটিকে উপন্যাসে রূপ দিন।

১৩) একজন লেখকের পক্ষে বিজ্ঞানের সকল বিষয়ে একইসাথে পারদর্শী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে কি নিজের বিষয়ের বাইরে কিছু লেখা যাবে না? একজন ডাক্তার কি ফিজিক্সের বিষয়ে নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লিখতে পারেন না? অবশ্যই লিখতে পারেন। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যে বিষয়টি নিয়ে সায়েন্স ফিকশন লিখা হচ্ছে সেই বিষয়ের অভিজ্ঞ কারো সাথে খুঁটিনাটি আলোচনা করা।

১৪) শতশত বছর ধরে হাজার হাজার লেখক সায়েন্স ফিকশন লিখছেন। বর্তমানে একেবারে মৌলিক প্লট তৈরি করা অনেক দূরহ ব্যাপার। যদি ভাবনায় ভালো কোনো আইডিয়া আসে, তবে চট করে লিখে না ফেলে একটু ভাবুন। গুগলে কয়েকদিন ঘাটাঘাটি করুন, গুডরিডসে ঘুরাফেরা করে দেখুন এই বিষয়ে আগে লেখা হয়ে গেছে কি না। যদি না হয়ে থাকে, ভেরী গুড, লেখা শুরু করে দিন। আর যদি দেখেন যে এই প্লটের গল্প লেখা হয়ে গেছে, তাহলে এটিকে ঘুরিয়ে অন্য প্লটে রূপান্তরিত করুন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এই পদ্ধতি ফলো করি। এই কারণে আমার গল্পের সংখ্যা কম হলেও প্রতিটি গল্পের থিম ব্যতিক্রম কিংবা প্যাঁচানো।

১৫) একটি সায়েন্স ফিকশন গল্পে মূল থিমের পাশাপাশি আরও কয়েকটি গৌণ থিম থাকতে পারে। আমার প্রায় সব গল্পেই এই পদ্ধতি অবলম্বন করি। একটি নতুন থিম মাথায় আসলে সেটি নিয়ে সাথে-সাথে গল্প লিখে ফেলি না। আরও কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করি। ততদিনে আরেকটা থিম মাথায় চলে আসে এটি নিয়েও লিখে ফেলি না, অপেক্ষা করতে থাকি। এভাবে ৩/৪ টা থিক মাথায় জমা হলে ভাবতে বসি সবগুলোকে কিভাবে এক গল্পে নিয়ে আসা যায়। এই কারণে আমার লেখা গল্পগুলোতে ভিন্নধর্মী ভিন্ন ভিন্ন থিমের সমাবেশ ঘটে ও গল্পটি জটিল ধরণের হয়।

১৬) গল্পের প্রতিটি পাঠক একজন লেখকের প্রতিদ্বন্দ্বী। পাঠক যখন গল্পটি পড়তে থাকে, অবচেতন মনে তিনিও গল্পটি লিখতে থাকেন। যদি লেখকের লেখার সাথে পাঠকের লেখা মিলে যায়, তবে তিনি তাতে আনন্দ পান না। কিন্তু যদি না মিলে, পাঠককে যদি লেখক ধোঁকা দিতে পারেন, তবে হেরেও পাঠক আনন্দিত হন। এটি একটি লেখক-পাঠক মাইন্ড গেম। পাঠককে যথা সম্ভব ধোঁকা দেওয়া, চমকিত করাই একটি গল্পের সার্থকতা।

১৭) গল্পের বিষয়বস্তুর ব্যাপারে গভীর ধারণা থাকতে হবে। এর জন্যে বিস্তর পড়াশোনা ও গবেষণা করতে হবে। উইকিপিডিয়া অনেক উপকারী একটি সাইট। এমন কোনো বিষয় নেই যে এখানে পাওয়া যায় না। এটাতে প্রচুর সময় দিতে হবে। আরেকটি বিষয় খুব কাজের, একটি বিষয় নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা বেশ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। যদি এতো সময় দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে ইউটিউবে রিলেটেড বিষয়ে ভিডিও দেখতে পারে। একটি ১০ মিনিটের ভিডিও অনেকসময় ২০০ পৃষ্ঠার বই পড়ার চেয়েও বেশি তথ্যসমৃদ্ধ হতে পারে।

১৮) সায়েন্স ফিকশন গল্প লিখতে হলে কেবল সাই-ফাই গল্প পড়লেই চলবে না, সেই সাথে সায়েন্স রিলেটেড ডকুমেন্টারি, মুভি, টিভি সিরিয়াল ও শর্ট ফিল্ম দেখা উচিত। ডকুমেন্টারির জন্যে বিবিসি ডকুমেন্টারি বেশ ভালো মানের। ইউটিউবে DUST, TheCGBros, SciShow ইত্যাদি বেশ কিছু ভালো চ্যানেল আছে। সেগুলো সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন।

১৯) সৃষ্টিশীলতা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। সমালোচনাকে গ্রহণ করতে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় লেখা ফাইনাল করার আগে কয়েকজনকে বেটা রিডিং করিয়ে নিলে। তারা যে ইনপুটগুলো দিবে সেগুলোকে পজিটিভলি নিয়ে লেখাটিকে আরো সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

২০) সম্পাদনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। অভিজ্ঞ সম্পাদক একটি লেখাকে অল্প পরিবর্তন করে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন। আমার একটি গল্প কলকাতার কল্প-বিশ্ব জমা দিয়েছি প্রায় ৪ মাস হলো। কম করে হলেও ৫ বার লেখা পরিবর্তন করতে হয়েছে, এখনো ফাইনাল হয়নি। সম্পাদকের সাথে প্রায় প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা করে আলাপ আলোচনা চলে গল্পের কোথায় কোথায় আরও পরিবর্তন করতে হবে।

২১) সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গল্পের নাম। এই বিষয়ে বেশি কিছু না বলে একটা উদাহরণ দেই। একটি গল্প লিখেছিলাম, "কালের অনিশ্চয়তার সূত্র" নামে। কয়েকটি ব্লগে ও ফেসবুক পেইজে পোষ্ট করেছি। কয়েকজন মাত্র পড়েছে। এই গল্পটি কল্প-বিশ্বে জমা দিলাম, সম্পাদক বললেন, এই নামটি ঠিক গল্প গল্প লাগছে না। বরং অনেকটা প্রবন্ধ টাইপ হয়ে গেছে। তাঁর সাথে কয়েকদিন আলাপ করে নাম পরিবর্তন করে রাখলাম "অকালচক্রের কাঁটা" তারপর এই গল্পটি বেশ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। তাই গল্পের নাম খুব ভেবে চিন্তে দেওয়া দরকার।

সবশেষে, ভালো সায়েন্স ফিকশন গল্প লিখতে হলে ভালো সায়েন্স ফিকশন গল্প পড়তে হবে, বেশি বেশি করে পড়তে হবে। পড়ুন, পড়ুন, পড়ুন তারপর লেখায় হাত দিন।

সময়ের অভিশপ্ত জগৎ

হৃদয় হক

১.

অনেকটা উদাসীন হয়ে হাঁটছে এল. নিনো। মাথায় ঘোরাঘুরি করছে নানা চিন্তাভাবনা।২১৩৬ সাল পৃথিবী অনেক আধুনিক। হাঁটতে হাঁটতে রেললাইনে উঠে পড়ল সে।নিরাপত্তাও বেশ উন্নত। কোনো সমস্যা নেই বললেই চলে।নিনো একজন বিজ্ঞানী;তার সব জায়গায় প্রবেশের অনুমতি আছে।রেল চলার সময়ও সে রেললাইনে থাকতে পারবে কারণ সিস্টেম জানে যে বিজ্ঞানীরা ভুল করে না।যাই হোক, নিনো বেখেয়ালি মনে হেঁটেই চলেছে।হঠাৎ খেয়াল করলো - একটা ট্রেন চলে এসেছে।অতি নিকটে এসে গেছে! বড় বড় চোখে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে আছে।মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।বড় বড় শ্বাস ছেড়ে হাঁপিয়ে উঠেছে সে।ট্রেনের আওয়াজ আর ইঞ্জিনের গন্ধ ছাড়াও অন্য একটি গন্ধ তার নাকে আসছে।বেশি ভয় পাওয়ায় রেল লাইন থেকে পা সরাতে পারছে না সে।মনে মনে ভাবছে -এ ভাবেই শেষ হবে তার জীবন!'

ট্রেনের সাথে ধাক্কা খাবে খাবে এমন সময় মনে হল কে যেন তাকে ডাকল।

কোনোকিছুর সাথে ধাক্কা খেয়ে অস্থির অবস্থায় চোখ মেলে সে। চোখ মেলে অবাক হয়ে দেখে - কিছুই হয়নি তার! রেল লাইনে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে!

কি হল? কোনো স্বপ্ন দেখল কি সে!

হয়তো বেশি ক্লান্ত হয়ে উলটা-পালটা দেখেছে।সামনে দূর থেকে একটা ট্রেন ঠিকই আসছে।লাইন থেকে নেমে পড়ল সে।ট্রেনটা তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় ট্রেনের নাম্বারটা তার নজর কাড়ে। আজব! সেই একই নাম্বার! কাকতালীয় ব্যাপার ভেবে উড়িয়ে দেয় নিনো।খুবই ক্লান্ত সে, বাসায় যেতে হবে।আগামীকাল বিজ্ঞানসভা আছে।

বাসায় আসতে যানবাহন ব্যবহার করা যেত তবে সে হাঁটতে ভালোবাসে।অবশ্য আজকাল হাঁটাহাঁটিও অস্বাভাবিক কাজ, কেউই তেমন হাঁটে না।তবে কাজ কম করে মোটা না হবার জন্য নানা ট্যাবলেট রয়েছে, তা নিনোর অপছন্দ।তাই যানবাহনে কম চড়ে একটু বেশিই হাঁটে সে।এই বারো প্যাক বডিকে চব্বিশ প্যাক বানাতে

চায় না নিনো।নিনো শৌখিনও বটে; বাসায় অনেক পুরাতন জিনিসও রাখে। আর পকেটে মানিব্যাগ - তাতে অতি পুরাতন টাকা রেখেছে শখের বশে।অবশ্য সব কালেকশনই তার দাদার-দাদার আমলের।তার দাদা আর বাবার এই শখটা তারও হয়েছে। এই যুগে সবই ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম।এত আর্টিফিশালিটি নিনোর অতো ভালো লাগে না।বাসায় যাবার জন্য পা আগাতেই দেখে মাটিতে কি যেন পড়ে আছে। সে তুলতে গিয়ে অবাক।এটা কার ছবি? তাও কোনো এক মেয়ের! আগে তো দেখেছে বলে মনে পড়ছে না।তবুও মেয়েটাকে চেনা চেনা লাগছে তার।কে এই মেয়ে? এই যুগে আবার পাসপোর্ট সাইজ ছবি! তবে এটা কোনো পুরাতন ক্যামেরা দিয়ে তোলা তা নিনো নিশ্চিত।বাসায় গিয়ে তার পুরাতন কালেকশনের ক্যামেরাটা চেক করে সে।সপ্তাহখানেক আগে ঠিক করেছে এটা।মেয়েটির ছবি দেখে মনে হয় এই ক্যামেরায় তোলা। মেয়েটি দেখতে সুন্দর।তবে এটি যদি তার ক্যামেরাতেই তোলা হয় তবে নিজের ছবি কেন আগে নয়? আসলেই কি এই ছবি তার ক্যামেরা দিয়ে তোলা? আর কেনই-বা এই মেয়েটি তার পরিচিত লাগছে? আসলেই কি নিনো তাকে চিনে? ট্রেনের উদ্ভট ঘটনার পর এসব আর ভাবতে ভালো লাগছে না নিনোর।পরে মেয়েটির ব্যাপারে হিউম্যান ডাটাবেস থেকে জেনে নেবে ভেবে ঘুমাতে গেল সে। আগামীকাল সকাল সকাল মিটিং-এ যেতে হবে। তবে ঘুমানোর চেষ্টা করতে চাইলেও আজকের ঘটনা দুটো ভাবাচ্ছে তাকে।ভাবতে ভাবতে নিনো চলে যায় গহীন ঘুমের রাজ্যে।

২.

পুরাতন অ্যালার্ম ক্লকের আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গে নিনোর।এক সময় এ ঘড়িটা অনেক জোরে আওয়াজ করতো তা এখনের আওয়াজেই বোঝা যায়।যাইহোক, বিছানা ছেড়ে গোসল সেরে নেয় সে।তারপর প্রাতরাশ করে মিটিং এ যাবার সময় বের হতেই দেখে গাড়ি এসে হাজির। গাড়িটি এ.আই.(কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) যুক্ত।প্রতি মিটিং-এ সময়মত বিজ্ঞানীদের নিয়ে যায়।গাড়িতে ওঠার সময় ছবিটির কথা মনে হতেই ছবিটি পকেটে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসে নিনো। ৫-৬ মিনিটেই পৌছে যাবে। যেতে যেতে গাড়ির কম্পিউটারে নিউজের হেডলাইন চেক করতে থাকে।একটি হেডলাইন তাকে প্রচুর হাসায়।

কিছুদিন আগে ড. মরিসের সাথে অনেকটা ঝগড়ার মতো হয় নিনোর।ড. মরিস টাইম ট্র্যাভেলের ওপর রিসার্চ করছিলেন।এতে নিনোকে আমন্ত্রণ করেন তিনি।নিনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে বয়স ও পদমর্যাদা উভয় দিক থেকেই ছোট।বিজ্ঞানী মহলে প্রবেশের পর মোটামুটি টাইম ট্র্যাভেলের যত গবেষণায় তাকে ডাকা হয়েছে সবটায় গিয়েছে সে।এমনকি নিজেও গবেষণা করেছে নিনো।তবে কোনো এক্সপেরিমেন্টই সফল হয়নি।তাই নিনো জানে যে টাইম ট্র্যাভেল সম্ভব নয়।ফলে ড. মরিসের সাথে গবেষণা করে সময় অপচয় করতে চায় না সে।তবে নিনোর অভিজ্ঞতার জন্যে ড. মরিস নিনোকে অন্যদের থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।কিছুদিন আগেও বড় করে নিউজ বের হয়েছিল যে, ড. মরিস ও তাঁর টিম টাইম ট্র্যাভেলেরসত্যতা প্রমাণের অতি নিকটে পৌঁছে গেছেন। টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে দুজনের দ্বিমত থাকায় বেশ কথা কাটাকাটিও হয়েছিল তাদের মাঝে।নিনো অতীতের থেকে শিক্ষা নিয়ে টাইম ট্র্যাভেলের বিপক্ষে।আর আজকেই নিউজে দেখে ড. মরিস ও তার টিম বলেছেন টাইম ট্র্যাভেল সম্ভব নয়।

মিটিংয়ে পৌঁছাতেই একটি এ.আই. স্বাগত জানায় তাকে।সকলেই চলে এসেছেন। মিটিং-এ নতুন একজন বিজ্ঞানী এসেছেন আজকে।নাম, ডেলিসা লিওস্কি।২ বছর হল বিজ্ঞান মহলে প্রবেশ করেছে।নিনো থেকে ১-২ বছরের বড়; পদমর্যাদা নিনো থেকে একটু বেশি। সবার চেয়ে ছোট দেখে নিনোর মনে কষ্ট নেই।কারণ, তার কথায় কেউ কান দেয়না বলে মিটিং এ শুধু সে আসে আর যায়।তবে আজকের মিটিং এর মূল হলো মিস ডেলিসা।তিনি টাইম ট্র্যাভেলিং এর উপর রিসার্চ করছেন এবং তিনি সফল হবেন বলে আশাবাদী ।এই কারণে আজকের মিটিং বসা।এর আগে কখনো আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভায় টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে আলোচনা করেনি কেউ ।ড. মরিস ভালোমানের বিজ্ঞানী হলেও তিনি ফেলোশিপ গ্রহণ করেননি । টাইম ট্র্যাভেলিং নিয়ে মিটিং হবে শোনে লেইম লাগে নিনোর ।এই নিয়ে যে এই যুগে কখনো আন্তর্জাতিক সভা হবে কল্পনাও করেনি সে ।মিটিং শুরু হয় আর নিনো চলে যায় তার ভাবনার জগতে।এরকম বেকার মিটিং শুনে কান পঁচাতে চায় না নিনো।বিষয়টা ডেলিসার নজর কাড়ে।

মিটিং শেষ।নিনো তার অফিসে বসে ছবিটার দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে আছে।স্ক্যান করে হিউম্যান ডাটাবেস থেকে কোনো তথ্য পায় নি সে।এমন সময় মিস ডেলিসা নিনোর সাথে দেখা করতে এল।

ডেলিসা - 'আসতে পারি কি?

নিনো - অবশ্যই।

ডেলিসা - আপনার সাথে কিছু কথা ছিল।

নিনো -জ্বি,বসুন।আপনাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি?

ডেলিসা - শুনলাম আপনার টাইম ট্র্যাভেলের উপর গবেষণার অভিজ্ঞতা অনেক?

নিনো - হুম।

ডেলিসা - আসলে আমি আপনার সাথে টাইম ট্র্যাভেলনিয়ে গবেষণা করতে চাই।শুনেছি আপনি নাকি এখন এইসব নিয়ে আর গবেষণা করার ইচ্ছেতে নেই! ড. মরিসের সাথে কাজ করতে আপত্তি করেছিলেন।অবশ্য উনার প্রজেক্ট ফেইল হয়েছে।

নিনো - হ্যাঁ।আজ সকালেই পড়লাম।
ডেলিসা - আমি আমার গবেষণার কিছু পেপার নিয়ে এসেছি। আপনি দেখে নিন।মিটিং-এ তো আপনার কোনো মনোযোগ ছিল না।পেপার গুলো পড়েই দেখেন।ভালো লাগলে একত্রে গবেষণা করা যাবে।

এই বলে মুখে এক মলিন হাসি দিয়ে পেপারগুলো নিনোর দিকে এগিয়ে দেয় ডেলিসা।পেপার চেক করতে থাকে নিনো।একের পর এক তবে পেইজের যেন শেষ নেই।ভালোই গবেষণা চালিয়েছেন ডেলিসা। তার গবেষণা পত্রটি অন্যদের চেয়ে আলাদা। নিনোর ভালো লাগে সেটি। তবে যদি এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে মিস ডেলিসার মনের অবস্থা কী হবে ভেবে কষ্ট লাগে নিনোর।
নিনো - ঠিক আছে।আমি সাহায্য করতে রাজি।
ডেলিসা - অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। তা কালকে থেকে আসছেন?
নিনো - না, পরশু থেকে।
ডেলিসা - কারণ জানতে পারি?
নিনো - আজ ২২শে এপ্রিল, তাই লাইরিডস উল্কা বৃষ্টি দেখব।তাই সকালে ঘুম থেকে উঠতে অনেক দেরি হবে।
ডেলিসা - মানে? এই যুগে সরাসরি আকাশে তাকিয়ে দেখবেন? মানে, লাইট পলুশন তো আছেই তারপর এত বছরে মানুষের অসতর্কতায় বায়ুমণ্ডলে যে লেয়ার পড়েছে এতে তো ভালোভাবে তারাই দেখা যায় না।
নিনো - আমার বাসা থেকে ১ কিমি এর মতো পথ হাটলে আমার দাদার একটা জায়গা পড়ে। অনেকটা জঙ্গলের মতো। তিনি আর্টিফিশালিটি অতো পছন্দ করতেন না। তাই ওখানে তেমন আর্টিফিশাল জিনিস নেই।শুধু গেট টা আর্টিফিশাল।তাও আমাদের পরিবারের সদস্য ছাড়া বাহিরের কেউ সেখানে যেতে পারে না।
ডেলিসা - ওয়াও! আমারও উল্কাঝড় দেখার অনেক ইচ্ছা। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমিও কি আপনার সাথে যেতে পারি?

(প্রশ্নটি শুনে নিনো ঠুক করে ধাক্কা খেল। একজনকে প্রথম সাক্ষাতেই কোনোকিছুতে না করা যায় না। কিন্তু যদি ডেলিসা আসে তাহলে আর উপভোগ করা যাবে না ।তাছাড়া কেউ পাশে থাকলে কোনোকিছুতে মনোযোগ দেওয়াটা বেশ কষ্টকর হয়।তবে মানিয়ে নেয় নিনো)

নিনো - উম, ওকে।আমার কোনো আপত্তি নেই।রাতে বাসায় চলে আসুন।
ডেলিসা - ঠিক আছে।

এই বলে এক মিষ্টি হাসি দিয়ে রিসার্চ পেপার গুছিয়ে বিদায় নেয় মিস ডেলিসা।নিনোও বাসায় যাবার প্রস্তুতি নেয়।

রাত ১২ টা।বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নিনো।শীত শীত লাগছে তাই হাতে থাকা কফির মগে চুমুক লাগাচ্ছে সে। ডেলিসা আদৌ কি আসবে নাকি আসবে না ভাবছে সে। তবে বাসার সামনে গাড়ি থামার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে ডেলিসা চলে এসেছে।ডেলিসা তো প্রথমে নিনোর বাসাকে মিউজিয়াম ভেবে বসে।দেখতে যেমন পুরোনো ভেতরেও তেমন পুরাতন জিনিস ।এরপর দুজন তাদের স্লিপিং ব্যাগ নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওনা দেয়।
জঙ্গলে গিয়েই স্লিপিং ব্যাগ বের করে আকাশে তাকিয়ে শুয়ে পড়ে তারা।এখন শুধু উল্কার অপেক্ষা।তবে নিনোর মনে আবারও ভূত চেপে উঠেছে ।তার কেন জানি মনে হচ্ছে এর আগে সে কাউকে নিয়ে এমন ভাবে উল্কাবৃষ্টি দেখেছিল। আসলেই কি দেখেছিল নাকি শুধুই মনের ভুল? ভাবছে সে।ভাবতে ভাবতে দুটা উল্কা তার চোখে পড়ে।তখন ডেলিসা'র খুশি দেখে কে! প্রথম বার উল্কাঝড় দেখার সুযোগ হয়েছে তার। সাথে অনেক গুলো চেনা-অচেনা তারাও ।তবে নিনোর ভালো লাগছে না।কারও সাথে আগে আদৌ উল্কাবৃষ্টি দেখেছে, নাকি শুধুই কল্পনা- তার মাথায় ঠেকছে না । তার কেন জানি মনে হয় সে পাগল হয়ে যাচ্ছে।তিন নম্বর উল্কাটা বেশ বড় ছিল।এটি দেখেই ঘুমে চোখ লেগে আসে তার।

৩.

ভোরের আলো চোখে পড়তেই ঘুম ভাঙে ডেলিসার।নিনো এখনো ঘুমিয়ে আছে। পরে ডেলিসাই তাকে জাগিয়ে তোলে।
ডেলিসা - আপনার ঘুম কেমন হলো?
নিনো - এইতো ভালো।তবে আপনি এত তাড়াতাড়ি জেগে গেলেন যে?
ডেলিসা - হুম।আসলে ঘুম কেটে গেছে।রাতে ৯ টার মতন উল্কা দেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ।তবে আপনি বোধহয় আরো আগে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।
নিনো - হুম। তা, বাড়ি যাওয়া যাক। আজকে বিকালটা আমার বাসায় কাটান।
ডেলিসা - ঠিক আছে।অনেক গল্প করা যাবে।

এই বলে বাসার দিকে হাঁটা দেয় তারা।বাসায় এসে গোসল করে অন্য সব সেরে উঠতে উঠতেই দুপুর গড়িয়ে আসে। নিনো সাধারণত নিজেই খাবার পাকায়, যদিও তখন খাবার মানেই রেস্তোরা বা ট্যাবলেট। যা, হোক তবে ডেলিসা আজকে নিনোর হাতে খাবার বানানো দেখবেই ।তবে নিনোর কোনো কাজ কেউ দেখলে তার ইতস্তত বোধ হয় ।ডেলিসাও ছাড়বার পাত্র নয়।সেও আজ নিনোর বানানো খাবার টেস্ট করবে।

যাইহোক, নিনো খাবার বানালো । ঘরের মেহমানের আবদার ফেলতে নেই।

খাবার টেস্ট করে ডেলিসাতো অবাক;এমন রান্না একজন প্রফেশনালই পারেন।

ডেলিসা - বাহ! চমৎকার স্বাদ! কার থেকে শিখেছেন?
নিনো - আম্মু থেকে।
ডেলিসা - ওহ ।আন্টি ও আঙ্কেলরা কোথায় থাকেন?
নিনো - উনারা অন্য প্রান্তে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন।৬ বছর আগে এক দুর্ঘটনায় মারা যান।আর মা ৫ বছর আগে শরীর অসুস্থ হয়ে মারা যান।বাবার মৃত্যু মাকে কাতর করে তুলেছিল।তাই হয়তো তাড়াতাড়ি বাবার কাছে চলে গেলেন।
ডেলিসা - আমি সত্যিই দুঃখিত।
নিনো - সমস্যা নেই।তা আপনি টাইম ট্র্যাভেলের প্রতি আগ্রহী কেন?
ডেলিসা - ছোটবেলায় আমি মাকে দেখিনি।আমাকে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছেন।বাবার মুখে সবসময় শুনেছি মা নাকি অনেক সুন্দরী আর মায়াবী ছিলেন,বিশেষ করে প্রকৃতিপ্রেমী ।এদিকে এক গল্পের বইতে পড়লাম - একজন টাইম ট্র্যাভেল করে তার প্রেমিকাকে বাঁচিয়েছেন! সেখান থেকেই মাকে দেখার জন্য টাইম ট্র্যাভেল এর চিন্তা মাথায় এল।তা আপনি কেন টাইম ট্র্যাভেলের জন্য এত কাজ করলেন?
নিনো - অতীতের নানা নিদর্শন দেখার জন্য।ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন একটা জানার ইচ্ছা নেই।
ডেলিসা - ওহ।

এইসব ছোট-খাটো কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ডেলিসা চলে যাবার সময় হলো।কাল ল্যাবে দেখা হবে এই বলে ডেলিসা সেদিনের মতো বিদায় নিলো ।আর নিনো ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিলো ।তার বাসায় আগের সকল টাইম রিলেটেড রিসার্চ পেপার একত্র করতে লাগল।কালকে থেকে শেষ বারের মত টাইম ট্র্যাভেলের ওপর গবেষণা করবে সে।এইবারে হলে হবে; আর না হলে নেই।সব ফাইল একত্র করে গুছিয়ে শুয়ে পড়ে নিনো।

১ম দিন
নিনো, ডেলিসা'র টিম প্রস্তুত।বৈজ্ঞানিকভাবে মানব আচরণ সম্মত যেকোনো কাজ করতে গেলেই দুটো বিষয় প্রয়োজন : তথ্য এবং চিন্তা।
পরীক্ষালব্ধ তথ্য আর যুক্তিপূর্ণ চিন্তার সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। নিনো ও তার টিম তাদের প্রাপ্ত সকল তথ্য নিয়ে চিন্তায় বসে। আগে কেন সম্ভব হয়নি , কি কি ত্রুটি ছিল।ত্রুটি গুলো একে একে বের করতে থাকে তারা ।ত্রুটিগুলো মূলত সূত্রের।এক একটা পেপার অনেক বড় বড়।টিমে সবাই ভাগ হয়ে দেখে শেষ করতে অনেক সময় লাগবে।তবে নিনো আর ডেলিসা থাকায় যে আজকে কাজটা অনেক আগেই শেষ হবে বলে টিমের অনেকেই আশাবাদী।যাইহোক, দুপুরের মধ্যে তথ্যের অনেকটা কাজই শেষ।তবে ত্রুটির সমাধান করা এবং তা সমাধান হলে কি হত বা হতে পারত তা জানা বাকি।নিনো খেয়াল করে যে সূত্রগুলোর সাফল্য এই কারণে ঘটেনি যে, সেগুলো বাস্তব বিশ্বজগৎ থেকে পাওয়া গেছে ; বরং সেগুলো দিয়ে যে সম্ভাব্য ভুবনটি সম্পর্কে অনুমান করা যায় তা আমাদের জানা এই ভুবনটির মতোই, তবে এতে অবশ্য নিনো অবাক হয়নি । ডেলিসাও অনেক ভালোভাবেই এগোচ্ছে।
সন্ধ্যা পাড়ি দিয়ে রাত ঘনিয়ে এল।আজকের মতো ল্যাব-এর কাজ শেষ।কাল মূলত আগের সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে, নতুন কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাবে।সকলেই বাড়ি চলে যায়।যাবার আগে ডেলিসা নিনোর কাছে রিসার্চ-এ রাজি হবার জন্য আরও একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নেয়।কালকে থেকেই মূল কাজ শুরু হবে। নিনোও বাসায় যাবার উদ্দেশ্যে ল্যাব থেকে বের হয়।
ল্যাবটির এরিয়া বৃহৎ ।ওই জায়গায় আরো অনেক ল্যাব রয়েছে। নানান বিজ্ঞানীর নানান ল্যাব।এর আগেও নিনো এখানে তিন বার এসেছে।তবে হঠাৎ ছবির সেই মেয়েটির কথা মনে হয় তার। পকেট থেকে ছবিটা বের করে সে।ঠিক তখনই বাতাসের সাথে ছবিটা বাম দিকে উড়ে যায়।নিনোও ছবিটার পেছনে ছোটে, অবশ্য ধরে ফেলে সে।তবে ছবিটা ঠিক ড. মরিসের ল্যাবের সামনে গিয়ে পড়ে, নিনোর মনে আসে সে মরিসের গবেষণাপত্র দেখে নি।তাই সে মরিসের ল্যাবে ঢুকে পড়ে।সেখানে মেইন টেবিলের উপর সব পেপার রয়েছে।আর সেখানের কম্পিউটারে বিজ্ঞানীদের প্রধান পাসোয়ার্ড দিয়ে নানা তথ্য নিনোর পেনড্রাইভ এ নিয়ে নেয়। কোনো অ্যাক্সপেরিমেন্ট ফেইল হলে তখন আইনতভাবে তার থেকে তথ্য নিতে দোষ নেই। তবে ল্যাবের মধ্যে নানা গন্ধের মাঝে একটি মিষ্টি গন্ধ পায় সে।সেই রেললাইনে যেমনটা পেয়েছিল ঠিক সেই একই গন্ধ। তবে এতে তার অস্বস্তি লাগছে। কারণ রেললাইনের আগেও সে এই গন্ধটা পেয়েছে।খুবই পরিচিত গন্ধ। যেন কোনো দামী পারফিউম, কিন্তু কার? এই ল্যাবে একই গন্ধ পাওয়া আসলেই কি স্বাভাবিক? বেশি রাত হয়ে যাচ্ছে ।কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাসার দিকে রওনা দেয় নিনো।

৪.
চারিদিকে অন্ধকার। কোথা থেকে যেন নিনোকে কেউ টাইম ট্র্যাভেল করতে নিষেধ করছে।অন্ধকারে কাউকে দেখছে না নিনো। এত আঁধারে কোথা হতে যেন হালকা আলো আসছে। সামনে এগিয়ে সে অবাক! ছবির সেই মেয়েটির মতই হুবুহু একটি মেয়ে। আচ্ছা, এই মেয়েটিই কি তাকে নিষেধ করছে? জিজ্ঞাসা করতে চাইলেই সে দেখে মেয়েটির চোখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে।ভয় পেয়ে যায় নিনো।তারপর চোখ খুলে বুঝতে পারে যে এটি নিছক একটি

দুঃস্বপ্ন। আজ উঠতে দেরি হয়েছে তার।কাল রাতে দেরিতে বাসায় আসায় আর এলার্ম দেয়নি সে। ফ্রেশ হয়ে রিসার্চ সেন্টারের উদ্দেশ্যে বের হয় সে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।আজকে থেকে প্রধান কাজ শুরু।

ডে - ২

আগের সব তত্ত্ব দেখা হয়েছে। এখন নতুন থিওরির কাজ চলছে। আবার সে অনুযায়ী টাইম ট্র্যাভেল যন্ত্র বানানোর কাজও আছে। নিনো ল্যাব এ গিয়ে দেখে ডেলিসা ও তার টিম আগে থেকেই কাজে লেগে আছে।ডেলিসা জটিল এক সমস্যার সমাধানে মগ্ন। তাই কথা বলে তাকে ডিস্টার্ব করতে চায় নি নিনো। তবে ডেলিসাকে আজ বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে।আরও সুন্দর লাগছে তার লম্বা চুলের জন্য। কাজ করতে করতে যখন চুল কপালে চলে আসে, ডেলিসা আবার সেগুলোকে পেছনে পাঠিয়ে দেয়।নিনো ডেলিসার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পরে নিনোর সামনে রিসার্চ টিমের একজন 'স্যার' বলে রিসার্চ পেপার এগিয়ে দেয়। থিওরির কিছু জিনিস একটুখানি করে সংশোধন করে সে। তবে তিনটা বড় সমস্যা দেখা দেয়।তার মধ্যে একটার নিচে দাগ দেখে নিনো ধরে নেয় যে এটির সমাধান ডেলিসা করছেন।তাই সে অন্য দুটি সমস্যার মধ্যে আপেক্ষিকভাবে সহজটি আগে বেছে নেয়। ল্যাবে কিছুক্ষণ কাজ করে নিনো বুঝতে পারে যে সমস্যাটি যত সহজ ভেবেছিল প্রকৃতপক্ষে ততটা সহজ নয়।নিনো এইসব কাজ একা করতে ভালোবাসে। কাজের সময় আশেপাশে বেশি মানুষ থাকলে তার অস্বস্তি বোধ হয়।রিসার্চ ল্যাবটি মূলত বিজ্ঞানীদের সাধারণ অফিসের নিচে অবস্থিত।নিনো সমস্যাগুলো অফিসে নিয়ে যায়।আর সমাধানে মনোনিবেশ করে।

মনোযোগ সহকারে কাজ করছে নিনো। পেছন থেকে 'হাই নিনো' বলে ওঠে ডেলিসা।অংকের মাঝে ডাক দাওয়া নিনোর মোটেও পছন্দের নয়।অনেকটা বিরক্তিকর মুখে ডেলিসার দিকে তাকাল নিনো।তবে ডেলিসার হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে তার সকল বিরক্তি গুম না হলেও কিছুটা দূর হয়।ডেলিসা এমনিতেই সুন্দরী আর হাসলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়।

নিনো - হাই।
ডেলিসা - কখন এলেন আপনি?
নিনো- একটু দেরি হয়েছিল।আপনাকে কাজে দেখে তাই ডিস্টার্ব করিনি।
ডেলিসা - ওহ।
নিনো - তা আপনাকে এত খুশি দেখাচ্ছে যে?
ডেলিসা - ৩ টা সমস্যার মাঝে ১ টার সমাধান শেষ তাই।তা আপনিও মনে হয় একটা সমাধানের চেষ্টা করছেন নাকি?
নিনো - হুম।তবে এটা যতটা সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ নয়। সময় লাগবে।
ডেলিসা - কি বলেন! রাত হয়ে গেল যে!
নিনো - রাত কখন হলো! ক্যালকুলেশনে ছিলাম।তাই খবর নেই।
ডেলিসা - হা হা! সমস্যা নেই।তা আজকে তো আমাদের সিনিয়র কলিগের মেয়ের বিবাহ-বার্ষিকী ।পার্টিতে যাবেন না?
নিনো - দেখি, সমস্যাটা সমাধান করে আসব।এর আগে নয়।
ডেলিসা- আসলে সবাই একত্রে বের হব।তাই আপনাকে বলতে এলাম।মেসেজ দিয়েছিলাম
কিন্তু দেখেননি , পরে ল্যাবের একজন থেকে জানলাম আপনি অফিসে।তাই জানাতে এলাম। এখন ১০ টা বাজে।১১: ৪৫ -এ ল্যাব ছাড়বো। ভাবলাম একসাথে যাই।
নিনো - ওহ । আপনারা চলে যান।আমি সমস্যাটা সমাধান না করে আপাতত উঠছি না।
ঠিক আছে বলে নিনোর অফিস ছাড়ে ডেলিসা।

নিনোর এই অভ্যাস কখনো যাবে কিনা কে জানে। রিসার্চ করার সময় মনে হয় একটা ব্ল্যাকহোল পাশে বসিয়ে দিলেও নিনোকে তার সমস্যার সমাধান হবার আগে জায়গা থেকে নড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ।

অন্যদিকে ,

অনেকদিন ধরেই এন্টিসায়েন্স ও ইকো-টেরোরিস্টরা একটি বড় প্ল্যান বুনেছে।এন্টিসায়েন্স-এর কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করতে এরা রাজি নয়।তারা প্রকৃতিতে বিশ্বাসী, আর্টিফিশালিটি প্রকৃতি ধ্বংস করে।আর ইকো-টেরোরিস্ট? তারা 'গায়া থিওরিতে বিশ্বাসী।তারা মনে করে পৃথিবী জীবিত।পৃথিবীকে আঘাত করলে পৃথিবী ব্যথা পায়।তাই প্রকৃতিকে সরিয়ে এত ডিজিটাল বানানোর কোনো মানে হয় না।তারা প্রকৃতিকে রক্ষার জন্য সবকিছু করবে। তারা জানে এই আর্টিফিশালিটির পেছনে সব দোষ বিজ্ঞানীদের। তাই আজকে তারা একত্র হয়েছে
আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান মহলে আঘাত আনার। যদিও ভেতরে সিকিউরিটির জন্য যাওয়া যাবে না, তবে ১-২ টা সায়েন্টিস্ট মারতে পারলেই তাদের মনে শান্তি আসবে আজ।তাই নীরব ঘাতকের মত বিজ্ঞান মহলের বাহিরে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষায় আছে তারা।

নিনোর সমস্যা প্রায় সমাধানের পথে।এখনই সমাধান হয়ে যাবে।১১: ৪৫ হবার কিছু সময় বাকি। ডেলিসা ও অন্যান্য বিশ্ব কাঁপানো বিজ্ঞানীরা এখন বের হবে একত্রে পার্টিতে যাবার জন্য। ১২টায় পার্টি।প্রথমেই একজন বের হয়।ঘাতকরা তার দিকে বন্দুক তাক করে।শুট করার প্রিপারেশন নিতে গিয়ে দেখে তার পেছনে আরও কয়েকজন আসছে। মনে হয় তারাও বের হবে। এখন গুলি ছুড়লে পেছনের মানুষ গুলো সতর্ক হয়ে যাবে।এ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না।তাই অপেক্ষায় আছে তারা।২-১ জন কে মারার প্ল্যানে আসলেও আজকে তারচেয়েও বেশি মারবে।

তাদের চোখে বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ।কারণ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে নীরবে, তিলে তিলে ধ্বংস করছে। প্রাকৃতিক থেকে কৃত্রিম করে ফেলছে জন-জীবন ।তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই , এদের মরা উচিত।

মহলে ভায়োলেন্স ডিটেক্টর আছে। কোনো ভায়োলেন্সকারীর মাইন্ড ডিটেক্ট করতে পারলে মহলের ভেতর ও বাইরে কড়া সিকিউরিটি চালু হয় আর অটো টাস্কফোর্সে ইনফর্ম যায়। ভায়োলেন্সকারীদের থেকে রক্ষার জন্য এটা বানানো। তবে ঘাতকরা মনকে ট্রেনিং করে নিয়েছে যেন এতে ধরা না পড়ে। পেছনের বিজ্ঞানীগুলো বেরিয়ে আসে। ডেলিসাও তাদের সাথে আছে। তারা বেরিয়ে এলে মহলের দরজা বন্ধ হওয়া মাত্রই আঘাত হানে তারা; গুলি ছুড়তে শুরু করে। প্রথম আঘাতেই তিনজন নিহত। প্রথমে না বুঝলেও পরে সকলে বুঝতে পারে যে এটা টেরোরিস্টদের কাজ।প্রথম রাউন্ডে কয়েকজন নিহত সহ অনেকেই আহত অবস্থায় আছে। ডেলিসা প্রথম বারে পার পায়; তবে পরেরবার ভাগ্য সায় দিল না।বুকে গুলি লেগে ফুসফুস ছিদ্র হয়ে যায় তার।ডেলিসা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।চোখে সব অন্ধকার হয়ে আসছে।চোখের সামনে যেন তার মাকে দেখছে সে।আস্তে আস্তে শেষ আলোকবিন্দুটাও অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

টেরোরিস্টদের মাঝে দুজন নতুন ।তারা তাদের মনের উপর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে। হিংস্র প্রবণতা বেড়ে যায় তাদের। ফলে রাডার ডিটেক্ট করে ফেলে, তীব্র এলার্ম বেজে ওঠে, টাস্কফোর্সের কাছে খবর চলে যায়। এলার্ম বাজতেই পালিয়ে যায় তারা।

হিসাব মিলিয়ে মাত্র টেবিল থেকে ওঠে নিনো।সিকিউরিটির জন্য পুরো মহল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে লকড হয়ে যায় যেন ভেতরে কেউ প্রবেশ করতে না পারে। নিনো সহ আরও তিনজন ভেতরে ছিল। ডেলিসাকে ভেতরে না পেয়ে অনেকটা অস্থির হয়ে যায় সে। টাস্কফোর্স স্পটে আসলে মহল আনলকড হয়।বেরিয়ে এসে নিনো দেখে তার অনেক ক্লোজ কলিগদের লাশ মাটিতে পড়ে আছে।তার থেকে কিছু দূরেই পড়ে আছে ডেলিসার নিথর দেহ।তার ডেডবডি দেখেই বোঝা যায় বেঁচে থাকার আকুলতা।তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে নিনো। মুখ দিয়ে কিছু বলতে চেয়েও পারল না। টাস্কফোর্সের প্রধান নিনোর অনেক কাছের এক বন্ধু। নিনোকে দেখে তার অনেক খারাপ লাগে।তবে নিনোকে কিছু বলার নেই তার।শুধু সামনে গিয়ে ফর্মালিটির খাতিরে সরি জানায় সে। রাত ১২টা বেজে ১৫ মিনিট।স্পট থেকে বাড়ির দিকে রওনা দেয় নিনো। ভারি মুখে মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে হাঁটছে, নানা বিষয় ভাবছে সে ।টাস্কফোর্স নিনোর সিকিউরিটির জন্য গার্ড দিতে চেয়েছিল। নেয়নি নিনো।আজকে সকালের সেই দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়ে তার।সময় অভিশাপ নিয়ে আসে, বিরাট অভিশাপ।বাসার সামনে এসে ভেতরে না গিয়ে পেছনের জঙ্গলে যায় সে।সেখানে এক গাছের নিচে হেলান দিয়ে ভাবছে- কি করবে! তার ক্লোজ কলিগরা মারা গেল। ডেলিসাও চলে গেল।নিনো ডেলিসাকে হয়তো ওভাবে ভালোবাসতো না কিন্তু ডেলিসা কম সময়ে সবচেয়ে বেশি পছন্দের হয়ে তার ।ডেলিসার শেষবারের মতো টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে কাজের প্রস্তাব সহ নানা পুরোনো কথা আকাশে তাকিয়ে ভাবেছে নিনো।একটা বড় উল্কাপিণ্ড সাঁই করে উড়ে যেতে দেখে সে।বড় একটা শ্বাস ফেলে।ভাবা-ভাবি শেষ; কি করবে জানে সে! টাইম মেশিন! সে টাইমট্র্যাভেল করে অতীতে যাবে! দুর্ঘটনার কিছুক্ষন আগে ।গিয়ে সকলকে সাবধান করবে ।টাস্কফোর্সে খবর দিয়ে উগ্রবাদীদের ধরিয়ে দেবে ।কেউই মরবে না , সবই ঠিক থাকবে ।ডেলিসাও প্রাণ হারাবে না।

উঠে দাঁড়ায় নিনো। দৌড়ের ওপর বের হতে থাকে জঙ্গল থেকে।সময় নষ্ট করার মত সময় আজ তার নেই।হাতের স্মার্ট বেল্ড দিয়ে তার বন্ধু মানে টাস্কফোর্স এর হেডকে ফোন দেয় সে ।জানায় - সে ল্যাবে আসছে।যেন সব ক্লিয়ার থাকে ।তাকে মানা করলেও আজকে সে যাবেই।হেড অনেক বোঝালো; তবুও বন্ধু বলে কথা ।শেষমেশ নিনোকে সব ক্লিয়ারের ওয়াদা করে সে।তবে ল্যাবের আশেপাশে গার্ড থাকবে। এতে সমস্যা নেই - জানায় নিনো। ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছে।হেঁটে হেঁটে আজকে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

৫.

ডে - ৩

সূক্ষ্ম একটা হিসাব।খুবই ছোট একটা গ্যাপ। মেলাতে পারছে না নিনো।ডান-বাম সবদিকে কলকাঠি নাড়িয়েও কাজ হচ্ছে না।শেষ সমস্যাটা এই সূক্ষ্ম হিসেবের জন্যই আটকে আছে। শুধু একটা ক্লু দরকার।একটা ক্লুই নিনোর জন্য যথেষ্ট।অনেকবার চেষ্টা করতে থাকে সে। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে পেপারগুলো টেবিল থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় নিনো। হাতে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। দৃষ্টি অন্য টেবিলে যেথায় সকালে নিনো ব্যাগ রেখে গিয়েছিল।হুট করে মনে পড়ে তার ব্যাগে পেনড্রাইভে ড. মরিসের রিসার্চ ফাইলগুলো কপি করা আছে। সে এগুলো এখনো দেখেনি । পেনড্রাইভটি কম্পিউটারে লাগাল নিনো-যদি কিছু পাওয়া যায়। ফাইলগুলো একে একে করে সব দেখছে সে।তবে এখানে কোনো ক্লু পাবে বলে তার মনে হয় না।

মরিসের কাজ গুলো লেইম। তাই ভালো ভাবে না দেখে মরিসের টিমের ফাইলে ঢু মারে নিনো।চেক করতে করতে হঠাৎ একটি জায়গায় চোখ আটকে যায় তার। বিষয়টা অনেকটা নিনোর সমস্যার মতই তবে একটু ভিন্ন।আর সেই সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াটি নিনোর অনেক চেনা।সমাধানের প্রতিটি পদ নিনোর খুবই পরিচিত কারো নিয়মে বাঁধা।তবে তা মনে করতে পারছে না সে।তা ভাববার সময়ও নিনোর নেই।তবে নিনো তার ক্লু পেয়ে

গেছে।এই কাজটি পুরোটাই ক্লু।কাজটা যে কে করেছে জানলে ভালো হতো নিনোর। তবে যে-ই করুক না কেন সে আসলেই মেধাবী। ছুড়ে ফেলা পেপারসগুলো একত্র করে সে।কম্পিউটারের ফাইলের তথ্যসহ আবারও টেবিলে বসে নিনো।এই একটাই ক্লু। আর সর্বশেষ প্রচেষ্টা।সমস্যাটির আবার গোড়া থেকে সমাধানের শুরু করে নিনো। সমাধানের পথে চলে এসেছে সে। একটু, আরেকটু ... অবশেষে সমাধান হল। স্বস্তির এক বড় নিঃশ্বাস ফেলে নিনো।এতক্ষণে অবশ্য ভোর হয়ে গিয়েছে।টাইম মেশিনের সামনে গিয়ে ছোট-খাটো কাজগুলো সেরে ফেলে সে যা পূর্বে অনেকে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা করতে পারে নি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চলেছে সে।সব কাজ শেষ।এবার শুধু টাইম ট্র্যাভেল করার পালা।

টাইম মেশিনে টাইম সেট করে নেয় নিনো।এখন ভোর ৭টা বাজে। ঠিক যে সময়ে ডেলিসা সহ অন্যান্যরা ল্যাব থেকে বের হচ্ছিল তার ঠিক ৫ মিনিট আগের সময় দেয় সে।এবার মেশিন চালু করার পালা।নিনোর মনে অনেক প্রশ্ন ঘুর-ঘুর করছে। মেশিন চালু হবে কি হবে না, টাইম ট্র্যাভেল সত্যিই কি হবে নাকি হবে না, যদি কোনো সমস্যা হয় ইত্যাদি। তবে তাকে আজ ট্র্যাভেলে সফল হতেই হবে।শ্বাস আটকে ট্র্যাভেলেরসুইচে চাপ দেয় নিনো।চালু হবার কিছুক্ষণ পরেই চারদিকে সব কাঁপতে থাকে।নিনো একটু ভয় পেয়ে যায়।আর তার মাথা
ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করে।নিনো চোখ বন্ধ করে দুহাত দিয়ে তার মাথা শক্ত করে ধরে রাখে।চারদিক এখনো কাঁপছে।একটু করে চোখ মেলে দেখে - চারদিকে অন্ধকার। কিছুই দেখছে না সে। সবকিছু এখনো কাঁপছে।আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে সে।এরপর কি হলো কিছুই জানা নেই নিনোর।

আস্তে আস্তে চোখ খুলে নিনো।গত রাতে অফিসে তার চেয়ারে যেভাবে বসে ছিল ঠিক সেভাবে বসে আছে।মাথা এখনো ভোঁ-ভোঁ করছে। ঘড়িতে সময় দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিনো।টাইম ট্র্যাভেল সাকসেসফুল।রাত ১০টা ৫৫ বাজে আর ৫ মিনিট পর সবাই ল্যাব ছাড়বে। অনেকে মারা যাবে।নিজের অফিস থেকে বের হয়ে যায় নিনো, সকল কে জানাতে হবে।কেউ যেন ল্যাব থেকে বের না হয়।অনেক বড় ভবন।নিনো তার ফ্লোরে কাউকে না পেয়ে নিচের ফ্লোরে যায়। সেখানে প্রথমেই চোখে পড়ে প্রফেসর হ্যারি।নিনোর চোখে ভেসে ওঠে হ্যারির মৃত দেহ।সামনে গিয়ে তাকে ডাক দেয় নিনো।তবে হ্যারি কোনো সারা দিল না। নিনো আরো কয়েকবার চেষ্টা করে।কোনো লাভ হল না। নিনোকে যেন সে পাত্তাই দিচ্ছে না।নিজের কাজ আপন গতিতে করে যাচ্ছে হ্যারি।হ্যারির পেছনে সময় অপচয় না করে অন্য জনকে খোঁজে নিনো।
সামনে মিস জিলি-কে পেয়ে যায় সে।এখানেও সেই একই ঘটনা ঘটে।জিলিও যেন নিনোকে পাত্তা দিচ্ছে না।নিনোর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়।সে বুঝতে পারে কে-ও তাকে শুনতে পাচ্ছে না , দেখতে পাচ্ছে না। তবে দমে যাবার পাত্র নিনো নয়। এসময় দেখে ডেলিসা লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।নিনোও ডেলিসার পেছনে ধাওয়া করে। ডেলিসার সাথে সেও লিফটে উঠেপড়ে। লিফট নিচে নামার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত নিনো ডেলিসার সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। তবে কোনো লাভ হয় না।নিনোর এখন কাঁদোকাঁদো অবস্থা। লিফট থেকে বের হবার সময় নিনো ডেলিসার হাত ধরে আটকানো চেষ্টা করে।তার হাত ডেলিসার হাতকে ছুঁতে পারলো না।অবাক হয় নিনো।নানা ভাবে ডেলিসাকে ধরতে চাইল সে, এমন কি ডেলিসার হাটার পথে সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল।তাও লাভ হল না। ডেলিসা নিনোর শরীরের একপাশ দিয়ে এসে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে কষ্টে চিৎকার করতে থাকে নিনো।কেউ তাকে দেখছে না, শুনছে না।যেন সে কিছু থেকে আলাদা হয়ে আছে। শুধু সময়ের সাথে সকলের পরিবর্তন দেখছে সে। হাতে আর মাত্র ১ মিনিট সময়।কি করবে তা ভাবছে নিনো।

ডেলিসা লিফট থেকে নামার কিছুক্ষণ পর নেমে আসেন মিস মেলিকা।মেলিকাকে দেখে ড. স্যাম এগিয়ে যায়।
স্যাম - হাই, মিস মেলিকা আপনাকে উইয়ার্ড দেখাচ্ছে যে?
মেলিকা -হাই।আসলে একটা বাজে জিনিস দেখলাম।ঠিক কি বুঝতে পারলাম না।
স্যাম - কোনো স্বপ্ন কি?
মেলিকা - হয়তো। কোনো দুঃস্বপ্ন হবে হয়তো।
স্যাম - তাই? তা কি দেখলেন বলে ফেলুন।কোথায় যেন পড়েছি যে খারাপ স্বপ্ন দেখলে তা বলে ফেলা উচিত।তাহলে নাকি তা ফলার সম্ভাবনা কমে যায়।
মেলিকা - আপনি এ যুগেও এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন?
স্যাম - হাহা! নাহ।তবে বলতে তো আপত্তি নেই।
মেলিকা - আসলে দেখলাম আমি সহ অনেকে মারা গিয়েছি।
স্যাম - কি!!! এ কিভাবে সম্ভব!!
মেলিকা - কেন কি হয়েছে?

স্যাম - আমিও যে একটু আগে একই জিনিস দেখলাম! দু'জন একই জিনিস কিভাবে দেখে!

এমন সময় মিস আস্ট্রেয়া তাদের দিকে এগিয়ে আসে।
আস্ট্রেয়া - কি বেপার! কি নিয়ে কথা হচ্ছে?
মেলিকা - আসলে আমরা দু'জন একই স্বপ্ন দেখেছি।
আস্ট্রেয়া - কি দেখেছেন?
মেলিকা - আমরা মারা গিয়েছিলাম। তবে এটা স্বপ্ন ছিল না। মনেহয় জাগ্রত হয়েই দেখেছি।
আস্ট্রেয়া - হোয়াট!! আমিও তো একটু আগে একই জিনিস দেখলাম।

(মিস আস্ট্রেয়ার স্বামী প্রফেসর হান কোথা থেকে দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে।)

আস্ট্রেয়া - উফ্! হান।সকলের সামনে এটা কি করছ?
হান - যাই করিনা কেন আমার আপত্তি নেই। একটা ভয়ংকর জিনিস দেখে তোমাকে সারা বেইসমেন্ট খুঁজে এলাম।আর তুমি এখানে?
আস্ট্রেয়া - কি দেখলে শুনি?
হান - তুমি মারা গিয়েছিলে।মেঝেতে তোমার মৃত দেহ পড়ে ছিল। এ কথা শোনে
আস্ট্রেয়া, মেলিকা, স্যাম সকলেই নির্বাক হয়ে যায়।
ডেলিসা দৌড়াচ্ছে। কোথা থেকে যেন গুলি ছুটে আসছে। প্রথমে পার পায় সে।কিন্তু পরে বুকে গুলি লাগে।চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে।তার চোখও আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসছে।ভয়ার্ত অবস্থায় চোখ মেলে সে। দেখে ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে দাঁড়িয়ে আছে ডেলিসা। কি দেখল এটা? কোনো স্বপ্ন কি? ডেলিসাকে এরূপ অবস্থায় দেখে তার কারণ জানতে চাইলে সে তা খুলে বলে।আজব ব্যাপার। ল্যাবের সকলেই এমনটি দেখেছে। এটি স্বপ্ন নয় তা ডেলিসা নিশ্চিত।তবে কি সেটা সে মিলাতে পারছে না।এমন সময় প্রফেসর ডেভিড বলে ওঠে -

ডেভিড - আচ্ছা যা হবে হোক।এখন বেরিয়ে পড়ি।বের হলেই যে মারা পড়ব
এ তো একেবারেই নিশ্চিত নয়।
ডেলিসা - ওয়েট প্রফেসর ডেভিড।একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন কি?
ডেভিড - কি জিনিস?
ডেলিসা - যারা যারা পার্টিতে যাবার কথা তারা তারা মরতে দেখেছে। আর যারা আজ অফিসে থাকার কথা তারা দেখেছে অন্যদের মৃত দেহ।
ডেভিড - তো?
ডেলিসা - আমার মনে হয়।আমাদের বের হবার আগে চারপাশ দেখে নেওয়া উচিত।সিসি ক্যামেরার রুমে গিয়ে চারপাশে দেখা যেতে পারে। যদি কিছু পাই।

ডেলিসা সহ আরো অনেকে সিসি ক্যামেরা রুমে যায়। নিনোও তাদের পেছনে পেছনে চলে।তবে এই ঘটনা থেকে তার মনে পড়ে সেই রেলওয়ের কথা ।তারও ঠিক এমনটিই মনে হয়েছিল যে-সে ট্রেনের সাথে ধাক্কা খায়।পরে দেখে ট্রেন অনেক দূর থেকে আসছিল, এখনো ধাক্কা খায়নি।তবে এ বিষয় নিয়ে এখন ভাবতে চায় না নিনো।তারা কি করবে তা দেখার আশায় আছে সে।সিসি ক্যাম রুমে গিয়ে দেখে গার্ড গভীর ঘুমে মগ্ন।তাকে অনেকেই ঝাড়ি দিয়ে তোলে ।তারা দেখে, সিসি ক্যামেরার কম্পিউটার স্ক্রিন কালো হয়ে আছে।সম্ভবত জ্যামার দিয়ে করা হয়েছে।

তাদের আর বোঝার বাকি থাকে না যে এখানে আসলেই কোনো অঘটন ঘটতে চলেছে।তাড়াতাড়ি করে ডেলিসা ভবনের এলার্ট বাটনে টিপ দেয়। সাথে সাথে ভবনটি লক হয়ে যায়। আর টাস্কফোর্স খবর পেয়ে তাদের টিম নিয়ে ছুটে আসে।

টেরোরিস্টরা অপেক্ষায় আছে ।কিন্তু এখনো একজনও বের হল না। ভবনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারে সায়েন্টিস্টরা ভেতর থেকে সতর্ক হয়ে গিয়েছে। তারা পালিয়ে যেতে চাইল, তবে এতক্ষণে টাস্কফোর্স এর লোকেরা চলে এসেছে।ধরা পড়ে যায় তারা।পরে টাস্কফোর্সের প্রধান ভেতরে এসে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। প্রত্যেকে এবারের যাত্রায় বেঁচে যায়।স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবায়। নিনো শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সব। সেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ভবনের সকলে এরপর বাড়ির দিকে রওনা দেয়। এমন ঘটনার পর পার্টিতে যাওয়ার ইচ্ছে কারোরই থাকে না।

ভবন থেকে বের হয়ে যাবে নিনো এমন সময় এটেনডেন্টসের দিকে তার চোখ যায়।সকলের নাম লিস্টে আছে।শুধু তার নামটি নেই।তবে তার মনে আজ কোনো কষ্ট নেই।ডেলিসা সহ সকলে বেঁচে গিয়েছে।নিনো বের হয়ে যাচ্ছে এমন সময় ডেলিসার মনে হয় বেরোবার গেইটে কেউ একজন আছে, সেদিকে তাকায় সে। তবে কাউকে দেখছে না ডেলিসা।নিনোও ডেলিসার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দেয়।তার পর 'গুড বাই' বলে বেরিয়ে যায় নিনো।

রাস্তার ধারে হাঁটছে নিনো।অনেক রাত হয়েছে।এখন বাসায় যাবে। তবে সে হঠাৎ লক্ষ্য করে তার শরীর থেকে সোনালী রঙের কোনো আভা যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। তার শরীর একটু পর পর হালকা হয়ে যাচ্ছে।হিসাব কষে বের করে সে, ঠিক যে সময় টাইম ট্র্যাভেল করেছিল সেই সময়ের মধ্যে তার পুরো শরীর হালকা হয়ে মিলিয়ে যাবে।হয়তো তার অস্তিত্বই আর থাকবে না নিজের কাছে।এসব ভাবতে ভাবতে বাসায় চলে আসে নিনো।অনেক ক্লান্ত সে।এখন তার দরকার শুধু একটি গভীর ঘুম।

৬.

অনেক তৃষ্ণা পায় নিনোর।গ্লাস ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরে সময় নিয়ে হাতের মধ্যে শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে গ্লাস ধরে পানি পান করে সে। শরীর অনেক হালকা হয়ে এসেছে।বাহিরের দরজা না লাগিয়ে বিছানায় যায় সে।তবে ভালো ভাবে ঘুমাতেও পারছে না।বিছানায় পড়ে এদিক সেদিক ছটফট করছে।পরে আস্তে করে ক্লান্ত চোখে ঘুম নেমে এল তার।
বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারে নি।ভোর ৬টায় ঘুম ভেঙে যায়।শরীরের অবস্থা করুণ।ঘুম থেকে ওঠে হাতের দিকে তাকাল নিনো।হাতের ওপারে কি আছে তা অনেকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।৭টায় টাইম ট্র্যাভেল করেছিল। হয়তো চিরতরে বিলিন হয়ে যাবে আর এক ঘণ্টার মধ্যে।এই এক ঘন্টা কি করবে তা ভাবছে সে।ঠিক করে

সেই রেলওয়ের রেললাইনে যাবে।যেখান থেকে হয়তো এই সব শুরু হয়েছে। দরজার সামনে এসে ভাবে- দরজা খোলার চেষ্টা করে কি লাভ ; রাতে লক করে নি।দরজার একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বের হয় সে। নিনো নিজেকে ভূত বলে দাবি করলেও কোনো অসুবিধা নেই।ভূতের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় সে।অতৃপ্ত আত্মাও বলা যায়।তাকে কেউ দেখছে না, শুধু এটাই ভূতুরে।যাওয়ার পথে নানান কথা ভাবছে সে।সারা জীবনের ইতিহাস স্মরণ করছে নিনো , ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত সব রকম কথা।অনেক ধীরে হেটে হেটে সেই রেললাইনের সামনে আসে নিনো। আস্তে হাটায় অনেক সময়ও কেটে যায় তার।৬টা বেজে ৫০ মিনিট।নিনোকে অনেকটা অন্ধ মানুষও বলা যায় । চোখে তেমন কিছুই দেখছে না,খুবই কম।সেই রেললাইনটার উপর বসে পড়ে সে।বসে থেকে গত রাতের ঘটনা এবং ওই দিন তার সাথে রেললাইনে ঘটে যাওয়া ঘটনার মিল খোঁজার চেষ্টা করছে।অবশ্য ভাবার অবস্থায় একটি ট্রেন তার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে।সে ভাবে - যদি রেলের ঘটনাটি রিসার্চ সেন্টারে হয় তাহলে কি তার ব্যাপারটাকে কাকতালীয় বলে ধরে নেবে? আর যদি কাকতালীয় না হয় তাহলে হিসেব মতে সে প্রথম টাইম ট্র্যাভেলার নয়।তারও আগে কেউ টাইম ট্র্যাভেল করেছে।কিন্তু কে? তারও কি একই অবস্থা হয়েছে? এই সব ভাবতে ভাবতে কি মনে করে নিনো পকেটে হাত দিল।পকেটে সেই ছবিটা রয়ে গিয়েছে। ট্র্যাভেলের সময় বের করতে মনে ছিল না।ছবিটারও ঠিক নিনোর মত অবস্থা, হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।নিনোর চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। নিজেকে নিজে দেখতে পাচ্ছে না সে।না পারছে কিছু অনুভব করতে।যেন সময়ের আপন গতিতে মুছে যাচ্ছে নিনো।যেন টাইম ট্র্যাভেল করা ছিল সময় ও প্রকৃতির বিপরীত।হয়তো এটিই তার অভিশাপ।৭টা বেজে গেছে।যেন চিরতরে হারিয়ে গেল নিনো।কে নিনো? কীই- বা তার পরিচয়। আদৌও কি নিনো বলে কেউ আছে? নাকি সবই ফল্স মেমোরি? হয়তো এইভাবেই লেখাছিল তার জীবনের শেষ পরিণতি।

সকাল থেকেই কেমন অস্বস্তি বোধ করছে ডেলিসা।ল্যাবে কাজ করার সময় বার বার মনে হচ্ছে, সে ও তার ল্যাব মেম্বারস ছাড়াও ল্যাবে কেউ একজন ছিল।কিন্তু কে তা বের করতে পারছে না সে। টাইম ট্র্যাভেলের মত এত বড় একটা প্রজেক্ট তার একা সামলানো সম্ভব নয়।এমন সময় বিজ্ঞান কাউন্সিলে মিটিং এর ডাক আসে। ডেলিসা সেখানে চলে যায়।মিটিং মূলত গতকালের বিষয়টি নিয়ে। কীভাবে সবাই একই ধরনের জিনিস দেখল, যা হয়তো ঘটে যেতে পারত।একেক জন একেক রকম ধারণা দেয়।কেউ কেউ তো সৃষ্টিকর্তা তাদের বাঁচানোর জন্য ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দিয়েছে বলে বিশ্বাস আনে।এমন সময় মিস আস্ট্রেয়া বলে ওঠে, " উফফ! ও থাকলে ভালো হতো ।" সবাই তার দিকে তাকায় ।ডেলিসা বলে, " কে থাকলে? মিস আস্ট্রেয়া।"

আস্ট্রেয়া - ইয়ে মানে আসলে ঠিক মনে পড়ছে না ।তবে সকাল থেকে কে যেন আমাদের মাঝে নেই নেই মনে হচ্ছে।আবার ঠিক কে নেই তাও বলতে পারছিনা না।

ডেলিসা - আসলে আমারও ল্যাবে কাজ করার সময় এই জিনিসটা মনে হচ্ছে।যেন কেউ আমার সাথে ল্যাবে ছিল।

ডেলিসা বলার পর আরো অনেকে জানায় তাদেরও এমনটাই মনে হচ্ছে।

এমন সময় মিটিং এর হেড সায়েন্টিস্ট আলবাস ডেলিসাকে বলে, " মিস ডেলিসা, আপনি টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে কাজ করছেন না? আর আপনার ল্যাবে কেউ নেই নেই মনে হচ্ছে? "

ডেলিসা - জ্বি।

আলবাস - আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না যে গতকালের সাথে টাইম ট্র্যাভেলের কোনো মিল আছে?

ডেলিসা - আমিও এতক্ষণ ধরে এ কথা ভাবছি।আমার মনে হয় যাকে আমাদের মিসিং মনে হচ্ছে সে কোনো ভাবে টাইম ট্র্যাভেলে সফল হয়েছে।তাই আমরাও হয়তো ঘটে যাওয়া ঘটনার একটা প্রতিচ্ছবি দেখেছি।

আলবাস - ধরে নিলাম আপনি সঠিক।তাহলে, তাকে মিসিং কেন মনে হচ্ছে?

ডেলিসা - সেটাই তো বুঝতে পারছি না ।ঠিক কি ঘটেছিল যার ফলে সে মিসিং।যে টাইম ট্র্যাভেল করেছে সে সরাসরি সেদিন আমাদের কাউকে কিছু বলেনি ।তাহলে কি সে ট্র্যাভেল করেই হারিয়ে গেল? কোনো সাক্ষাৎ ছাড়াই! যেহেতু আমাদের পরিচিত একজন মিসিং তাই আমাদের বাঁচানোর জন্যই যে সে টাইম ট্র্যাভেল করেছে- সেটা ধরা যেতে পারে।কারণ ঘটে যাওয়া ঘটনার সময় হয়তো তিনি বেঁচে ছিলেন।

আলবাস - হুম।তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাদের কিছু একটা করতে হবে।কিন্তু কীভাবে?

যে তাদের বাঁচিয়েছে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কী করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলছে।অনেকেই নানা মতামত দেয়। তবে কোনো কূল পায় না।ডেলিসা কিছু বলতে পারছে না।ভালো ভাবনা নিয়ে আসার জন্য সময় লাগবে তার।আজ সারাটা দিন মিটিং চলে।কোনো ভালো ক্লু পায় নি তারা।তবে মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেয় যে টাইম ট্র্যাভেলারকে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত মিটিং অব্যাহত থাকবে।আর যারা বর্তমানে যে বিষয়ে কাজ করছে তারা ট্র্যাভেলারকে না পাওয়া পর্যন্ত সব বন্ধ রাখবে।

মিটিং শেষ।সকলে বেরিয়ে যায়।ডেলিসা গাড়িতে উঠবে এমন সময় রাস্তার বাম দিকে চোখ যায় তার।যতটুকু মনে পড়ে এ দিকটায় কখনো যায়নি সে।কি মনে করে আজ সেদিকে যেতে ইচ্ছে হয় তার।কেন জানি মনে হচ্ছে এদিকটায় সে আগে গিয়েছে। ডেলিসার স্মৃতি শক্তি প্রখর।আজকে গাড়িতে না, হেঁটে হেঁটেই

যেতে ইচ্ছে হয় তার।অনেকক্ষণ হাঁটার পর খেয়াল করে সে এ দিকটা অত আধুনিকতার ছোঁয়া আসে নি।হাটতে হাটতে চোখের সামনে একটি বাড়ি পড়ে। বাড়িটা পুরাতন,অতো আধুনিক নয়। তার মনে হয় - এই বাড়িতে সে আগেও এসেছে। দরজার সামনে নাম লিখা আছে এল.নিনো।আগেও সে এই নামটি শুনেছে কিন্তু কার নাম মনে পড়ছে না।নক করতেই দরজা খুলে যায়।ভেতরে প্রবেশ করে সে।খুবই পরিচিত লাগে তার।প্রথমেই দেখে পুরাতন কালেকশন ।ডেলিসা নিশ্চিত সে আগে এগুলো দেখেছে।টেবিলে চোখ যেতেই সে ঘাটাঘাটি শুরু করে দেয়।টেবিলে টাইমের উপর নানা বই আছে, নানা পেপার আছে টাইম ট্র্যাভেলের উপরে। পাশের রুমে যাওয়া মাত্র একটা ছবি তার চোখে পরে।দেওয়ালে টাঙানো। ডেলিসা তাকে চেনে। কিন্তু মনে আসছে না। ডেলিসা ভাবছে, " আচ্ছা উনিই সেই টাইম ট্র্যাভেলার নন তো? " সে ছবিটির একটি ছবি তুলে নেয়। যে করেই হোক এনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।কি করবে ভাবছে সে।এমন সময় সোফায় মুক্ত ভাবে বসার সময় সোফার নিচে পড়ে যায় সে। অবাক হয়ে আছে ডেলিসা।তার শরীরের উপরের অংশ সোফার উপরে আর বাকি অংশ সোফার নিচে। আর সোফার বসার অংশটির ভেতর তার বাকি অংশ।তাড়াহুড়ো করে উঠে দাঁড়ায় সে। কি হল তার মাথায় ঠেকছে না।তবে তার কি যেনো সন্দেহ হল।তাই বাড়ির দেয়ালের কাছে এসে প্রথমে আস্তে করে হাত দিয়ে ধাক্কা দেয় ।কিচ্ছু হয় না।পরে একটু জোরে দিতেই হাত দেওয়াল ভেদ করে বাহিরে চলে যায়।তার আর বোঝতে বাকি থাকে না- ট্র্যাভেলারের সাথে সাথে ট্র্যাভেলারের সকল জিনিসই বিলীনের পথে।ডেলিসা আরো কিছু সময় নিয়ে হিসেব কষে।নানা হিসেব করে বের করে যে, আগামী ৫ মাস পর এ বাড়ি বিলীন হয়ে যাবে।যা করার তা হয়তো এই ৫ মাসের ভেতরে করতে হবে।নাহলে ট্র্যাভেলারকে হয়তো ফিরিয়ে আনার কোনো সুযোগই থাকবে না।তার পরবর্তী কাজের জন্য টেবিল থেকে পানির গ্লাসটি নিয়ে নেয়।বাড়ি যাবার জন্য বের হচ্ছে সে। আজ সারারাত ট্র্যাভেলারকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোনো না কোনো উপায় করতেই হবে তাকে।

যথা সময়ে মিটিং শুরু হয়। একেক জন একেক উপায় বলে। কারোরটিই তেমন গ্রহণযোগ্য নয়।সবার শেষে আসে ডেলিসার পালা।

আলবাস - মিস ডেলিসা, আপনার কাছে আজ কোনো উপায় আছে কি?

ডেলিসা - জ্বি। আপনারা কি এই ছবির মানুষটাকে চিনতে পারছেন?

ছবি দেখাতেই সকলে জানালো ছবির মানুষকে আগে দেখেছে। কিন্তু কেউ মনে করতে পারছে না।

ডেলিসা - উনিই সম্ভবত নিনো। আমার মনে হয় উনিই সেই ট্র্যাভেলার । আমাদের মেমোরি সময়ের সাথে তাকে হারিয়ে ফেলছে।

আলবাস- কিন্তু এনাকে ফিরিয়ে আনবে কিভাবে?

ডেলিসা - আমার কাছে তার ডি.এন.এ আছে।তার পানি খাবার গ্লাস থেকে নিয়েছি। কীভাবে? সে এক লম্বা ইতিহাস- তা বলে সময় অপচয় করতে চাই না।আমার প্ল্যান - একটা যন্ত্র বানাতে হবে অনেকটা টেলিপোর্টেশনের মতো। আগে ডি.এন.এ দিয়ে তাকে কোনো উপায়ে ডিটেক্ট করতে হবে।তারপর সে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।তারপর তাকে এই যন্ত্র দিয়ে ফিরিয়ে আনবো। তবে, সে আমাদের এই জগতে নেই। কোনোভাবে অন্য জগতে হারিয়ে গেছে। তাই আমাদের মেমোরি থেকে সে মুছে যাচ্ছে। কে জানে কেমন জগতে আছেন তিনি।সে জগৎ অভিশপ্ত নাকি সুখময়! তিনি বেঁচে আছেন নাকি নেই।আমার কাছে শুধু এই একটি উপায়ই আছে।

আলবাস - অকে ডেলিসা। কেউ কি তার বিপক্ষে আছেন?

(কোনো রেস্পনন্স নেই)

আলবাস - ঠিক আছে। সকলেই তাহলে ডেলিসাকে সম্মতি জানালেন ।

ডেলিসাকে এই প্রজেক্টের প্রধানের দায়িত্ব দিলাম। আশা করি আমাদের টাইম ট্র্যাভেলারকে শীঘ্রই ফেরত পেতে যাচ্ছি।

এই বলে মিটিং শেষ হয়।আজকে থেকেই কাজ শুরু করে দেয় তারা।যে করেই হোক টাইম ট্র্যাভেলারকে তারা ফিরিয়ে আনবেই।

৭.

নিজ অস্তিত্ব টের পাচ্ছে নিনো।হারিয়ে যায়নি সে।কিছু একটার উপর পড়ে আছে তার দেহ।আস্তে আস্তে চোখ খুলে।শরীর খুব ভারী , নড়তে কষ্ট হচ্ছে তার।চারিদিক নীরব।পাশে কেউ আছে, অনুভব করে সে।একটু নড়ে তাকাতেই চোখে পড়ে একটি বৃদ্ধ মহিলা তার পাশে বসা।একটু পড়ে সেই মেয়েটি যেন ছোট বাচ্চার মত হয়ে এল ।অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নিনো। ভূতে নিনো বিশ্বাসী নয়।তবে এই ভূতুরে কাণ্ড দেখে নিনোর মনে ভয় বাসা বাঁধছে।একটু পর এই ছোটো মেয়েটি তরুণী হয়ে ওঠে।চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে নিনো। ছবির সেই আবছা পরিচিত মেয়েটি। নিনোর আর চিনতে দেরি হয় নি। ইনি হলেন বিজ্ঞান মহলের নারীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী, মিস জেনোবিয়া।নিনো তাকে অনেক ভালোবাসে।জেনোবিয়া নিনোর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেয়।অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে নিনো। জেনোবিয়া নিরবতা ভেঙে বলে ওঠে, "কেমন আছো নিনো?"

(নিনোর মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে।নিজের শরীরে তাকিয়ে দেখে তার শরীরও একবার পিচ্চি বাচ্চার মতো হচ্ছে, আবার বৃদ্ধও হচ্ছে।সব কিচ্ছু বিরক্তিকর লাগছে তার , সাথে ভয়ংকরও)

নিনো - জানি না।
জেনোবিয়া - হাহা।তোমার এরূপ উত্তর কখনো যাবে কি?
নিনো - হয়তো।তোমার কি খবর?
জেনোবিয়া - সে তো দেখতেই পাচ্ছ। এতক্ষণ একা ছিলাম। তোমাকে দেখে ভালো লাগছে।তা তুমি এখানে যে? টাইম ট্র্যাভেল করেছ নাকি?
নিনো - (অবাক হয়ে) তুমি কি করে জানলে?
জেনোবিয়া - এখনো বোঝনি?
নিনো - তুমিও টাইম ট্র্যাভেল করেছো? কিন্তু আমি ছাড়া যে এই কাজ করা হচ্ছিল তা তো জানা ছিল না।
জেনোবিয়া - ড. মরিসের কথা মনে আছে?
নিনো - হুম।
জেনোবিয়া - তুমি উনার প্রস্তাব ত্যাগ করার পর ২য় সর্বোচ্চ অভিজ্ঞ হিসেবে উনি আমাকে প্রস্তাবনা দেন।আমার হাতে অন্য কোনো প্রজেক্ট না থাকায় ভাবলাম এটা নিই। সাকসেসের রেট কম, তাও ভাবলাম যদি কোনোভাবে সাকসেস হয়ে তোমাকে ইম্প্রেস করা যায়।
নিনো - কিন্তু প্রজেক্টটি তো ফেল হয়েছিল। নিউজে দেখেছিলাম।
জেনোবিয়া - অহ তাই? তুমি রেলওয়ে লাইন থেকে ফেরার পর দেখেছিলে?
নিনো - হুম।কিন্তু কী ভাবে কী ? আমি রেলওয়ে লাইন-এ ছিলাম তুমি কী করে জান? সব খুলে বল।
জেনোবিয়া - ড. মরিস ব্যাক্তিগত কাজে ৬-৭ দিন ব্যস্ত থাকবেন বলে আমাকে দায়িত্ব দিয়ে চলে যান।এদিকে আমারও টিমের অনেক কাজই শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু...
নিনো - কিন্তু কি?
জেনোবিয়া - কিন্তু প্রজেক্ট চলাকালীন সময়ে তোমার মৃত্যুর খবরটা আসে।ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে নাকি তুমি মারা যাও। খবরটা পাওয়া মাত্র আমার যেন সব ভেঙ্গে পড়ে।সেদিন রাতে অনেক কেঁদেছি, আমার জীবনে আমি এর আগে এভাবে কাঁদিনি ।(বলতে বলতে চোখের পানি মুছছে জেনোবিয়া।নিনো নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে আর কথা গুলো শুনছে)

সারা রাত তোমার স্মৃতিগুলো চোখে ভাসছিল ।পরেরদিন আমার জন্মদিন ছিল ।তোমাকে ছাড়া তা পালনের প্রশ্নই আসে না। তোমাকে ছাড়া আমাকে কল্পনা করা ছিল কষ্টের।তাই রাতে সিদ্ধান্ত নেই- টাইম ট্র্যাভেল করে ফিরিয়ে আনব তোমায়।না খেয়ে না ঘুমিয়ে টাইম মেশিন বানিয়েছিলাম।সব শেষে যখন ট্র্যাভেল সাকসেস হল - তোমার জন্য রেলওয়েতে গেলাম।বিশ্বাস কর অনেক ডেকেছি তোমায়।কিন্তু একটুও শোনোনি আমায়। তোমার হাত ধরে রেলওয়ে থেকে সরাতে চেয়েছি। হাতটাও আর ধরতে পারলাম না যেন আমি থেকেও নেই।ভেবেছিলাম তোমাকে আর বাঁচাতে পারব না।পরে দেখি তুমি নিজেই রেললাইন থেকে নেমে গেলে। আর তার একটু পর একটা ট্রেন লাইন দিয়ে চলে গেল ।আমি ঘড়িতে সময় দেখলাম।যে সময়ে মরে যাবার কথা ছিল তা অতিক্রম হয়ে গেছে। বুঝলাম আর কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আমাকে ঠিক করার মত কেউ নেই। তাই এ জগতে আসার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার সাথে ছিলাম। তোমার সাথে অফিসে গেলাম।উল্কা দেখার সময় তোমার পাশেই শুয়েছিলাম।তোমার সাথে ওই মেয়েটিকে দেখে নিজেকে একা তুচ্ছ মনে হচ্ছিল। প্রতিদিন তো আমায় কল করতে; তবে সেদিন কোনো কল করনি ।ভাবলাম ভুলে গেলে আমায়।তবে এটা বুঝেছি যে তোমার দোষ নেই।এরপর সময়ের সাথে চলে এলাম এই অভিশপ্ত জগতে।

(কথা শেষে এক দীর্ঘ বেদনাময়ী হাসি দেয় জেনোবিয়া)

মাথা নিচু করে আছে নিনো। তার চোখের এক কোণে পানি এসেছে। পানি মুছে জেনোবিয়ার দিকে তাকায় সে। সে জানতো আপন কাউকে হারিয়েছে সে। কিন্তু তার ভালোবাসার এই মানুষটাকে যে হারাবে কল্পনায়ও সে ভাবেনি ।নিজের উপর ক্ষোভ আর লজ্জা হচ্ছে তার। সময় আসলেই অভিশপ্ত। জেনোবিয়ার দিকে তাকিয়ে নিনো বলে, "আমি দুঃখিত।আমাকে ক্ষমা কর।"
জেনোবিয়া - হাহা!! তুমি কেন সরি বলছো? এতো তোমার দোষ নয়।হয়তো আংশিক দোষ তোমার। তবে যাইহোক এখন তো আমার সাথে এখানে আছো, আর একা একা লাগছে না।
নিনো - হুম

এই বলে উপরে তাকায় নিনো।তাকিয়ে তার চোখ ভরে যায়। আকাশে তারারা আলো ছড়াচ্ছে। এত তারা এক সাথে নিনো আগে দেখেনি।যেন আকাশের উপরের তল কেউ মুছে দিয়েছে। শত শত তারা যেন আকাশকে আলোকিত করে রেখেছে। যেন সৃষ্টিকর্তা আকাশে আঁধার দূর করবার জন্য আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

এমন সময় জেনোবিয়া বলে ওঠে, " আচ্ছা আমার জন্মদিনে না তোমার সাথে নাচবার কথা ছিল কিন্তু এর আগের দিন তুমি মারা গিয়েছিলে ।"
নিনো- ইয়ে মানে, কই এমন কোনো কথা তো ছিল না।
জেনোবিয়া - লুকাবার চেষ্টা করবেন না বুঝলেন।(এই বলে দাঁড়িয়ে যায় জেনোবিয়া তার পর নিনোকে টেনে তোলে)।চলো আজ এই গভীর রাতে শত তারার আলোতে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের ভালোবাসাময়ী নাচ করি।
নিনো - আমি পারিনা, সত্যিই পারিনা।

জেনোবিয়া - শুধু তাল মেলাবা আমার সাথে।
এই বলে নাচ শুরু করে দেয় তারা।জেনোবিয়া গুনগুন করে গান গাইছে তার মধুময় সুরে।

নাচ করার ফাঁকে একসময় নিনো আকাশের দিকে তাকায়। কি যেন তার চোখে পরে, একটা ঘড়ি, কিন্তু সেটা কোথায় যেন উড়ে যাচ্ছে। জেনোবিয়াকেও দেখায় সে। এরপর তারা একে ফলো করে।এটার পিছু ধাওয়া করতে করতে দেখে ঘড়িটা এক জাগায় থেমে যায়। নিনো ও জেনোবিয়া আরও সামনে গিয়ে তারা দেখে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে ঠিক পাখির মতন, দুপাশে দুটো ডানা আছে।তারা আরো সামনে গিয়ে দেখে - একটা বিশাল ঘড়ি।তার ঠিক উপরে কেউ একজন বসা।অনেকটা মানুষ আকৃতির।তবে তার পাখা আছে।

নিনো বলে ওঠে, "কে আপনি?"
উপর থেকে আওয়াজ আসে - "আমার জগতে এসে আমাকে প্রশ্ন কর আমি কে?" আমি ক্রোনাস, গড অফ টাইম।তোমরা এখানে কি? কেন এসেছ?
নিনো - আমরা টাইম ট্র্যাভেল করেছিলাম।
ক্রোনাস - সময় নিয়ে খেলার সাহস কি করে হয় তোমাদের ? এটা তোমাদের অভিশাপ।তোমাদের শাস্তি।
নিনো - আপনি যদি আসলেই গড অফ টাইম হয়ে থাকেন - আমাদের ফেরত পাঠান।আমাদের ভুল হয়েছে।
ক্রোনাস - হুম।তবে শুধু একজনকে পাঠাব।কে যাবে নিজেরাই বেছে নাও।
জেনোবিয়া - নিনো তুমি চলে যাও আমি একা থাকতে পারব কোনো সমস্যা নেই।
নিনো - না, তুমি আমাকে একবার বাঁচিয়েছ, আমাকে এর প্রতিদান দিতে দাও।এই বলে নিনো গড অফ টাইমকে বলে,
"ক্রোনাস, আমি এখানে থাকব।"
ক্রোনাস - ঠিক আছে।
এই বলে জেনোবিয়ার ওপর একটা আলোকরশ্মি আসে।

জেনোবিয়া- না, প্লিজ নিনোকে পাঠান।
ক্রোনাস - সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে।
জেনোবিয়া কাদছে।ঠিক যেভাবে এখানে এসেছিল সেভাবে চলে যাচ্ছে সে। নিনোর দিকে তাকিয়ে কাঁদছে, নিনো তার দিকে তাকিয়ে একটা চওড়া হাসি দেয়। তার চোখের সামনেই জেনোবিয়া চলে যায় আপন জগতে। নিনো তার পর আকাশে তাকিয়ে সজোরে হাসতে থাকে।
৩ মাস হয়ে গেল।ডেলিসা ও তার টিমের টাইম টেলিপোর্টেশন মেশিন বানানোর কাজ শেষ। এখন শুধু ট্র্যাভেলারকে ফিরিয়ে আনার পালা। ট্র্যাভেলারের ডি.এন.এ. টি ডিটেক্টরে দেয়। ডিটেক্টর অনেকক্ষণ সার্চ করে।অনেক অপেক্ষার পর ডি.এন.এ ম্যাচ হয়।এখন শুধু মেশিন অন করবার বাকি। অন করা হল, সকলেই অপেক্ষমান ।খুবই ভারী মেশিন, অনেক বিদ্যুৎ টানছে । ওপারে নিনো জেনোবিয়াকে মাত্র ফেরত পাঠিয়ে ভারী মনে হেটে বেড়াচ্ছে ।হঠাৎ বিরাট এক ঝাঁকুনি খেয়ে সে নিচে পড়ে যায়। তার শরীর আগের মত হালকা লাগছে।একটু পর খেয়াল করে হাতের দিকে তাকালে অপর দিকে সব দেখা যাচ্ছে, আগে এভাবে এ জগতে এসেছে, কিন্তু এবার কোন জগতে যাবে সে বুঝছে না। এমন সময় ক্রোনাস, গড অফ টাইম নিনোর সামনে এসে বলে - " হুম, আপন জগতে চলে যাচ্ছ। ভালো, ওপার থেকে অনেকেই ডাকছে তোমায়। যাক, যেহেতু চলে যাচ্ছ, তাই শুনে রাখো - এখান থেকে গিয়ে তোমার বাসায় এই ঘড়িটা পাবে। (এমন সময় একটা ঘড়ি উড়ে এসে নিনোর সামনে হাজির) এই ঘড়ির উপরের বাটনে টিপ দিলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। ভাবলাম অভিশাপ মুক্ত করে দিই। তোমরাই প্রথম যারা এ জগতে এসেছ তাই এবারের যাত্রায় ছেড়ে দিলাম।

নিনো - ধন্যবাদ।

(বলা শেষ করতে না করতেই টেলিপোর্ট হয়ে যায় নিনো)

টেলিপোর্ট করা শেষ। এখন তাদের শুধু খুলে দেখার অপেক্ষা। সকলেই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে, যে মানুষটি তাদের বাঁচিয়েছে তাকে দেখবার জন্য।যন্ত্রের মুখ খোলা মাত্রই নিনোকে দেখে সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। নিনোর শরীর খুবই দুর্বল , হাটতে পারছে না ভালোভাবে। ডেলিসা এগিয়ে তাকে সাহায্য করে। সবাই নিনোকে 'ওয়েলকাম ব্যাক' জানায়। তাকে নানা পরীক্ষা করায়। সব ঠিকঠাকই আছে। সবশেষে তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে ধন্যবাদ জানানো হয় তাদের বাঁচানোর জন্য, আর টাইম ট্র্যাভেল সাকসেস হবার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

ডেলিসা নিনোকে বলে, "এত দিন না খেয়ে কীভাবে ছিলেন আপনি?"
নিনো- কই এত দিন? কিছুক্ষণই তো হল মাত্র। তবে আপনি আগের থেকে শুকিয়ে গেছেন।
ডেলিসা - কিছুক্ষণ না, ৩ মাস হয়ে গেছে আপনি এখানে ছিলেন না।
নিনো - ৩ মাস! ওহ বুঝলাম, টাইমশিফট এর ফলে এইসব হয়েছে।
ডেলিসা - হুম।আপনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন।
নিনো - না। বাসায় যেতে হবে একটা জরুরি কাজ আছে।
এই বলে বেরিয়ে যায় নিনো।আজকে বেশি হাঁটার শক্তি নেই।অন্য বিজ্ঞানীরা তাকে রেস্ট নিতে বললেও শোনে না সে।গাড়িতে চড়ে বসে নিনো।

বাসায় গিয়ে সেই ঘড়িটি খোঁজার কাজে লেগে যায় সে।বিছানার এক কোণে সেই ঘড়িটি দেখতে পায় নিনো।ঘড়িটি হাতে নিয়ে সুইচটি দেখে নিনো। অজানা কোনো এক ভাষায় কিছু একটা লেখা আছে। শ্বাস চেপে রেখে সুইচে চাপ দেয় সে। কী হবে কিছুই তার জানা নেই।ক্রোনাস বলেছিল সব ঠিক হয়ে যাবে। চাপ দেবার পর ঘড়িটি বাতাসে মিলিয়ে যায়। চারিদিক অন্ধকার হয়ে আসে। নিনোর মাথা ভোঁ-ভোঁ করে।জ্ঞান হারায় সে। জ্ঞান ফিরে চোখ খুলতেই দেখে সে রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে ।সামনে একটা ট্রেন আসছে এখনি তাকে হিট করবে।

রেলাইনের একপাশে লাফ দিয়ে নিজেকে বাঁচায় নিনো। কেউ তাকে অনেক্ষণ ধরে ফোন দিচ্ছে।মাটিতে পড়ে থেকেই ফোন ধরে সে। জেনোবিয়া ফোন দিচ্ছে ড. মরিসের ল্যাব থেকে।রিসিভ করে সে।

জেনোবিয়া - কোথায় তুমি?
নিনো - এইতো রেলওয়েতে।
জেনোবিয়া - এখনই বের হও ওখান থেকে।আর আমরা এখানে কেন? আর তুমি তো অন্য জগতে ছিলে।
নিনো - হুম। যাচ্ছি । সমস্যা নেই আমার সব মনে আছে।বাড়িতে আসো।সব বলছি।

মাটি থেকে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার।অনেক টায়ার্ড সে।অনেক খাটুনি হয়েছে তার।আবারও খাটতে হবে।কাল জেনোবিয়ার জন্ম দিন। আবার কাল মিটিং আছে, ডেলিসা নামের একটি মেয়ে আসবে , উল্কাবৃষ্টি দেখা বাকি।আবার এর তিন দিন পর টেরোরিস্ট আঘাত আনবে সেখান থেকে তার কলিগদের বাঁচাতে হবে।অনেক কাজ।উঠে দাঁড়ালো নিনো।জেনোবিয়ার তোলা ছবিটা নিচে পড়ে থাকতে দেখে সে, হাটার সময় যেটা হাতে ধরেছিল।বেখেয়ালে হয়তো হাত থেকে পড়ে গেছে।ছবিটা তুলে নেয়।বাসায় গিয়ে দেখে জেনোবিয়া আগে থেকেই হাজির।সকল ঘটনা খুলে বলছে নিনো।আসলেই সব ঠিক হয়ে গেছে।আর এর জন্য গড অফ টাইমকে মনে মনে ধন্যবাদ দেয় সে।ক্রোনাস হয়তো নিনোর ধন্যবাদ শুনতে পেরেছিলেন, তাই বড় আওয়াজে কিছুক্ষণ হাসতে থাকেন।

যত দূর জানা জায়, নিনো আর জেনোবিয়া-ই ছিল প্রথমদিকের টাইম ট্র্যাভেলারস।
এরা একবারই টাইম ট্র্যাভেল করেছিল।এরপর আর কখনো তারা টাইম ট্র্যাভেল নিয়ে কাজ করেনি ।
হয়তো এদের পরে আরো অনেকে সফল হয়েছে যারা হয়তো আর ফিরে আসবেনা।হয়তো-বা কেউই সফল হয়নি।হয়তো আর কেউই সফল হবে না।

ইনোপ

আদিন নুর

১.

নিকো বিরক্ত হয়ে লোকটির দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ থেকেই তাকে ফলো করে আসছে। এর সঠিক কারণটা সে বলতে পারবে না। ভদ্রতার খাতিরে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারছে না। নিকোর এই এক সমস্যা - কাউকেই কিছু বলতে পারে না। এইতো কিছুদিন আগে বাসে করে বাড়ি ফেরার সময় এক পকেটমার দিব্যি পকেটে হাত দিয়ে মানিব্যাগটা হাতিয়ে নিলো। সে কিছু বলতে পারল না। লজ্জার ব্যাপার, একটা লোক মানিব্যাগ বের করে নিচ্ছে, এখন এই কথাটা যদি সে চেঁচিয়ে বলে ওঠে তাহলে কেমন শোনাবে? ওই বেচারাও না জানি কতখানি লজ্জা পাবে। এর চেয়ে চেপে যাওয়াই বরং ভালো । ছোটবেলা থেকেই নিকো এরকম। সে বড় হয়েছে অরফানেজে। সেখানকার বড়রা বলত একদিন সকালে তাকে অরফানেজের গেটে আবিষ্কার করা হয়। কে বা কারা তাকে এখানে ফেলে গেছে কেউ জানত না। ছোটবেলা থেকেই নিকো অসম্ভব ভদ্র ছিল। অভদ্রতামি কী জিনিস সেটা সে জানত না। কেউ অপরাধ করলেও নিজে থেকে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিতো। এজন্য তার কোনো শত্রুও ছিল না।

আজ রাস্তায় জ্যাম ছিল এজন্য এমনিই দেরি হয়ে গেছে। বাসায় গিয়ে আবার তাকে রান্না করতে হবে। এমন অবস্থায় যদি এরকম উটকো একটা লোক পিছু নেয় তখন বিরক্ত লাগাটাই স্বাভাবিক। নিকো হঠাৎ থেমে গেল। তারপর উল্টো ঘুরে লোকটার দিকে ফিরল।লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না , হুডির ক্যাপটা সে নাক পর্যন্ত নামিয়ে রেখেছে। নিকো ধরা গলায় বলল, "তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছু চাও?আমি কি তোমার কোনো কাজে আসতে পারি? কোনোকিছু দরকার হলে..."

নিকো কথা শেষ করতে পারল না। লোকটি তার নাকে নিহিলিন(১) মেশানো রুমাল চেপে ধরল।কিছু বোঝার আগেই

সে জ্ঞান হারাল। লোকটি পকেট থেকে ফোন বের করল। তারপর একটা নম্বর ডায়াল করল। বলল,“কাজ হয়ে গেছে।”
ওপাশ থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, “নিয়ে এসো।”
নিকো আর কিছু সময় জেগে থাকলে দেখতে পেতো লোকটির ডায়াল করা নম্বরটি কোনো সাধারণ নম্বর ছিল না। এই নম্বর শুধুমাত্র বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির রেড সিলপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদেরই থাকে।

২.

কোয়ান্টাম কম্পিউটারটি গরগর শব্দ করে উঠল। মহাজাগতিক সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ী এর অর্থ হলো সে কিছু বলতে চায়। রু জানালা দিয়ে অতিপ্রাকৃত বিশালতা অনুভব করার চেষ্টা করছিল। শব্দে সে সংবিৎ ফিরে পেলো । বলল-
“হ্যাঁ, ফিওনা বলো। কী বলতে চাও?”
“রু, তোমাদের জন্য পৃথিবী থেকে একটি ম্যাসেজ আছে। আমি এটি গত সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে ভিডি টিউবে সংরক্ষণ করে আসছি। যেহেতু আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা নতুন গ্রহটিতে ল্যান্ড করতে যাচ্ছি তাই এখনই এটি বলার সঠিক সময়।”
“হাসালে ফিওনা। এই তিন হাজার বছরে তোমরা নিজেদের মস্তিষ্ককে ভালোই উন্নত বানিয়ে ফেলেছ। হাসি মশকরার মতো মানবিক ব্যাপারগুলো ভালোই আয়ত্ত করে ফেলেছ।”
“সেটা কখনই সম্ভব নয় রু। তোমাদের মস্তিষ্ক বিলিয়ন বিলিয়ন নিউরনের সমন্বয়। আরও কয়েক কোটি বছরেও আমরা তোমাদের সমতূল্য হতে পারব না। এটা সত্যি যে তোমাদের জন্য একটি ম্যাসেজ আছে। তুমি চাইলে এটা তোমাদের সবাইকে একসাথে শোনানো হবে। এতদিন যেসব প্রশ্ন করতে করতে তোমরা আমার নার্ভাস সিস্টেমে সমস্যা বাঁধিয়ে দিচ্ছিলে তার উত্তর এখানে পেয়ে যাবে তোমরা।”
মহাকাশযানটি প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কোন এক গন্তব্যে ছুটে চলেছে। এই মহাকাশযানের যাত্রী পাঁচজন। রু এদের ক্যাপ্টেন। তিন হাজার বছরে মোট ছয়বার তাদের স্লিপিং সেল থেকে জাগানো হয়েছে, বাকি সময়টা তারা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা নতুন একটি গ্রহতে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে। এখন এরকম একটা ম্যাসেজের ব্যাপারে শোনা আসলেই চাঞ্চল্যকর ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে আদিম এক উত্তেজনা অনুভব করে তারা।
“আচ্ছা আমি তাহলে ভিডিওটি চালু করছি,"
বলল ফিওনা।
সবাই একবাক্যে সায় দিলো ।
তাদের সামনে একটি হলোগ্রাফিক পর্দা ভেসে উঠল। তাতে দেখা গেল একজন অতি সুদর্শন পুরুষকে। তিনি প্রথমে এক গ্লাস বাদামী তরল পান করলেন, একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন। তারপর বলা শুরু করলেন,

“আমার হিসাবমতে তোমরা আর এক সপ্তাহের মধ্যেই ইডিরো-৩৫৭ তে ল্যান্ড করবে। এখন তোমাদের কয়েকটা ব্যাপার জানা প্রয়োজন। তোমরা এখন যে সময়টাতে আছো, সেটা হচ্ছে ৬৭২১ সাল। তোমরা জেনে অবাক হবে যে তোমাদের সময় থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এখন আমি যে সময়টাতে আছি সেটা ৩২২৮ সাল। এখন পৃথিবী অনেক বেশি উন্নত, অনেক আধুনিক। তবুও আমরা পৃথিবীকে নিশ্চিত ধ্বংস থেকে বাঁচাতে পারছি না। আমি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সভাপতি কিম শুধুমাত্র হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করতে পারছি না। অথচ পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পেছনেও রয়েছে একটি মাত্র ছোট্ট প্রোগ্রাম। উচ্চিংরে -০৯২১। গত বছর আমাদের কাছে কয়েকজন ক্লায়েন্ট থেকে অভিযোগ আসে যে তাদের জিটি(২)গুলো বারবার কর‍্যাশ করছে। বিভিন্ন ডার্ক ওয়েব অ্যাড্রেসে অটোমেটিক ঢুকে পড়ছে। তখন থেকেই সমস্যাটা শুরু হয়। ছোট্ট একটি প্রোগ্রাম দিয়ে একটি অজানা গোষ্ঠী সম্পূর্ণ পৃথিবীর সমস্ত জিটির কন্ট্রোল নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছে। তথ্যভাণ্ডারের কোনোকিছুই আমাদের হাতে নেই। আমরা জানতে পেরেছি যে চাঁদ থেকে ৪৭ টি গ্লুকোনাইট(৩) মিসাইল পৃথিবীর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। আর তিনদিনের মধ্যেই ওসব পৃথিবীতে আঘাত হানবে। সম্পূর্ণ পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমরা সমগ্র পৃথিবীর মানুষ শান্তিপ্রিয়। তবে একদল উগ্রবাদী, মানসিক ভারসাম্যহীন অথচ অসম্ভব মেধাবী লোকের কারণে পৃথিবী আজ ধ্বংস হতে চলেছে। তোমরাই সমগ্র পৃথিবীর মানুষের প্রতিনিধি। তোমরাই শেষ পাঁচজন জীবিত মানুষ। তোমরা এই মুহূর্তে যে মহাকাশযানটিতে আছো তার নাম 'ইনোপ'।। এটি এখন পর্যন্ত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এটি এতটাই শক্তিশালী যে ব্ল্যাকহোলের বিরুদ্ধেও অ্যান্টি -গ্র্যাভিটি উৎপন্ন করতে পারে। এটিতে এত পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত আছে যে এটি আগামী ত্রিশ হাজার বছর পর্যন্ত মহাশূন্যের পানে নির্দ্বিধায় ছুটতে পারবে। তোমরা হচ্ছো সম্পূর্ণ পৃথিবীর শুদ্ধতম পাঁচজন মানব-মানবী। পুরো পৃথিবী চষে তোমাদের খুঁজে বের করা হয়েছে। তোমাদের মস্তিষ্কে ইরিডিয়াম সংকরায়ন করা হয়েছে যার কারনে থ্যালামাস এবং হাইপোথ্যালামাসের আকৃতি হবে বিশাল। তোমরা অত্যন্ত দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে। তোমাদের জেনেটিক স্ট্রাকচারে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে তোমাদের দেহে ডেথ হরমোন অনেক দেরিতে আসবে। তোমাদের আয়ু হবে অনেক বেশি। তোমরা হবে দ্বিতীয় পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী। আশা করি এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ কেন সাড়ে তিন হাজার বছর ধরে তোমরা এই মহাকাশযানে

পড়ে আছো। তোমাদের প্রতি আমার শুভকামনা। তোমাদের সামনে অনেক বড় দায়িত্ব। আশা করি তোমরা বিফল হবে না। বিদায়। ভালো থেকো।''
দশটি চোখ স্তম্ভিত হয়ে হলোগ্রাফিক স্ক্রিনটির দিকে তাকিয়ে আছে। তারা এখনো বুঝতে পারছে না এই মুহূর্তে তাদের কী করা উচিত।

৩.
পিট এখনো বুঝতে পারছে না যে সে কী করবে। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবার মতো একটা গাঁজাখুরি গল্প কতখানি বিশ্বাসযোগ্য হবে সে জানেনা। তবে বিজ্ঞানী ক্লাসান আদেশ করেছেন যে অভিনয়টা আসল মনে হতে হবে। ওরা পৃথিবীর প্রতিনিধি। ওদেরকে পৃথিবী সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা দেওয়া যাবে না। ওরা যদি জানতে পারে যে পৃথিবীর মানুষেরা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য জানোয়ার হয়ে যায়, নিজেই নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে দেয়,তাহলে সেটা তাদের জন্য ভালো হবে না। সে তার হাতের একটি সুইচে চাপ দিতেই ক্যামেরাটি অন হয়ে গেল। তারপরে সে এক গ্লাস পানি পান করল। এই পানির রঙটিই ইমেজ ইফেক্ট দিয়ে বাদামী করে দিতে হবে। তারপর একটু কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলা শুরু করল...

৪.
''আজ একটা গল্প বলব। কিছুক্ষণের জন্য বিজ্ঞান এর কাঠখোট্টা বিষয়গুলো তোলা থাক। আজ থেকে এক হাজার বছর আগের গল্প। ওই যে একটা কথা আছে না? 'সহজ জিনিস সহজভাবে বলা কঠিন' অনেকটা ওইরকমই। গল্পটা বাচ্চাদের। '৯' একবার '৮' কে চড় মারল কারণ ৮, ৯ এর চেয়ে ছোট ছিল। ৮ গিয়ে ৭ কে চড় মারল। ৭ চড় মারল ৬ কে। এভাবে শেষে এসে ২ চড় মারল ১ কে। এখন নিয়ম অনুযায়ী ১ এর উচিত ০ কে চড় মারা। কিন্তু ১, ০ কে চড় না মেরে তাকে নিজের সাথী করে নিলো । এতেই তারা হয়ে গেল ১০, অন্য সবার চেয়ে বড় আর শক্তিশালী।
আচ্ছা আপনারা কি এই গল্পের সাথে আমাদের বর্তমান অবস্থার সাদৃশ্য খুঁজে পাচ্ছেন? চড় খেতে খেতে আমরা মানব সম্প্রদায় আজ এই অবস্থায় এসেছি। এখন আমাদের অন্য কারও সাথে একীভূত হয়ে কাজ করতে হবে। তাহলেই আমরা সবচেয়ে শক্তিশালী হবো ।
''কিন্তু, কেউ কি এমন কোনো জাতি বা সত্ত্বার নাম বলতে পারেন যাদের শক্তি হয়তো আমাদের চেয়ে বেশি কিন্তু বুদ্ধি কম?''
ভিড়ের ভেতর থেকে কেউ বলে উঠল, ''রোবট''
''একদম ঠিক। রোবট। সহজ ভাবে দেখুন, রোবটের শরীর শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরি,তারা কঠিন কঠিন কাজ অতি সহজে করতে পারে।কিন্তু তাদের ব্রেইনে রয়েছে মানুষের তৈরি প্রোগ্রাম।তারা নিজে নিজে চিন্তা করতে পারে না, নিজে নিজে কোনোকিছু উদ্ভাবন করতে পারে না। অথচ আমরা মানুষ, সামান্য আঘাতে হেরে যাই ঠিকই কিন্তু বুদ্ধির দিক দিয়ে আমরা অসাধারণ ।
এবার ভেবে দেখুন, আপনি একজন মানুষ, আপনার শরীর রোবটের। আপনার দেহ থেকে মস্তিষ্কটা আলাদা করে একটা রোবটের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হলো । কেমন হবে?
আপনার শক্তি কমবে?
কনশাসনেস লোপ পাবে?
চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পাবে?
এগুলোর কোনোটাই হবে না। তবে আপনি আর সামান্য আঘাতে নত হয়ে যাবেন না, আপনার শরীর হবে প্রচন্ড শক্ত। অনেক কঠিন কাজ সহজে করতে পারবেন। আবার আপনার পৃথিবীর খাবারও খেতে হবেনা, অল্প পরিমাণ কেসিনিয়ামেই(১) শরীর ফুল চার্জড হয়ে যাবে।আমরা হবো অমর, আমরা হবো সবচেয়ে শক্তিশালী।
আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এই নতুন প্রজাতি তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা আমরা আমাদের ল্যাবে চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের পরিশ্রম সফল হবে- সে দিন বেশি দূরে নয়।''
বিজ্ঞানী গ্লসিয়াস তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। চারদিকে হাততালির বন্যা বয়ে গেল। সবাই খুব খুশি। সাংবাদিকেরা গ্লসিয়াসকে ঘিরে ধরেছে। সবাই অটোগ্রাফ নিচ্ছে। শুধু বিজ্ঞানী ক্লাসান মুখ শক্ত করে বসে আছেন। তাঁর মনে একটা ব্যাপার খচখচ করছে। গ্লসিয়াস কি তবে তাঁর বক্তব্য থেকে কোনো কিছু এড়িয়ে গেলেন?
খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনোকিছু ?

৫.
বিজ্ঞানী ক্লাসান অনেকদিন পরে তাঁর স্টাডি রুমে প্রবেশ করলেন। এই পুরো রুমটা তাঁর বিভিন্ন আবিষ্কারে ভর্তি। সবচেয়ে বড় করে ঘরের মাঝখানের দেয়ালে আটকানো আছে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের রিসার্চ পেপারটা। পেপারটা ব্রেইন হাইব্রিডাইজেশন এর ওপর তৈরি। এই রিসার্চই তাঁকে রেড কার্ড পেতে সাহায্য করেছিল। একই সাথে তিনি উপহার পেয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর আগেকার একজন অসামান্য মেধাবী মানুষের ব্রেইনের কিছু টিস্যু। তাঁর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। এই লোকটিই আজকের এই আধুনিক পৃথিবীর পথিকৃৎ ছিলেন। একটা সময় ছিল যখন ক্লাসান প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে একবার করে এই টিস্যুগুলো দেখতেন। অসম্ভব মানসিক প্রশান্তি পেতেন। অথচ নতুন একটা রিসার্চ নিয়ে

এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে একমাসে একবারও এই রুমে প্রবেশেরই সুযোগ পাননি। তাঁর রিসার্চটা হলো একদল মানুষকে তাদের পূর্বের সব স্মৃতি ভুলিয়ে মহাকাশযানে করে নতুন একটা গ্রহে পাঠানো হবে।নতুন স্থানে তারা কীভাবে বেঁচে থাকে, কীভাবে খাদ্য উৎপাদন করে, সে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা হবে । যেহেতু পৃথিবী আজ অনেকটাই বসবাসের অনুপযোগী তাই এখন মানুষের উচিত অন্য বাসস্থানের খোঁজ করা। এমনটা যে মানুষ আগেও করেনি, তা নয়। মঙ্গলগ্রহে কয়েকবার বসবাসের চেষ্টা করা হয়েছে এবং মানুষ প্রতিবারই ব্যর্থ। মঙ্গলগ্রহ বর্তমানে মৃত্যুপুরী। তবে এই অভিযানটা ভিন্ন হবে। এই মানুষগুলো জানবে না তারা কোথায় যাচ্ছে, কী করতে যাচ্ছে। যাইহোক,তিনি আজ দেখছেন কাঁচের বোতলে এজপার্মিয়ামে(২) ডোবানো একটা পারমানেন্ট স্লাইড। এই স্লাইডেই আইনস্টাইনের ব্রেইনের টিস্যু আছে। তিনি রোবোটিক হ্যান্ড ব্যবহার করে স্লাইডটি বের করলেন। তারপর মাইক্রোস্কোপের নিচে বসালেন। তবে চোখ রেখে তিনি কিচ্ছু দেখতে পেলেন না। অনেকটা হতভম্ব হয়ে গেলেন। স্লাইডটা ঠিকমত বসিয়ে আবার চোখ রাখলেন।

না, কিচ্ছু নেই। এবার ক্লাসান ভয় পেতে শুরু করলেন। এর সাথে কি তবে গ্লসিয়াসের যোগসূত্র রয়েছে ? তবে কি তিনি যা সন্দেহ করছেন তাই ই সত্যি হবে?

৬.

তিনি নিজের চেহারাকে পুরু গোঁফের সাথে দেখতে অভ্যস্থ। ঠিক কতদিন পরে সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছেন- তিনি জানেন না। শেষবার যখন চিন্তা করছিলেন তখন দেখেছিলেন খুব চিকন ছোট একটা রাস্তা দিয়ে তাঁকে যেতে হচ্ছে। অনেক সামনে বিন্দুর মতো একটা আলো- সেটাই গন্তব্য। যেতে যেতে প্রায় কাছে পৌঁছে গেছেন, আলোটা ছুঁতে যাবেন- এমন সময়ই সব ওলটপালট হয়ে গেল।

'স্যার। উনি মানে রোবটটা চোখ খুলেছে ।'

বিজ্ঞানী গ্লসিয়াস দৌড়ে এলেন। সত্যিই রোবটটা চোখ খুলেছে। এটা আইনস্টাইনের রোবট। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ব্রেইনের টিস্যু থেকে তাঁকে ক্লোন করা হয়েছে। তারপর ব্রেইনটা ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে। ইনিই হলেন এখনকার সময়ের আইনস্টাইন। এবার পূর্বের সব বিজ্ঞানীকে ক্লোন করতে হবে। তাঁদের সবার রোবট তৈরি করতে হবে।

মিডিয়াল(৩) এর হেডলাইনে একটা ভিডিও দেখা যাচ্ছে।বিজ্ঞানী গ্লসিয়াস যা বলছেন, তার সারকথা এই যে, রোবটের শরীরে মানুষের ব্রেইন ট্রান্সপ্লান্ট সফল হয়েছে। নতুন এই প্রজাতির নাম হবে ব্রেনোবট । আর কয়েকটা পরীক্ষামূলক যাচাই-বাছাই করে সকলের জন্য এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। সকলেই চাইলে স্বেচ্ছায় নিজের শরীর ছেড়ে রোবটের শরীর গ্রহণ করতে পারবে।

বিজ্ঞানী আইনস্টাইন অথবা তাঁর ব্রেইনওয়ালা রোবট, যেটাই বলা হোক, তিনি এখনো ধাতস্থ হননি। হলে হয়তো বুঝতে পারতেন, তাঁর ঘাড়ের পিছনে একটি চিপ ঢুকানো আছে। যার মাধ্যমে তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৭.

বিজ্ঞানী ক্লাসান কয়েকদিন হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন। খুব দ্রুত অনেককিছু ঘটে যাচ্ছে। গ্লসিয়াস মানুষদেরকে ব্রেনোবটে রূপান্তরের অনুমতি বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি থেকে পেয়ে গেছেন। অনেক মানুষই এখন ব্রেনোবট হয়ে যাচ্ছে। তবে সমস্যাটা তিনি ধরতে পেরেছেন।

প্রতিটা মানুষেরই একসময় না একসময় মরে যেতে হবে। সে মারা না গেলে নতুনরা সুযোগ পাবে না, নতুনত্ব সৃষ্টি হবেনা। পৃথিবীটা ধীরে ধীরে একঘেয়ে হয়ে যাবে।বিজ্ঞানী গ্লসিয়াস মৃত্যুর মতো একটা অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়াকে থামিয়ে দিতে চাইছেন। প্রকৃতি মানুষের মৃত্যু ঘটায়, যদি প্রকৃতির কাজে কেউ বাধা দেয় তবে তার ফলাফল হয় ভয়াবহ, অত্যন্ত ভয়াবহ। গ্লসিয়াসের ব্রেনোবটরা হয়তো সব কাজ সহজে করতে পারবে তবে তারা জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে পারবে না। আগে নারী পুরুষের যৌনমিলনে সন্তান হতো । আর এখন হবে ব্রেইন হাইব্রিডাইজেশনে। বিজ্ঞানী ক্লাসানের মনে হলো তাঁর মানবজাতিকে রক্ষা করতেই হবে। এই পৃথিবীতে আর নয়, অন্য পৃথিবীতে গিয়ে হলেও মানুষ বেঁচে থাকবে নিজেদের মতো করে।

তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট পিট কে দ্রুত নির্দেশ দিলেন পাঁচজন শুদ্ধতম মানুষ খুঁজে বের করতে। তারপর তিনি একজন প্রফেশনাল হ্যাকার খুঁজে বের করলেন। তাকে কাজ দিলেন একটি ছোট্ট ভাইরাস প্রোগ্রাম তৈরি করতে।

৮.

পিট এইমাত্র তার ৬ মিনিটের অভিনয়টি শেষ করল। এখন সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। কয়েকটা ঘটনা খুব দ্রুত ঘটে যায়, এতটাই দ্রুত যে মানুষ বুঝেও উঠতে পারে না।

এখানেও তেমনই ঘটেছে। দলে দলে মানুষ ব্রেনোবট হয়ে যাচ্ছে। একদল গোপন বিদ্রোহী দেখা দিয়েছে যাদের মতাদর্শ বিজ্ঞানী ক্লাসানের সাথে মিলে যায়। তারা কোনোভাবেই চায় না যে মানুষ ব্রেনোবট হোক। তারা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চায়।

পিট বেরিয়ে এলো। বিজ্ঞানী ক্লাসানের কম্পিউটার থেকে এবার প্রফেশনাল হ্যাকারের তৈরি করা উচ্চিংরে-০৯২১ সব

কম্পিউটারে ছড়িয়ে দিতে হবে। এক সপ্তাহের জন্য সবকিছু বন্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে যত বেশি সম্ভব অ্যান্টি-ম্যাটার মহাকাশযানে মজুদ করতে হবে।

৯.

সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্পন্ন হলো । এতটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ যে রু এবং বিজ্ঞানী ক্লাসান দুজনেই অবাক হয়ে গেলেন। ইনোপকে লঞ্চ করা হলো। কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পেলো না কিছু। তবে কি প্রকৃতি তাদের সাহায্য করছে?

হতেই পারে।

মহাকাশযানটি পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি। এটিতে যারা যাচ্ছে তাদের মস্তিষ্ককে খুব সূক্ষ্ম কিছু ঘটনার মাধ্যমে প্রভাবিত করা হবে।

মহাকাশযানের সবগুলো রোবট পুরোপুরি ডাম্ব রোবট। শুধুমাত্র নির্ধারিত কাজ ছাড়া আর কিছু করতে পারবে না। এমনকি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার 'ফিওনা' পর্যন্ত কোনো কথা বলার আগে গরগর শব্দ করে নেবে। এর অর্থ মানুষের প্রতি সম্মান এবং দাসত্ব। ঠিক যেমনটা আইজ্যাক আসিমভ বলেছিলেন ২০ শতকে ।

ইনোপ লঞ্চ হওয়ার দুদিন পরে গ্লসিয়াস সবকিছুর কন্ট্রোল ফিরে পেলেন। তিনি যদি আর ছয় ঘণ্টা আগেও কন্ট্রোল ফিরে পেতেন তাহলে দেখতেন একটি অত্যাধুনিক মহাকাশযান বৃহস্পতির মহাকর্ষ কাজে লাগিয়ে প্রথম হাইপার ডাইভটি সম্পন্ন করছে।

১০.

সেই প্রফেশনাল হ্যাকারকে ধরা হয়েছে। সে পিট আর বিজ্ঞানী ক্লাসানের কথা বলে দিয়েছে। তাঁদের দুজনকে ধরা হলো। তারপরে একদিন গ্লসিয়াস দুজনকে মঙ্গলগ্রহে পাঠিয়ে দিলেন। এর আগে অবশ্য তাঁদের ব্রেইনের কিছু টিস্যু কপি করে নেওয়া হয়েছিল।

সম্পূর্ণ দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছেন গ্লসিয়াস। শুধুমাত্র কয়েকজন বিদ্রোহী বাদে। সকলের ঘাড়ের মাইক্রোচিপ এর কারণে সকলেই এখন গ্লসিয়াসের হুকুমের গোলাম। এতগুলো শক্তিশালী দেহ মিলেও কয়েকজন বিদ্রোহীর কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। এতে যতটা না অবাক গ্লসিয়াস হচ্ছেন, তারচেয়ে বেশি অবাক হচ্ছে বিদ্রোহীরা। তবে কি এবারও প্রকৃতিই তাদের রক্ষা করছে?

বিদ্রোহীর দলটা অসাধ্য সাধন করে ফেলল।একদিন হঠাৎই পেছন থেকে কয়েকশ পিস্তলের গুলি লাগল গ্লসিয়াসের গায়ে। তাঁর মাথা থেকে ব্রেইনটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। উল্লেখ্য , গ্লসিয়াস নিজে তখনও ব্রেনোবট হননি। এত নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙে সামান্য কয়েকটা হাজার বছরের পুরোনো অস্ত্র নিয়ে একটা দল কীভাবে গ্লসিয়াসকে হত্যা করল তার উত্তর কেউ দিতে পারেনি। গ্লসিয়াসকে মারার পরে বাকি ব্রেনোবটরা বিদ্রোহীদের সবাইকে ব্রেনোবটে পরিণত করল। কিন্তু তারা জানতেও পারল না,নিজেদের অজান্তেই তারা মুক্ত। মুক্ত কারণ এতদিন গ্লসিয়াস তাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন এখন কেউ করবে না। তবে মুক্ত হয়েও তারা প্রকৃতির নিয়মকে লঙ্ঘন করে ফেলেছে।

১১.

৫০০ বছর পর, একটি ট্রেপোসারাসের(৪) মহাকাশযান একটি ভগ্নপ্রায় গ্রহের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজন গ্যালাক্টিক এনসাইক্লোপিডিয়াতে চেক করতেই দেখল, এই গ্রহের নিজেদের ব্রেইনকে রোবটের শরীরে ট্রান্সপ্ল্যান্ট করেছিল। এতে তারা অমর হয়ে যায় ঠিকই তবে জীবনের প্রতি আগ্রহ মরে যায়। মাত্র ১০০ বছর আগে তারা পৃথিবীতে অনেকগুলো গ্লুকোনাইট মিসাইল ব্লাস্ট করে সকলে একসাথে মারা গেছে।

ট্রেপোসারাসের দলটি ধিক্কার দিয়ে উঠল মানুষদের। প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নেয় তখন হয়তো যুক্তি কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

১২.

নিকো বড় পাথরটার ওপরে ওঠে বসেছে। আজ বেশ ভালো বাতাস বইছে।

অসাধারণ এই আবহাওয়ায় একটু একা বসে না থাকলেই নয়। হঠাৎ সে তার হাতের ওপরে অন্য একটি হাতের স্পর্শ অনুভব করে। সে বুঝতে পারে এই হাতটি নিরার।

এই গ্রহটাও পৃথিবীর মতোই । পৃথিবীর মতোই এই গ্রহেও বৃষ্টি নামে। তবে এখানকার গাছগুলো অন্যরকম আর বাতাসে অক্সিজেনও তুলনামূলক বেশি।

হঠাৎ বৃষ্টি নামল। নিকো আর নিরা দুজনেই ভিজে যেতে লাগল। এসময় আশেপাশে বিজ্ঞানী ক্লাসান থাকলে দেখতে পেতেন দ্বিতীয় পৃথিবীর প্রথম এবং সবচেয়ে পবিত্র ভালোবাসা ।

পাদটীকা:

১. কেসিনিয়াম: তেইশ শতাব্দীর আবিষ্কার। রোবটদের পাওয়ার আপ করার জন্য ব্যবহৃত তরল।

২.এজপার্মিয়াম: ফরমালিনের বিকল্প। অ্যামাইডের জাতক যৌগ।ফরমালিনের মতোই কাজ করে, বিষপ্রভাব মুক্ত।

৩. মিডিয়াল: ত্রিশ শতাব্দীর পত্রিকা। সাথে ভিডি টিউব যুক্ত থাকে বলে ভিডিও দেখা যায়।

৪.ট্রেপোসারাস: আলফা সেন্টুরি নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত একটি গ্রহের জীব।এরা অন্যের মনের কথা বুঝতে পারে।

মোবাইল,কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে কোনো কিছু রিমুভ/ডিলিট করার পর তা কোথায় যায়?

প্রশ্ন: অনিরুদ্ধ অর্কভ
উত্তর: Md Jobayer Hosen

Mouse দিয়ে বা নরমাল ডিলেট করলে সেটা রিসাইকল বিন নামে অন্য একটা ডিরেক্টরিতে মুভ হয়ে যায়। কিন্তু এতে স্পেস খালি হয় না। অন্য জায়গায় শুধুমাত্র মুভ হয়।
আর শিফট বাটন চেপে ডিলেট করলে বা পার্মানেন্টলি ডিলেট করলে সেটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ডিলেট হয় না। যেখানে ছিল সেখানেই থাকে। শুধু পয়েন্টার ডিলেট হয়।
মনে করুন আপনাকে বলা হলো, একটা পেনসিল দিয়ে লেখা বইয়ের ১০ম চ্যাপ্টার মুছে ফেলতে। আপনি করলেন কি, বই থেকে ১০ম চ্যাপ্টার না মুছে 'সূচিপত্র' থেকে ১০ম চ্যাপ্টার লেখা টা মুছে দিলেন এবং বললেন অমুক পৃষ্ঠা থেকে অমুক পৃষ্ঠা পর্যন্ত খালি করে ফেলেছি (ফাইল এক্সপ্লোরার কিন্তু সূচিপত্রের মতো)। পুরো অধ্যায় টা কিন্তু দিব্যি সেখানে আছে।
পরে যখন আপনাকে বলা হলো ঐ খালি পৃষ্ঠাগুলোতে অন্য কিছু লিখ, তখনই আপনি আগের লেখা গুলো মুছে নতুন লেখা যোগ করলেন। আগেভাগে মুছে সময় নষ্ট করার কী দরকার!
কম্পিউটার স্টোরেজ অ্যালোকেশন এভাবে কাজ করে।
তাই যতক্ষণ নতুন কিছু লেখা হচ্ছে না, ততক্ষণ আপনার আগের ডেটা রিকভার করার একটা উপায় থাকে।
কুইক টিপসঃ যদি কখনো খুব দরকারি কিছু ডিলেট হয়ে যায় এবং আপনি সেটা যে কোনো মূল্যে রিকভার করতে চান, বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে ডিভাইসে কোন কিছু ইন্সটল না করা, পারলে ডিভাইসটার ব্যবহার আপাতত বন্ধ রাখা।

পেট্রোলের ঘ্রাণ নিতে ভালো লাগে কেন? আর এই ঘ্রাণ নেয়ার মধ্যদিয়ে আমাদের দেহের কি কোন ক্ষতি হয়?

প্রশ্ন: Ryan Rayhan
উত্তর: -

পেট্রোলের একটা উপাদান হল বেনজিন বা বেনজিনের জাতক। অন্য কথায়, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন। বেনজিনের সুগন্ধে আমাদের নাক অত্যন্ত সেনসিটিভ আর বেনজিনের সুগন্ধ এতই তীব্র যে লক্ষ লক্ষ অণুর মধ্যে এক অণু বেনজিন থাকলেও আমাদের নাক সেটা ঠিকই ধরে নেবে। অ্যারোমেটিক যৌগগুলোর একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই সুগন্ধ। এজন্য শুধু পেট্রোল না, ন্যাপথলিন, টলুইন, তারপিন, থিনার, মার্কারের কালি, দেয়ালের রং, বার্নিশ, এলকোহল ইত্যাদি আরও অনেক যৌগের গন্ধ অনেকের কাছে ভালো লাগে। সেন্ট বা সুগন্ধী, বডি স্প্রের গন্ধও একই কারণে ভালো লাগে। অনেকে এসব গন্ধে আসক্ত হয়ে পড়তে পারে, কিছুটা নেশার মতো।

নিয়মিত ঘ্রাণ নিলে নেশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা আছে। দীর্ঘ সময় ধরে ও নিয়মিতভাবে গ্যাসের ঘ্রাণ নেওয়াকে অনেক ক্ষেত্রে অ্যালকোহল সেবনের বিকল্প রাস্তা হিসেবে ধরা হয়। কারণ এসব গ্যাস আমাদের নার্ভাস সিস্টেমের ক্ষতি করে, রক্তে মিশে রক্ত দূষিত করতে পারে, কিছুটা ধূমপান বা অ্যালকোহল সেবনের মতোই। পেট্রোল বা গ্যাসোলিনের গন্ধ নেওয়াকে এজন্য ক্ষতিকর হিসেবেই ধরা হয়। এই ক্ষতির কারণ অবশ্য শুধু বেনজিন না, বরং পেট্রোলে থাকা অন্যান্য উপাদানই মূল

ঘূর্ণিঝড়ের নাম এত আগে থেকে কীভাবে তৈরি করা থাকে?

প্রশ্ন: Meghla Ahmed
উত্তর: Sadman Rafid Shibbir Ahmed

মনে করুন, আমরা এখন ঘূর্ণিঝড় বিষয়ে একদল এক্সপার্ট । আমাদের কাজ হচ্ছে কোনো ঘূর্ণিঝড় হলে তার ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয় করা, মানুষজনকে সচেতন করা ইত্যাদি। তো আজকে সকালে রাডারে একটি ঘূর্ণিঝড় দেখতে পেলাম। সবাইকে জানালাম। আমি বললাম x, অন্যজন তাকে ডাকল y, আরেকজন z, এইভাবে অনেক নাম হয়ে গেলো। তখন মানুষ তো দ্বিধায় পড়ে যাবে কয়টা ঘূর্ণিঝড় আসছে। তখন ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে যাবে।
তাহলে কি করা যায়?- এক কাজ করলে কেমন হয়, যদি আগে থেকেই কয়েকটা নাম দিয়ে দেই! নাম দিলে তো সমস্যা নেই। এরপর যেই ঘূর্ণিঝড় আসবে তার নাম x, এরপর y ইত্যাদি ইত্যাদি । এতে করে কমিটির সবাই আগে থেকেই তথ্য পেয়ে যাবে এবং তারা ভুল তথ্য ছড়াতেও পারবে না। এতে বিভ্রান্তিও ছড়াবে না।
২০০৪ সালে ৬৪ টি নাম নিয়ে যে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল, আম্ফান তার সর্বশেষ নাম। অর্থাৎ ২০২০ সাল থেকে নতুন তালিকা শুরু হবে। এই তালিকায় আছে ১৬৯ টি নাম, যার মধ্যে বাংলাদেশ দিয়েছে ১৩টি নাম, ওই ১৩ টি নামের মধ্যে আবার আপনার নাম অর্থাৎ ‘মেঘলা’-ও আছে।

সবচেয়ে প্রাচীন প্রোগ্রামিং ভাষা কোনটি যেটি মানুষ পড়ে স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারতো অর্থাৎ মানুষের বোধগম্য ছিল?

C এর সাহায্যে যেখানে অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করা হয়েছে/হচ্ছে এবং যার প্রসেসিং/কম্পাইলিং স্পিড এতো বেশি, সেখানে এই ভাষাটি ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য সার্ভার সাইডে ব্যবহার করা হয় না কেন? অ্যান্ড্রোয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টেও এর ব্যবহার সীমিত, এর কারণ কী?

প্রশ্ন: Monzurul Hasan
উত্তর: তানভীর রানা রাব্বি , Prot Toy

► প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিলো Plankalkul। কিন্তু কমার্শিয়াল প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল FORTRAN। আর মানুষের কাছে বোধগম্য প্রথম কমার্শিয়াল প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ C ই হবে।

আর C ওয়েবে ব্যবহার না করার অনেক কারণ আছে। তারমধ্যে একটা হলো, সি নিম্ন স্তরের ভাষা আর OOP না হওয়ায় ম্যানুয়াল রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট করতে হয় যেটা বেশ ঝামেলার। ওয়েবের ক্ষেত্রে এত কাহিনী ভালো না। তার থেকে সহজ করে বানানো হয়েছে .NET, কত্ত ইজি, সেখানে C বেশ ঝামেলাপূর্ণ।

আর অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে এর ব্যবহার কম বলে নেইই তো। ঠিক আছে, ধরে নিচ্ছি, C দিয়ে সব করা যাবে কিন্তু সেটা কষ্টসাধ্য। এদিকে অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্ট টিম যখন SDK বানায় তখন তারা দেখে যে জাভা দিয়ে তাদের কাজ সহজ হয়। তাছাড়া জাভা সহজ এবং পোর্টেবল। তাই তারা সেটা করেছে।

► C মূলত ওয়েবে ব্যবহৃত হয়। ডিরেক্টলি নয়, ইনডিরেক্টলি। কিন্তু কীভাবে?
PHP এর যে ইন্টারপ্রেটার তা মূলত PHP কোডকে তার সমতুল্য C কোডে ইন্টারপ্রেট করে চালায়। আবার পাইথনও আসলে ইনডিপেন্ডেন্ট কোনো ল্যাংগুয়েজ না। এটা ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিকেশন।
C আসলে সব জায়গাতেই বা সব কিছুতেই ব্যবহৃত হচ্ছে। Directly or indirectly। কারণ এই C ই এ পর্যন্ত একমাত্র ল্যাংগুয়েজ যা সরাসরি হার্ডওয়্যারের সাথে ইন্টারফেসিং করতে পারে।
কিন্তু সবকিছুর মতো এই সুবিধাগুলোরও ট্রেড অফ আছে। যদি তা না থাকতো আর C যদি পারফেক্ট হতো তাহলে আর এতো শত ল্যাংগুয়েজ এর আবির্ভাব হতোনা।(কেউ হয়তো তারপরও পাকামো করে বের করতো)
যাইহোক, হাই লেভেল বেশিরভাগ ল্যাংগুয়েজ দেখবেন নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে জনপ্রিয়। কারণসহ উদাহরণ দেইঃ
১) Java: জাভার উৎপত্তির পেছনের আইডিয়াটা ছিলো machine independence. অর্থাৎ Write Once Run Anywhere। বিস্তারিততে যাচ্ছিনা। তবে জাভা দিয়ে প্রায় সব ধরণের হাই লেভেলের কাজ করা গেলেও দেখা যায় এর মূল জনপ্রিয়তা handheld আর embedded device এ।
২) PHP: একজন ওয়েব ডেভেলপারের তো সিস্টেমটা কীভাবে চলছে তা জানার দরকার নাই। মাথাব্যথা হওয়ারও কথা না। তার এমন একটা ল্যাংগুয়েজ দরকার যেটা ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড (HTML) এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে দেখবে HTML এর সাথে PHP or vice versa সহজে ব্যবহার করা যায় কিনা। That's it.
৩) Python: আগেই বলছি এটা পিওর কোনো ল্যাংগুয়েজ না, বরং ল্যাংগুয়েজ স্পেসিফিকেশন এবং এই স্পেসিফিকেশন এর অনেক প্রকার ইম্পলিমেন্টেশন আছে। পপুলার হচ্ছে CPython & Jython.
এই পপুলারিটি যাচাই করলে দেখা যাবে ডাটা সাইন্স এবং সাইন্টিফিক কাজে পাইথন সবচেয়ে পপুলার। কারণ হচ্ছে এর সিম্পলিসিটি। একজন ডাটা সাইন্টিস্টের এত সময় নেই যে ডাটাকে বিভিন্ন ডাটা টাইপে ম্যানুয়ালি কনভার্ট করে হিসেব করবে। আবার একজন বিজ্ঞানের গবেষকের প্রোগ্রামের রকেট স্পিড পাওয়ার দরকার নেই কিংবা তার এত কঠিন কঠিন keywords, rules মনে রাখার দরকার নেই। কারণ in the first place ওটা তার profession নয়।
তাছাড়া পাইথনের পপুলারিটির পেছনে আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে এর বিল্ট ইন এবং থার্ডপার্টি লাইব্রেরিগুলোর বিশালতা। বারবার চাকা আবিষ্কারে সময় ব্যয় না করে অন্য কাজে ব্যয় করাই উত্তম। আর স্যাডলি C তে ঠিক তাইই করতে হয়।

লজ্জাবতী গাছের মধ্যে কী এমন আছে যে স্পর্শ করা মাত্রই সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়?

প্রশ্ন: Syed Mubashwir
উত্তর: Monif Shah Chowdhury

লজ্জাবতীর ছোট পত্রকগুলো আলো পেলে খুলে যায়, অন্ধকারে বন্ধ হয়। কিন্তু হঠাৎ ছুঁলে লজ্জাবতীর পাতা নুয়ে তো পড়েই, ছোট পত্রকগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়টি বিজ্ঞানীদেরও বেশ ভাবিয়েছে। শেষে তারা লজ্জবতী গাছ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেনেছেন দারুণ কিছু বিষয়।
লজ্জাবতীর পাতা কেন সঙ্কুচিত হয় বা নুয়ে পড়ে, এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জানান, লজ্জাবতী গাছের পাতার গোড়া একটু ফোলা থাকে। এর ভেতরে বড় বড় অনেক কোষ আছে। এসব কোষ যখন পানিভর্তি হয়ে ফুলে ওঠে, তখন লজ্জাবতী পাতার ডাঁটাটি সোজা হয়। কিন্তু হঠাৎ পাতা স্পর্শ করার সাথে সাথে 'অ্যাসিটাইর কোলিন' জাতীয় একধরনের রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে একটা তড়িৎ প্রবাহ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। এই রাসায়নিক পদার্থ খুব দ্রুত এক কোষ থেকে আরেক কোষে যেতে পারে। এর প্রভাবেই পাতার গোড়ার ফোলা কোষগুলো থেকে খনিজ লবণ হঠাৎই বাইরে বেরিয়ে আসে। ফলে তার সাথে ফোলা কোষ থেকে পানিও বেরিয়ে পেছন দিককার কোষে চলে যায় এবং ফোলা কোষগুলো যায় চুপসে। আর কোষ চুপসে গেলেই তাদের চাপ কমে গিয়ে পাতার ডাঁটাটি আর সোজা থাকতে না পেরে নুয়ে পড়ে।

মিনি সাই-ফাই

পৃথিবী ধ্বংসের মুখোমুখি। আর ৫ মিনিট পরেই পৃথিবীর প্রতিটি কণা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে.... ৫, ৪, ৩, ২, ১ বুম!

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে ইন্টার-গ্যালাকটিক টিভিটি বন্ধ করে দিলো ইভান, দূষণে ভরপুর মাতৃগ্রহটি তার মোটেও প্রিয় ছিলো না।

-মুহাম্মদ আহসান নাহিয়ান

পিয়ানো

নাঈম হোসেন ফারুকী

১.

অনেকদিনের পুরোনো বাড়ি।এখানে ওখানে রং উঠে গেছে ধুলোর পুরু আস্তর জন্মেছে চিলেকোঠায় ।পুরো দেয়ালের রং উঠে গেছে, মেঝে থেকে নানান জায়গায় খসে গেছে কাঠের তক্তা।

ডক্টর স্টেইনব্রেকের জন্য অবশ্য আদর্শ জায়গা।

ভয়াবহ গোপন একটা প্রজেক্টে কাজ করছেন তিনি।তাঁর দরকার নির্জন একটা ল্যাবরেটরি। গভীর জঙ্গলে পুরোনো এই বাড়িটা অনেক সস্তায় পাওয়া গেছে।বাড়িটাকে ঠিকঠাক করে মেশিনপত্র এনে বসালে সেটা হবে গবেষণা করার আদর্শ জায়গা।

তাছাড়া অনেকদিন আগে এই বাড়িটাতে এমনিতেও একটা ল্যাবরেটরি ছিল।এই বাড়ির পুরোনো মালিক নানান জায়গায় তাঁর ছাপ রেখে গেছে। একপাশে একটা বিরাট বড় সার্জারির রুমও আছে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, আগের মালিক সযত্নে তাঁর সব কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছে, সে কি নিয়ে কাজ করত কোনো প্রমাণ নেই।

বায়োলজি ল্যাব স্টেইনব্রেকের কতটা কাজে লাগবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তাঁর কাজ ফিজিক্স নিয়ে। এমন একটা আইডিয়া তাঁর মাথায় এসেছে যেটা আর কোনোদিন কেউ ভাবতেও পারে নি।

বাড়িটায় ঢুকতে যাবেন, বাইরে দেখলেন বিরাট বড় কালো একটা ল্যাব্রাডর কুকুর।বড় বড় চোখ করে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। স্টেইনব্রেকের মায়া লাগল।ঘর থেকে একটা মাংসের টুকরা বের করে কুকুরটাকে দিলেন।

কুকুরটার মুখ দিয়ে ঘরঘর একটা শব্দ বের হলো।

২.

১০ বছর আগের কথা।

ভ্যান লিবনিয রাত জেগে কাজ করছেন।তাঁর চোখে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছে।

এমন একটা আবিষ্কারের দ্বারপ্রান্তে তিনি যেটা পৃথিবীর কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি।
কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো এই আবিষ্কারের খবর মানুষকে জানতে দেওয়া যাবে না।কোনদিন না।
আর মাত্র কয়েকটা দিন।অলরেডি ইঁদুর, গিনিপিগ আর বানরের উপর পরীক্ষা করা হয়েছে।এবার দরকার মানুষ।
বাইরে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে উঠল ।এত রাতে কে এসেছে এই জঙ্গলে?
ভ্যান লিবনিজ এক মুহূর্ত ভাবলেন।তারপর পিস্তলটা নিয়ে বের হলেন।তাঁর চোখগুলো চকচক করে উঠল।

৩.
স্টেইনব্রেকের কাজ অনেকদূর এগিয়েছে।বাসার সামনে বিশাল মেশিনটা প্রায় দাঁড়িয়ে গেছে। স্টেইনব্রেক সারাদিন খাটাখাটনি করেন।তারপর ঘুমাতে যাওয়ার আগে এক ঘন্টা পিয়ানো বাজান। তাঁর দেহমনে এক ধরনের প্রশান্তি ছড়িয়ে পরে।
রাত গভীর।স্টেইনব্রেকের কী কারণে জানি ঘুম ভেঙ্গে গেল।শুনতে পেলেন নিচে পিয়ানোটা বাজছে।অবিকল তিনি যেই সুরে বাজান ওই একই সুর!
স্টেইনব্রেক চুপি চুপি নিচে নামলেন।তবু সিঁড়ি দিয়ে নামতে একটু শব্দ করে ফেললেন।সাথে সাথে পিয়ানোর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল।
ভূতুরে জিনিস পরেও চিন্তা করা যাবে।কালকে তাঁর বিগ-ডে, মহা সাফল্যের দিন।টাইম মেশিনটা প্রায় রেডি।
কাল তিনি অতীতে পারি জমাবেন।দশ বছর অতীতে।
যে কাজ কেউ কোনোদিন করেনি, কোনোদিন করবেও না।

৪.
ভ্যান লিবনিজ খুব খুশি।
ভিক্টিমকে ধরতে পেরেছে।তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে সার্জারি রুমে।
এক খাটে ভিক্টিম, আরেক খাটে কুকুরটা বাঁধা।
কুকুরটার কাজ শেষ।একটা শেষ পরীক্ষা।তারপরই তার মুক্তি।
ব্রেইন ট্রান্সপ্ল্যান্টে এতদূর সফল এর আগে কেউ হয় নি।লিবনিজ এবার ইতিহাস গড়বেন।
এর আগে ইঁদুরের ব্রেইন গিনিপিগে লাগিয়েছেন, বানরের ব্রেইন বিড়ালে।
এবার মানুষের পালা।
কুকুরের ব্রেইনটাকে ফেলে দিতে হবে, কিচ্ছু করার নেই।তার বদলে অনেক ভালো আর দামী একটা ব্রেইন পেতে চলেছে সে।
৫.
গভীর রাত।
গহিন জঙ্গলে একেবারে নির্জন একটা বাড়িতে পিয়ানো বাজছে।
কেউ খেয়াল করলে দেখতে পেতো কালো একটা ল্যাব্রাডর কুকুর অবিকল মানুষের ভঙ্গিতে দাড়িয়ে করুন সুর তুলে চলেছে পিয়ানোয়!

খাস্তগীরের পাঠশালা

সাইফুল ইসলাম টিপু

১.

চোখে চোখে তাকিয়ে আছি সমানে সমান; মাঝেমাঝে ভ্রুজোড়া একটু কুঁচকে যাচ্ছে আমার, তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হচ্ছে দৃষ্টি, কিন্তু তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, শুধু পায়ে পা ঘষে যাচ্ছে; দশ সেকেন্ড, বিশ সেকেন্ড, এক মিনিট, দুই মিনিট, পাক্কা তিন মিনিটের টানটান স্নায়ু যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, "কবুল, এই কবুল! কবুইল্লা! ওই কবুইল্লা!"। আশ্চর্য ব্যাপার হলো যদিও নাম তার কবুল কিন্তু 'কবুইল্লা' না ডাকা পর্যন্ত তার সাড়া পাওয়া দুষ্কর! আর একটা মানুষের নাম কবুল রাখে কোন আবুলে! অদ্ভুত!

- "জ্বী বস?" হন্তদন্ত হয়ে আসে কবুল।

তোমাকে কতদিন না বলেছি আমাকে চা দিবে চিনি ছাড়া?

- "বস কি চায়ে চুম্মুক দিছেন? চুম্মুক ছাড়া কেমনে বুঝলেন চিনি দিছি কী দেই নাই?" খানিকটা তেজের সাথেই বলে কবুল। "চিনি ছাড়াই যদি হবে তাহলে কোন গুপ্তধনের আশায় এই মাছিখানা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তুমি কাপ রেখে যাওয়ার সাথে সাথেই? চা খাওয়ার আশায়? এটা কি তবে চৌ-মাছি? হ্যাঁ?", ভ্রু নাচিয়ে কিঞ্চিৎ নাটকীয় ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করি তাকে, হারার পাত্র নই আমি।

বেরসিক মোবাইলটা আর বেজে উঠার সময় পেল না, অদ্ভুত ব্যাপার; যখনই ব্যস্ত থাকি বা দূরে থাকি তখনই তিনি বেজে উঠেন। এসে নির্ঘাত দেখব বস জরুরী কোন কাজে ফোন করেছিল, কল ব্যাক করার পর, প্রথমে যে কথা শুনতে হবে, "তোমাকে তো কাজের সময় কখনই পাওয়া যায় না! কি ব্যাপার শুনি?" তখন কি আর বলা যায় এই অধম ত্যাগের উল্লাসে মত্ত ছিল!

- "হ্যালো?" অপরিচিত নাম্বার, বেশ আয়েশের সাথেই ধরলাম ফোনটা।

-"খাস্তগীর আপনার কে হয়?"

- অপরিচিত নারী কণ্ঠ, কণ্ঠে যেমন তেজ তেমনি কর্তৃত্ব ঝরে পড়ছে, খানিকটা রোমান্টিকতার ছোঁয়াও পেলাম। কিন্তু খাস্তগীরের নাম শুনে অবচেতন মন আমার রোমান্টিকতার লাগাম টেনে ধরল। "হ্যাঁ, খাস্তগীর আমার বাল্য-বন্ধু।", মনে মনে

ভাবছি, ‘‘কি ব্যাপার? পাত্র-পাত্রী ঘটিত কোন কেস না তো!’’ খানিকটা স্বপ্রণোদিত হয়ে বললাম, ‘‘ছেলে হিসাবে সে কিন্তু যাকে বলে, একেবারে অসাধারণ’’

-‘‘জ্বি, ছেলে হিসেবে কেমন সেটা জানার জন্যে ফোন দিয়েছি’’।

- সুরেলা কণ্ঠে কানে যেন মধু বর্ষণ হচ্ছে আমার, তার উপর এমন অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদ! খানিকটা উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে গদগদ হয়ে বললাম, ‘‘আমরা খুব ভাল বাল্য-বন্ধু, সে আমার পরামর্শ ছাড়া এক পা ও নড়ে না।’’

‘‘জ্বি, সেটাই অনুমান করতে পারছি; আমি ডিবির এ.এস.পি রোকসানা পারভীন বলছি, আপনাকে এক্ষুনি আমাদের কার্যালয়ে আসতে হবে।’’

- কোকিলিয়ার কাকেতে রূপান্তর! কর্কশ পুলিশি স্বরে মধু বর্ষণ মুহূর্তেই রূপ নেয় তীক্ষ্ণ অম্লে; কয়েকটা স্পন্দন ফসকিয়ে যায় বেচারা হার্টের। পরিস্থিতির এমন দৈবত পরিবর্তনে হতভম্ব হয়ে কখন যে চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে আমতা আমতা করে, ‘‘জ্বী! জ্বী ম্যাডাম! জ্বী ম্যাডাম!! আপনি যেখানে আসতে বলবেন সেখানেই হাজির হয়ে যাবো, ম্যাডাম। না! না!! কোন ফোর্স পাঠাতে হবে না, খামোখা কেন কষ্ট করবেন, আমি নিজেই চলে আসছি, জ্বী, এক্ষুণি আসছি, এক্ষুণি, জ্বী।’’ বলে যাচ্ছি সেদিকে আমার কোন খেয়ালই নেই। ফোনটা রেখে দেখি বদমাইশ টা চোখে ফেড়ে আমাকে দেখছে আর হাসি যেন কেউ ক্লিপ দিয়ে টেনে আটকিয়ে রেখেছে দুই কান অবধি! শার্টের হাতা দিয়ে কপালে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘামের ফোঁটা মুছে চেয়ারটায় বসে পড়লাম ধপাস করে। মাথার মধ্যে অসংখ্য সম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু কোনোটার ব্যাপারেই নিশ্চিত হতে পারছিলাম না, হাজার হলেও খাস্তগীর হারামজাদাটা জড়িত বলে কথা! তাই বলে ডিবির খপ্পরে? শালা মরার আর জায়গা পেলি না? মরলে মরবি কিন্তু এর মধ্যে আমাকে জড়ালি কেন? একবার এ থেকে বের হয়ে নেই, তোর চৌদ্দগুষ্টির ধারের কাছেও ঘেঁষবো না; আপন মনে খিস্তি করতে করতে অফিস থেকে বের হলাম, তার আগে প্রকৃতিকে একটু ভারী করতে ভুলিনি।

২.

‘‘হারামখোরের বাচ্চা! আমারে চিনস না, নাহ? এইবার চিন্না রাখ! কত্ত বড় সাহস, আমারে চোখ মারস? তোর জিব্বা টাইন্না ছিঁইড়া ফালামু লগে তোর বাপের কইলজাও’’, দশাসই নিতম্ব দুলিয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে করতে ঘরে প্রবেশ করে বিশালদেহী এক ললনা।

বুকের উপর নেমপ্লেট জ্বলজ্বল করছে, ‘‘রোকসানা পারভীন’’; আমার কলিজায় কাঁপন ধরে গেল মুহূর্তেই; কার না কার জিহ্বা বেচারা! চোখের দোষে আজ মরতে বসেছে। শব্দ করে চেয়ারটা টেনে বসার আগে টেবিল থেকে নোংরা তোয়ালেটা তুলে হাতের মধ্যে লেগে থাকে রক্ত মুছে নেয়; নিশ্চয়ই থার্ড ডিগ্রী প্রয়োগ হয়েছে কারো উপর।

নিজের ঢোক গেলার শব্দ নিজের কানে শুনতে পেলাম, পেটও গুড়মুড় করে ডেকে যাচ্ছে। আর আমি নিজেকে প্রবোধ দিচ্ছি, ‘‘রিল্যাক্স ম্যান, রিল্যাক্স’’। জীবনে যত দোয়া শিখেছিলাম একে একে সব পড়া শুরু করলাম, আশ্চর্য সবচেয়ে আবশ্যক দোয়া ‘আয়াতুল কুরসী’ টাই মনে করতে পারছি না! ওদিকে পাশে বসে আপন মনে বিড়বিড় করছে খাস্তগীর।

হঠাৎ অফিসার রোকসানা ড্রয়ার খুলে ছোট পকেট-আয়না বের করে লিপস্টিক ঠিক করতে লেগে গেল। টর্চার কি লিপের মাধ্যমে করেছে না কী? জিহ্বা ছিড়ে ফেলার কথা বলছিল। আতঙ্ক এবার তুঙ্গে আমার, ইয়া নাফসি’ ইয়া নাফসি’ করছি আপন মনে। হঠাৎ বা হাতে তুড়ি বাজিয়ে তর্জনীর ইশারায় আমাদের কাছে ডাকে ডিবির এ.এস.পি, রোকসানা পারভীন।

- ‘‘কি মিশনে খাস্তগীরকে বালিকা স্কুল, মহিলা কলেজ ও লেডিস হোস্টেলে পাঠানো হয়েছে?’’, কোন ভূমিকা না করে সরাসরি এমন প্রশ্ন? তাও রক্ষে প্রথমেই দু ঘা লাগিয়ে দেয়নি।

‘‘উদ্দেশ্য কী, শুনি? কোন নাশকতার বা অপহরণের পরিকল্পনা না তো?’’

এখনো কোন সম্মোধনে আসেনি, ভাব বাচ্যে কথা বলছে। মুখের ভাষায়ও বেশ ভদ্রতা ফিরে এসেছে; লক্ষণ ভালো না খারাপ বুঝতে পারছি না। গলা হালকা খাকাড়ি দিয়ে বললাম, ‘‘খাস্তগীর আমার বাল্যবন্ধু, এর বাইরে আর কোন সম্পর্ক নেই। একটু পাগলামি ভাব আছে ছোটবেলা থেকেই। এ ছাড়া আর কোন সমস্যা নেই।’’, গলার স্বর নিজের কানেই কেমন কিম্ভূতকিমাকার লাগছিল!

- ‘‘কিন্তু ফোনে তো আপনি অন্য রকম কথা বলেছিলেন?’’

‘আপনি’ সম্মোধন পেয়ে ধরে একটু প্রাণ ফিরে এলো; ফোনে আমি কি ভেবে কি বলতে চেয়েছি সেটা খুলে বললে পরিস্থিতি কি দাঁড়াতে পারে সেটা চিন্তা করে ঐ পথ আর না মাড়িয়ে বললাম, ‘‘স্কুল থেকেই অসম্ভব বিজ্ঞানমনস্ক, সারাক্ষণ বিজ্ঞানের বিভিন্ন থিওরি, সূত্র নিয়ে থাকতে থাকতে মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে শুধু আলতো করে ঝুলে আছে, যে কোন সময় খসে পড়তে পারে; এমনিতে...’’, ওষ্ঠাগ্রে ‘ছেলে’ প্রায় চলে এসেছিল মুহূর্তেই সংশোধন করে বললাম, ‘‘এমনিতে মানুষ হিসাবে অসাধারণ। কোন স্ক্যান্ডাল নেই, ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই, পাড়া-প্রতিবেশীরাও ভালো জানে।’’

- হুমম, আমাদের এমনই ধারণা হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের ইনফর্মাররা ওনাকে ফলো করে মেয়েদের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও হোস্টেলে সামনে হাতে এই যন্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে; টেবিলে উপর রাখা ছোট রেডিও মতো দেখতে একটা কিছুকে ইঙ্গিত করে বলেন তিনি, আর এখানে ধরে আনার পর

থেকে কোন কথাই বলছেন না, শুধু বিড়বিড় করছে আর গোঁ-গোঁ-গোঁ শব্দ করছেন। শেষে উনার মোবাইল ঘেঁটে আপনার নাম্বার পেয়ে যোগাযোগ করেছি।

‘‘খাস্তগীরের আসলে পুলিশো-ফোবিয়া আছে।’’, অনেক কষ্টে ঠোঁটের কোণে প্রায় চলে আসা হাসিটা আটকিয়ে বলি। কি কান্ডটাই না ঘটেছিল সেদিন, মনে পড়লে এখনো পেটে খিল লেগে যায়।

- ‘‘ঠিক আছে, আজকের মতো মুচলেকা দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি; তবে ভবিষ্যতে চোখে চোখে রাখবেন আপনার এই বন্ধুকে।’’

ভয়ংকর বিধ্বংসী যন্ত্র সন্দেহে পুলিশ যেটা জব্দ করেছিল, সেটা গুছিয়ে ডিবি কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় তা দূর থেকে রোকসানা পারভীনের দিকে তাক করে খাস্তগীর; একটা লিভার ঘুরিয়ে বাটন চাপ দিতেই টুটুত টুটুত করে বেজে উঠে সেটা মৃদু শব্দ করে, ডিসপ্লেতে ভেসে উঠে ‘‘৬ সপ্তাহ’’।

খাস্তগীর মুচকি হেসে ফিসফিস করে বলে রোকসানা পারভীন মা হতে চলেছে।

এতক্ষণে তার যন্ত্রের কার্যকারীতা সম্বন্ধে কিছুটা ধারনা পেলাম। ভয়ংকর বিধ্বংসী যন্ত্রই বটে! হারামজাদা রিমোট-প্রেগনেন্সি টেস্টার নিয়ে মেয়েদের কলেজে কলেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কষে লাথি মারার অদম্য ইচ্ছাটাকে চাপা দিয়ে মনে মনে দ্রুত থানা থেকে বের হয়ে এলাম।

৩.

কটমট করে তাকিয়ে বললাম, ‘‘তোর মতলবটা কি খুলে বল তো?’’

কিছুটা অবাক হয়ে মুহূর্তক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে খাস্তগীর, যেন মহা বিরক্ত এমন ভাব করে বলে, ‘‘অদ্ভুত তোদের সাধারণ জ্ঞান! আশ্চর্য, আমি এই এই যন্ত্র নিয়ে কি করছি এটা এতক্ষণেও বুঝতে পারিস নি, তোদের আসলে ঘাড়ের উপর শুধু এই খুলিটাই আছে, ভেতরটা স্টেডিয়াম। আরে এটা দিয়ে আমি স্টুডেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি!’’

এমনভাবে বলল যেন মেয়েদের হলে হলে, স্কুলে কলেজে রিমোট-প্রেগনেন্সি টেস্টার নিয়ে ঘুরে ঘুরে স্টুডেন্ট খুঁজে বেড়ানো খুবই সাধারণ ঘটনা, নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার; আশেপাশে অনেকেই এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমার চোখের তীব্র ক্রোধকে বা হাত হাওয়ায় নাড়িয়ে বাউন্ডারির বাইরে ছুড়ে ফেলে বলল, ‘‘বুঝেছি, তোকে প্র্যাক্টিক্যালি দেখাতে হবে, না হলে বুঝতে পারবি না। তবে দোস্ত তোকে কথা দিতে হবে আমার এই আইডিয়া পেটেন্ট না করা পর্যন্ত মুখ বন্ধ রাখবি।’’

রাগ হচ্ছিল ভীষণ, দিনটাই মাটি করে দিয়েছে হতচ্ছাড়াটা; পিত্তি চটকাতে চটকাতে নিজের অজান্তেই কখন যে তার ল্যাব হাউজে হাজির হলাম টেরই পাইনি।

ঢুকতেই বোটকা একটা গন্ধের বিরাশি সিক্কার ঘুষি এসে লাগল নাকে। ঘরের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে কাগজের টুকরো, গুঁড়ো খাবার, গামছা, টিনের কৌটা, কাঠের তক্তা, আরও কত কী! তিনটি বিশাল আকৃতির কাঁচের ইনকিউবেটর টাইপের যন্ত্রে ঠাসা ঘরটা। তার ভেতরে শ খানের মত ইঁদুর খাচ্ছে, দৌড়াচ্ছে, কাঁচের দেয়ালে হাত তুলে অবাক পৃথিবী দেখছে, কয়েকটা আবার ব্যায়াম করছে।

চোখ ছানা ভরা হয়ে গেল আমার। হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে দুই দুইবার চোখ কচলে আবার তাকালাম। ঠিকই দেখছি। ব্যায়াম! বুকডন দিচ্ছে, ছোট আকৃতির ভার উত্তোলন করছে। কয়েকটা আবার ছোট মার্বেল দিয়ে ফুটবলও খেলছে! চোখ তুলে উপরের দিকে তাকালাম, ইনকিউবেটরের মাথায় জ্বলজ্বল করছে, ‘‘জিনিয়াস প্রজন্ম।’’

-‘‘কী হচ্ছে এখানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।’’, হতবিহ্বলতা কাটিয়ে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে বললাম।

- ‘‘এইজন্যেই কেরানি হয়েই আছিস এখনো। কাগজ আর কলম পিষে পিষে তোর ক্রিয়েটিভিটি গেছে একেবারেই; তুই বুঝতে পারবি না এটাই স্বাভাবিক’’, বলেই হো হো হো করে হেসে উঠলো।

খোঁচাটা হজম করে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকিয়ে থাকি খাস্তগীরের দিকে। জানি ভেতরে তার চেইন রিয়্যাকশন শুরু হয়ে গেছে সবকিছু খুলে বলার জন্য, দেরী হলে পাকা বাঙ্গির মত ফেটে যেতে পারে যেকোনো মুহূর্তে।

- আচ্ছা, তার আগে বল তো এটা কিসের যুগ?

কিসের যুগ? উম! টেকনোলজি? না, না, দাঁড়া আরও নির্দিষ্ট করে বললে, এটা কম্পিউটারের যুগ? ইন্টারনেটের যুগ?

- আরে ধুর! তোদের দেখছি সাধারণ জ্ঞানটা পর্যন্ত নেই। আরে এটা হল কম্পিটিশনের যুগ। আশেপাশে যেখানে তাকাবি দেখবি কম্পিটিশন আর কম্পিটিশন। স্কুলে কম্পিটিশন, মাঠে কম্পিটিশন, চাকরিতে কম্পিটিশন, মিডিয়াতে কম্পিটিশন, গবেষণায় কম্পিটিশন; শুধু কম্পিটিশন আর কম্পিটিশন। আর এই কম্পিটিশনের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা প্রতিদিন দৌড়াচ্ছি নিজেকে যোগ্য থেকে যোগ্যতর করে গড়ে তোলার জন্য। ঠিক কিনা বল? জবাবের অপেক্ষায় না থেকে পুনরায় প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে, "আচ্ছা বল তো, তুই কোন ক্লাস থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছিস?"

- যতটুকু মনে আছে একদিন বাবা পাড়ার স্কুলে নিয়ে গিয়ে ক্লাস থ্রীতে ভর্তি করিয়ে দেয়।

- বিজয়ের হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে খাস্তগীরের। আর এখন দেখ- তিন চার বছরের ছোট ছোট শিশুরা স্কুলে যাচ্ছে পিঠে বড় বড় ব্যাগ ঝুলিয়ে। তাদের বলা হচ্ছে শিশু-শ্রেণী, তারও আগের শ্রেণীকে বলা হচ্ছে প্লে-গ্রুপ। বাচ্চারা না কী স্কুলে গিয়ে প্লে করবে! আরে প্লে করবে ভাল কথা, স্কুলে গিয়ে কেনো? স্কুল কি প্লেয়িং এর জায়গা? আসল কথা হচ্ছে কম্পিটিশন, সবই কম্পিটিশনের খেলা। একবার চিন্তা করে দেখ আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কি আজকালকার বাচ্চাদের মত এত মেধাবী আর অ্যাডভান্সড ছিলাম?

আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, ওর কর্মযজ্ঞ দেখে নিউরনে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে, "বুঝলাম, কিন্তু তোর পরিকল্পনাটা কি?"

যেন খুব গোপন কথা বলছে এভাবে প্রায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আমি প্লে-গ্রুপের আগের আরও কয়েকটি ক্লাস উদ্ভাবন করেছি। বাচ্চাদের লার্নিং ক্যাপাসিটি কল্পনাতীত, আমাদের বয়স যত বাড়ে অভিজ্ঞতার ঝাঁপি ভারী হতে থাকে, সেই সাথে কমতে থাকে লার্নিং ক্যাপাসিটি। বলেই সে কাগজ টেনে কি সব আঁকিবুঁকি করতে থাকে। বয়সকে যদি A আর লার্নিং ক্যাপাসিটিকে L ধরি তাহলে সমীকরণটা দাঁড়ায়-

$$A \alpha 1/L$$

খুব বুঝতে পেরেছি এমন ভাব নিয়ে মুখটা গম্ভীর করে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বিজ্ঞের মত বললাম, "ও তাহলে তুই কিন্ডার-গার্টেন স্কুল দিতে চাচ্ছিস? গুড, ভেরি গুড। সত্যি বলতে কী এই প্রথম তোর কোন পরিকল্পনা আমার পছন্দ হয়েছে"।

- আশ্চর্য! কাকে কি বোঝাচ্ছি! এত কম ঘিলু নিয়ে চাকরি করিস কিভাবে? আরে হাঁদারাম, তোর থেকে তো আমার ঐ ইনকিউবেটরের ইঁদুরগুলো বেশি বুদ্ধিমান! শোন, মেডিক্যাল সায়েন্স বলে ১৮ সপ্তাহ পর মায়ের গর্ভে শিশুর শ্রবণশক্তির বিকাশ ঘটে; এই আনুমানিক ৪ মাসের পর থেকে প্রতিমাসকে আমি গর্ভ-১, গর্ভ-২, গর্ভ-৩, গর্ভ-৪, গর্ভ-৫, এভাবে ভাগ করেছি। আর শিশু জন্ম নেয়ার পর থেকে জন্ম-১,জন্ম-২, জন্ম-৩ এভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছি।

তারপর থেকে আমাদের গতানুগতিক প্লে-গ্রুপ, কেজি ওয়ান, ক্লাস ওয়ান এভাবে চলতে থাকবে। আমি মায়ের গর্ভের শিশুদের জন্য স্কুল খোলার পরিকল্পনা করছি। আমার স্কুলের শিশুরা বাদবাকী শিশুদের চেয়ে কম করে হলেও ১৫ বছর এগিয়ে থাকবে পড়াশুনায়। তুই চিন্তা করতে পারছিস শিক্ষা খাতে আমি কি বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসছি? ইউনেসস্কোর নোমা লিটারেসি প্রাইজ, সায়েন্স প্রাইজ, ক্যালিংগা প্রাইজ এমন কি নোবেলও পেয়ে যেতে পারি।

খাস্তগীরের চোখ চকচক করে উঠে লালায়িত স্বপ্নে, হঠাৎ হাতের মাঝের দুই আঙ্গুল বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে কনিষ্ঠা ও তর্জনি তেরছা করে কিম্ভূতকিমাকার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দুই হাত মাথা কাছে নিয়ে আসে।

অবাক হয়ে বললাম, "এটা কি জিনিস?"

- "আরে ছবির জন্য প্র্যাকটিস পোজ দিচ্ছি; তুই ইচ্ছা করলে এখনি আমার সাথে একটা ছবি তুলে রাখতে পারিস, তোর ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য", বলেই অদ্ভুত ভাবে হাসল সে।

-তোর এই এক্সপেরিমেন্ট তো অনেক সময় লেগে যাবে?

- আরে কি বলিস! অলরেডি সব এক্সপেরিমেন্ট শেষ। বিভিন্ন ধরনের টিচিং মেথড বানিয়ে ফেলেছি। এগুলোকে ক্লাস অনুসারে ভাগ করে ডিজিটাল ফ্রিকোয়েন্সিতে রূপান্তরের কাজ শেষ। এই দেখ, এই ইনকিউবেটরের ইঁদুরগুলো একেবারেই স্বাভাবিক, কোন এক্সপেরিমেন্ট করা হয়নি। এদের নলেজ-গ্রোথ দেখ একদমই সাধারণ। আর এই ইনকিউবেটরের ইঁদুরগুলোকে শুধু মাত্র জন্মের পরপরই ডিজিটাল ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রেনিং ক্লাস করানো হয়েছে। সাধারণ ইঁদুরের চেয়ে এদের নলেজ লেভেল ও গ্রোথ অনেক বেশি।

এর শেষের এই ইনকিউবেটরের ইঁদুরগুলো মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মা-ইঁদুরকে ক্লাস করানো হয়েছে। আর এদের নলেজ লেভেল কল্পনাতীত! প্রতিটা ইঁদুরই দারুণ মেধাবী।
উপরে তাকিয়ে দেখি শেষ ইনকিউবেটরের উপর লাল সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে, ''জিনিয়াস প্রজন্ম''। আমার গা গুলিয়ে উঠলো। এগিয়ে থাকার প্রতিযোগীতার নামে আমাদের শিশুদের নামিয়ে দিয়েছে ভয়ংকর অমানবিক এক যুদ্ধে। নষ্ট করে দিচ্ছি তাদের শৈশব অসম বোঝা চাপিয়ে দিয়ে, শৈশবের দুরন্তপনা জলাঞ্জলি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে শিক্ষকদের দ্বারে দ্বারে। আর এই পাগল এখন এক না কয়েকশ ধাপ এগিয়ে নষ্ট করার প্ল্যান করছে সদ্য-ভুমিষ্ট শিশুর জীবন। নাহ, এ তো গর্ভবতী মায়েদেরও নামিয়ে দিচ্ছে এই প্রতিযোগীতায়।

- ''দোস্ত, আগামী ২০/২৫ বছরের মধ্যে আমি বাংলাদেশের সব মানুষরে এক্কেবারে 'জিনিয়াস' বানায়া ফালামু।'', আনন্দের অতিশয্যে ভাষার খেই হারিয়ে ফেলেছে মনে হল খাস্তগীর।
আমার চোখের ভাসছে গর্ভবতী মায়েরা দলে দলে খাস্তগীরের পাঠশালায় আসছে, আর ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাস-থেরাপি নিচ্ছে; উফ, আর চিন্তা করতে পারছি না। খাস্তগীরের কাছ থেকে মোবাইলটা চেয়ে নিয়ে আমার নাম্বারটা ডিলিট করে বললাম, ''খবরদার আজকের পর থেকে আমার সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ করার চেষ্টা করবি না।'', বলেই হনহন করে ঘর থেকে বের হয়ে যাই।

পেছনে খাস্তগীর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে; হয়ত ভাবছে, ''আরে, আমি সারা দেশের মানুষকে জিনিয়াস বানানোর পরিকল্পনা করছি এটা তো খুশি হওয়ার কথা, রাগ করার কি হলো? গভীর কোন ষড়যন্ত্র না তো?''

৪.
অনেক দিন খাস্তগীরের সাথে কোন যোগাযোগ নেই, মাঝে বেশ কিছুদিন বউকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম বলে পাগলটার কথা ভুলেই ছিলাম। ডাক্তার বলেছিল প্রথম তিনমাস ক্রিটিক্যাল, তারপর আর তেমন দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বউকে সাথে করে ডাক্তারের চেম্বারে এসেছি, রুটিন চেকাপে। ওয়েটিং রুমে বসে ঝিমুচ্ছি; বউ এর গুতো খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললাম, ''কি হয়েছে, শান্তিতে একটু ঝিমাতেও দিবে না?''
আমার বউ একটা লিফলেট এগিয়ে দিয়ে মুচকি মুচকি আসতে থাকল।

লিফলেটের চার দিকে বিভিন্ন যন্ত্রের ছবি, গাণিতিক সমীকরন $E=mc^2$ এটা শুধু চিনতে পারলাম, আর কয়েকজন চুল বড় পাগলাটে বৈজ্ঞানিকের ছবি। তবে আমার বুঝতে আর বাকি থাকলো না যে এটা খাস্তগীরের কাজ। বউকে দেখলাম খুব উত্তেজিত হয়ে বলছে, ''এই নাম্বারটা মোবাইলে সেভ করে রাখো, আজই ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার সময় ঐখানে যোগাযোগ করে যাব।''

উপায় না দেখে একে একে বউকে সবকিছু খুলে বলছি, হঠাৎ পিছন থেকে ঘাড়ের উপর দিয়ে উঁকি মেরে বাজখাঁই গলায় কে যেন বলে উঠল, ''কিরে, শালা! খুব দুর্নাম করছিস ভাবীর কাছে আমার।''
চমকে উঠে পিছনে তাকিয়ে বললাম, আরে তুই এখানে?
- আরে আমি তো এখানেই থাকবো! আগের বার তো মহিলা স্কুল, কলেজে ঘুরে বেড়িয়েছি সেটা ছিল বিশাল বড় ভুল। আসলে আমার উচিৎ ছিল গাইনি ডাক্তারদের চেম্বারে চেম্বারে ঘুরা!''
হুম বুঝলাম, এখন তোর বেশ বুদ্ধির পাখা গজিয়েছে। পাঠশালাও শুরু করে দিয়েছিস দেখছি?
- আরে নাহ, এখনো খুলতে পারিনি। তবে কিছুদিনের মধ্যেই খুলে ফেলব, এখন আপাতত ছাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি।

নামও ঠিক করে ফেলেছিস দেখছি, পাঠশালা- ''ভিশন ২০৪০'', এমন উদ্ভট নামকরণের কারন কী শুনি?
- আরে এটা বুঝিস নি? গলাটা একটু নামিয়ে বলল, ''আমি ২০৪০ সালে মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মকে জিনিয়াসে রূপান্তরিত করব। যদি ৪০ সালের মধ্যে না পারি তাহলে ৮০ সালের মধ্যে হয়ে যাবে, সেইক্ষেত্রে নামও চেঞ্জ করতে হবে না। সবাই বুঝবে সালটা ইংরেজিতে লেখা হয়েছে।'', বলেই চক্রান্তকারীর মত একচোখ টিপে কি বুঝাতে চাইল তা আমার বোধগম্য হয়নি।
যদিও জানি যেকোন সময় সবকিছু বাদ দিয়ে খাস্তগীর আবার নতুন কোন যুগান্তকারী পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে, তবু কোন প্রভাবক দিয়ে তার এই 'ভীষণ'-২০৪০'' পরিকল্পনা ভণ্ডুল করার লোভ সামলাতে পারলাম না। মৃদু কাশি দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, ''দোস্ত, তুই তো এই পাঠশালা শুরুই করতে পারবি না''

- কেন! কেন? কিছুটা অবাক হয়ে চোখ পিটপিট করে তাকায় খাস্তগীর।
প্রথমত, যেহেতু স্কুল খুলবি তাই প্রথমেই তোকে 'শিক্ষামন্ত্রণালয়' থেকে অনুমতি নিতে হবে, তারপর যেহেতু সদ্য ভুমিষ্ট শিশুদের নিয়ে স্কুল তাই 'নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়' থেকে

অনুমতি নিতে হবে, যেহেতু গর্ভবতী মায়েরা স্কুলে ক্লাস করবে তাই 'স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়' থেকে অনুমতি নিতে হবে, যেহেতু মানব কল্যাণ জড়িত সেহেতু 'সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়' এর অনুমতি নিতে হবে, যেহেতু বিজ্ঞান ও গবেষণা জড়িত তাই 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়' এর অনুমতি নিতে হবে, এভাবে একে একে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ধর্ম মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়; কম করে হলেও পঞ্চাশ ষাটটা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি লাগবে শুধু মাত্র শুরু করতেই।

তারপর কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি আদালতে রীট করে বসে তাহলে জেলা কোর্ট, জর্জকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, আপিল বিভাগ তারপর আবার রাইট টু আপিল, লেফট টু আপিল; দুনিয়ার হেপা।

এগুলো পার হতে হতে তোর দুই পা না হোক এক পা কবরে চলে যাবে নিশ্চিত। আবার যেকোন সময় রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলায়ও ফেঁসে যেতে পারিস। নিদেনপক্ষে আদালত অবমাননার মামলায় যে পড়বি সেটা মাথায় রেখেই কাজে নামা উচিত। আর যেকোন সময় সপ্তাহখানেকের জন্য রিমান্ড! আর রোকসানা পারভীনের কথা মনে আছে তো?

- ''তাহলে কি করতে বলিস?'' কণ্ঠে কিছুটা উৎকন্ঠা তার। মারটা জায়গা মতই পড়েছে। তার পুলিশো-ফোবিয়া যে এভাবে ম্যাজিকের মত কাজ করবে আমি নিজেও অতটা আশাবাদী ছিলাম না।

এইসব পাগলামো বাদ দিয়ে সত্যিকারের জনহিতকর কোন কাজে হাত দে, তোরও ভালো লাগবে দেশেরও উপকার হবে। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি উঁকি দিয়েই মিলিয়ে গেল আমাদের খাস্তগীরের।

তার এই হাসির সাথে আমি পরিচিত, এ যাত্রায় হয়ত সমগ্র জাতিকে জিনিয়াস হওয়া থেকে বঞ্চিতই করে ফেললাম।

৫.

অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন; ধরতেই সুরেলা কণ্ঠে হ্যালো? আহা! কি মিষ্টি আওয়াজ? যতবার অপরিচিত নারীর ফোন পেয়েছি ততবার প্রতারিত হয়েছি না হয় আপদ ঘাড়ে চেপে বসেছে। ব্যাকরন বই এর ন্যাড়া একবারই বেল তলায় যায় বাস্তবের ন্যাড়ারা যায়, বারবার শতবার। আমিও কণ্ঠ ততোধিক কোমল করে উত্তর দিলাম, ''জ্বি বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?''

- খাস্তগীর নামের কাউকে চিনেন?

মাথার মধ্যে যেন হাজার বেহালা একযোগে বেজে উঠলো সাথে বুদ্ধিও; ''না তো! এই নামে তো কাউকে চিনি না।'' বদমাইশটা নির্ঘাত আবার ডিবির খপ্পরে পড়েছে মনে মনে ভাবলাম।

- কিন্তু উনি তো ক্রমাগত আপনার নাম আর নাম্বার বলে যাচ্ছেন; আমি ডাঃ সেলিনা হায়াৎ বলছি 'টুইস্ট মানসিক হাসপাতাল' থেকে।

ধড়ে প্রাণ ফিরে এল যেন; যাক বাবা এতদিনে হতচ্ছাড়াটা জায়গা মত পৌঁছেছে। ''ও, খাস্তগীরের কথা বলছেন? ও তো আমার ছোট বেলার বন্ধু। কেন কী হয়েছে ওর? ''

- আপনাকে যে একটু আসতে হবে!

বিলম্ব না করে বলতে গেলে উড়েই গেলাম হাসপাতালে। ছোট একটা ক্যাবিনে আটকে রেখেছে পাগলটাকে। পাগলই তো! বদ্ধ উন্মাদ। ঘরময় হেটে বেড়াচ্ছে আর বিড় বিড় করে আমার নাম আর মোবাইল নাম্বার বলে বেড়াচ্ছে। ঘরে ঢুকেই নার্সকে বললাম, ''আপনি একটু বাইরে যান, আমি দেখছি।''

- নার্স বাইরে যেতেই খাস্তগীর আড়চোখে তাকিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো যেন! দোস্ত, ''আমাকে বাঁচা। আমাকে না কী কিছুক্ষণ পর ইলেকট্রিক শক দিতে নিয়ে যাবে।''

দাঁড়া, একটু দম নিতে দে! খুলে বলতো কী কান্ড করেছিস আবার?

- আরে তুই ঐদিন আমার 'ভিশন ২০৪০' নিয়ে বলেছিলি না যে নানান মন্ত্রণালয় থেকে নানান ঝামেলা পোহাতে হবে? তাই সব সমস্যা সমাধান একদিনে করার জন্য; এক তীরে লক্ষ্যভেদের উদ্দেশে গিয়েছিলাম সংসদভবনে। ভেবেছিলাম একজায়গায় সব মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের পেয়ে যাব। সবার সামনে একটা ডেমো দেখাবো, পাশাপাশি একটা মার্কেটিংও হয়ে যাবে। সব মুসকিল আসান হয়ে যাবে মুহূর্তেই।

কিন্তু বিধিরাম! কয়েক জনের উপর রিমোট-প্রেগনেন্সি টেস্টার তাক করতেই সে কি কান্ড, কান্ড বলতে একেবারে লংকাকান্ড! দু-এক জন তো ভয়ে সঙ্গাই হারিয়ে ফেলেছিল। আমি না কী ভয়ংকর মারনাস্ত্র নিয়ে হামলা করেছি! তারপর আর কী! শেষমেশ পাগলের অভিনয় করতে হয়েছে আর সোজা এখানে। খাস্তগীর রিমোট-প্রেগনেন্সি টেস্টার নিয়ে সংসদ ভবনের মত কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টিত জায়গায় গিয়েছিল কীভাবে সেটা আজ পর্যন্ত আমার কাছে এক বিশাল রহস্য। যাই হোক, এ যাত্রায় অল্পের উপর দিয়ে গেছে। আপাতত, তার থেকে যথাসম্ভব দূরে দূরেই থাকছি।

ট্যেরো

হৃদয় হক

আশেপাশে সব সবুজে ঘেরা। উপরে নীল চাদরের নিচে সাদা মেঘ গুলি খেলা করছে। কখনো সেখানে পাখিরা গান গেয়ে গেয়ে দল বেঁধে উড়ে বেড়ায়। লাল, হলদে, কমলা – তাদের যেন রঙের অভাব নেই। সামনের নদী হতে শোনা যায় পানির কল-কল ধ্বনি। পানিতে উঁকি দিলেই দেখা যায় মাছেদের খেলা। কখনো মৃদু হাওয়ায় ভেসে যায় মন। রাতের আকাশে ভেসে ওঠে শশী। কখনো সে মেঘের সাথে লুকোচুরি খেলে। গাছের নিচে বসে এই দৃশ্য বছরের পর বছর উপভোগ করতে পারবে সবাই। ক্ষুধার কথা মনে আসবে না এর সামনে। আর যদি আসে, তাহলে গাছে ফলের তো অভাব নেই!

অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, নিজের মাথা থেকে সেন্সর গুলো সরিয়ে নেয় ক্লারা। অনেক অনেক প্রাচীন এক মস্তিষ্কের রাজ্যে ঘোরাঘুরি করছিল সে। এখানে আসার আগে, তার বাবা নিয়ে এসেছিলেন এই মস্তিষ্কটি। দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে। মনে মনে ভাবছে, সেই মানুষের গ্রহটির কথা। কতই না সুন্দর ছিল সেই গ্রহ। তারপর নিজের অজান্তেই বলে ওঠে, “ইস! যদি সেই গ্রহটায় জন্মাতাম! আসলে আমার জন্মটাই হয়তো লিখা ছিল ভুল একটি গ্রহে।”

তাহলে কি আপনি বাকি ৯৬% ইন্টারনেটে কথা বলছেন? না আমি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকেও ভিন্ন কিছুর কথা বলছি। মহাকাশ থেকে মি. রাহি সংকেত দিয়েছে। হ্যাড্রন কণাকেই আমরা কৃত্রিম উপগ্রহ হিসেবে ব্যবহার করব।

-রুকাইয়া মেহবিন

বাঁচতে হলে, ভাবতে হবে

ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করতে লগইন করুন:

https://bit.ly/bcb_science

সম্পাদনকারী টিম

“অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে ব্যাঙাচি-কে নির্ভূল করার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য”

-TRR

- মুহাম্মদ রবিউল হাসান
- রাহুল খান
- মোহাম্মদ মুবিন
- সব্যসাচী নির্ঝর
- সোহম চ্যাটার্জি
- গোপাল কুণ্ডু
- তাসনিম বিনতে সাইফ
- মুস্তফা কামাল জাবেদ
- মাহতাব মাহদী
- নাসিম আহমেদ
- জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ
- নাজমুল হোসেইন
- রাকিন শাহরিয়ার
- পার্থিব রায়
- কাওসার মোস্তফা
- শহীদুল ইসলাম
- মাফরুহা জামান
- হৃদয় হক
- রুহিন রুমি
- শুভ সালাউদ্দিন
- আমির

Reference

All information are verified by BCB. If you need any prove visit BCB Facebook Group. Your hesitations and questions will be solved. But we put some link below randomly

-editor

ভাইরাসের দালালি

Suttle, C.A., 2005. Viruses in the sea. Nature, 437(7057), pp.356-361.

Weitz, J.S. and Wilhelm, S.W., 2012. Ocean viruses and their effects on microbial communities and biogeochemical cycles. F1000 biology reports, 4.

Faruque, S.M., Naser, I.B., Islam, M.J., Faruque, A.S.G., Ghosh, A.N., Nair, G.B., Sack, D.A. and Mekalanos, J.J., 2005. Seasonal epidemics of cholera inversely correlate with the prevalence of environmental cholera phages. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(5), pp.1702-1707.

Jensen, M.A., Faruque, S.M., Mekalanos, J.J. and Levin, B.R., 2006. Modeling the role of bacteriophage in the control of cholera outbreaks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(12), pp.4652-4657.